

লোদ্রভার কাছাকাছি

শ্যামল ভট্টাচার্য

লোদ্রভার কাছাকাছি

শ্যামল ভট্টাচার্য

CHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
Accn No. 42799
02. 07. 2011
Agartala Tripura W

স্রোত

স্রোত প্রকাশনা

হালাইমুড়া, কুমারঘাট-৭৯৯২৬৪, উত্তর ত্রিপুরা

IBRARY
M. R. No...286 855...

LODRABHAR KACHHAKACHHI
a bengali novel by
shyamal bhattacharya

© shyamal bhattacharya

ISBN-13-978-81-906958-2-4
প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০০৯
প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস
নির্মল দত্ত

যাদের ভালোবাসা ও প্রশ্রয়
এই উপন্যাসটিকে বৃহত্তর পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে
প্রিয় কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য
ও
শ্রদ্ধেয়া শিখাবৌদিকে

লে.খ.কে.র অ.ন্যা.ন্য ব.ই

গল্পসংগ্রহ

চিলতে দাগ (১৯৮৩)
ফুলমতির বসন্তকাল (১৯৯৪)
জামিছলও (১৯৯৯)
আকাশে ওড়ার গল্প (২০০৬)
ভারোং পাখির নাচ (২০০৭)
PAISLEY (২০০৮)

উপন্যাস

বুখারি (১৯৯৭), ২য় সংস্করণ (২০০৪)
ঐ-হিন্দী (২০০২), ২য় সংস্করণ (২০০৬)
ঐ-পাঞ্জাবী (২০০৬)

অনুবাদ গ্রন্থ

সমকালীন পাঞ্জাবী গল্প (২০০২)
কুমারী হরিণীর চোখ (২০০৭)
কোন্ ভোরে বোচকা খুলি (যন্ত্রস্থ)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুরারোগ্য হল—
সমসাময়িকতা। একজন লেখক নয়, যদি তিনি
লেখকের খণ্ডিত সত্ত্বা অতিক্রম করে 'সাহিত্যিক'
হতে পারেন সাধনের মাধ্যমে, তবে তাঁকে
কল্পনার লাবণ্যময় একটি দুর্লভ বস্তু অন্তরে
ধারণ করতে হবে।
প্রকৃত-সাহিত্যিকের তো সত্যই কোনো দেশ-কাল
নেই; তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা নিভৃতে সেইসব ভূমণ্ডলে
বিচরণ করে যা আছে কী নেই, ছিল কী
ছিল না—তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।
বিষয় ঃ প্রাণভূমিতে তার রাগিনী বাজল কিনা।
—এই মানসিকতা নিয়ে অতীত এবং বর্তমানের
ভুবনে নিরালা-পা ফেলে যিনি ভাবতে পারেন,
এ-কাহিনি তাঁরই অন্ন।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
২৫.১০.২০০৮

লোদ্রভার কাছাকাছি

র . চ . না . কা . ল
২০০৪-০৫

সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়—জীবনানন্দ দাশ

এক

দৌড়ে এসে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে পেছনের কামরায় উঠে পড়ে। পরিতোষের শিয়ালদহ্ অব্দি মান্থলী টিকিট। ব্যারাকপুরেই জানালার পাশে একটা সিট পেয়ে যায়। দুপুরের পর থেকে ডাউন ট্রেনে সাধারণত খুব ভিড় হয় না। কলকাতা যেতে হলে পরিতোষ তাই এই সময়টাই বেছে নেয়। পারতপক্ষে সকালের দিকে যায় না। আসামের দিগন্তবিস্তৃত মরিয়ানী-নাগাঝাংকা চা-বাগানের বাতাসে বড় হওয়া পরিতোষ একদমই ভিড় পছন্দ করে না।

সিট পেয়ে যাওয়ায় কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করে শেষ চ্যাপ্টারটা শুরু করে। পুজো সংখ্যার জন্য লেখাটা আজই জমা দিতে হবে। যথারীতি তিনটি তারিখ ফেল করেছে সে। অথচ শেষ অধ্যায়ে লেগে রয়েছে অসন্তোষ। থেকে থেকেই মনে হচ্ছে, লেখাটা আরো কিছুদিন ঘরে ফেলে রাখলে ভালো হতো। তাহলেই হয়তো মহেন্দ্রর মুমলসন্ধানের কাহিনীটা আরো মনের মতন, আরো বাস্তবতা বর্জিত হতো। যেহেতু সে কোন বাস্তবতা লিখতে চায়নি, যেহেতু ওর মনে হয় বাস্তবতা কোন ব্যক্তির সারা জীবনের সৃষ্টি ও ধ্বংসের উপজ, আসলে যা কেউ নিজে কোনদিনই অনুভব করতে পারে না। অন্য কেউ এরকম ভাবে কিনা সে জানে না, এত জানার ধৈর্যও তার নেই। এই ট্রেনের যাত্রীদের পাশাপাশি আরেকজন যাত্রীর মতন যথাসম্ভব গাদাগদি ভিড় বাঁচিয়ে সে একজন জীবনপথের যাত্রী হয়েই থাকতে চায়—নদীর স্রোতের মতন, চোখমুখে ঝাপিয়ে পড়া বাতাসের মতন। সে যে সুরতির স্বামী পরিতোষ, শঙ্খের বাবা পরিতোষ—কারো পুত্র, কারো দাদা, কারো পিসেমশাই, কারো মামা ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত পরিচয় এরকম

সময়ে ধীরে ধীরে মুছে যায় এই দোলায়মান জানালার বাইরে নীল আকাশে হালকা পেঁজা তুলো মেঘের মতন উদ্দেশ্যহীন।

আসলে মানুষ বড় একা। আমরা সবাই একা। এই একাকিত্বকে আমরা জীবৎকালে মেনে নিতে পারি না বলেই নানারকম সম্পর্কের জাল বুনি। পরিতোষের মনে পড়ে দেবী রায়ের কবিতার লাইন—একা থাকার দুঃখ দেশময়। পথের মাঝে লুকিয়ে থাকে ভয়—শুধু কী হয়, কী হয়। একা থাকার দুঃখ দেশময়! এই দুঃখই মানুষ সইতে পারে না বলে সম্পর্কের উষ্ণতা পেতে চায়! আদিম মানুষেরা সেজন্যেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল। পৃথিবীর যেসব দেশে আদিম সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল, চীন, মিশর কিম্বা আফ্রিকার নানা প্রান্তে ও ভারতবর্ষের গভীর গ্রামীন জীবনে আজো সেই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অবশেষ হিসেবে একান্নবর্তী থাকে। দেখা গেছে উন্মুক্ত স্বস্থানে থাকলে গাছেরাও বেশি বেশি ফুল ও ফল পেয়ে থাকে, ফসলের উপচার পায়। সেজন্যেই হয়তো এসব দেশের মানুষ পরস্পরের প্রতি বেশি নিবিড় হয়। সেজন্যেই এসব দেশের জনসংখ্যা বেশি।

কিন্তু মহানগর থেকে শুরু করে মহকুমা শহর এমন কি অসংখ্য মফস্বলি গ্রামেও আধুনিক পাশ্চাত্য নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়া যতদূর যায়, মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়, একা করে দেয়। টেলিভিশন নেটওয়ার্কের দৌলতে সহস্র চ্যানেলে একাকিত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটে। প্রতি পরিবারে বেড়ে ওঠে অজস্র অর্ন্তমুখী শিশু। সহস্র পণ্যের ঢালাও বিজ্ঞাপন ও মিউজিকে এমন কি মশারাও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। বাকি থাকে শুধু রক্তচোষা আর যৌনতা। বাকি থাকে ডিমপাড়া আর ডিমপাড়া। পরিতোষ নিজেকেও একটি মশার মতন একলা পায়। সেজন্যেই সমস্ত সম্পর্কের উর্ধ্বে একটি একাকী জীবন আর তথাকথিত সামাজিক মানুষের টানাপোড়েন মাঝেমধ্যেই ওর অস্তিত্বকে ফালাফালা করে দেয়।

মহেন্দ্রর জীবন কিন্তু অন্যরকম। অথচ এ সময় তার জীবন সংলগ্ন অনেক কাহিনী পরম্পরার মধ্য দিয়েই পরিতোষের উপলব্ধির বীজটি বিকশিত হয়ে সে নিজেও অনুভব করছে এই দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই ওকে দিয়ে লিখিয়েছে। কিন্তু শেষ অধ্যায়ে পরিতোষ যে সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম আশা করেছিল, তা হয়নি বলেই হয়তো অতৃপ্তি লেগে রয়েছে পুরো লেখাটির গায়ে। অথবা লেখাটি কোন কিছুই হয়নি। না উপন্যাস, না এপিটাফ! উপন্যাস লিখতে বসে এপিটাফমুখী আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ওর সমস্ত সত্ত্বা, এক আশ্চর্য মৃত্যুচেতনায় অবশ।

মেঘলা আকাশ আর হু হু হাওয়ায় এই গ্রীষ্মের বেলাশেষের আর্দ্র ট্রপিকাল আবহাওয়া ওকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তোলে। ঘুম এসে যায়। কখন যে চোখ বুজে আসে সে টের পায় না।

আকাশ জেগে থাকে। থেকে থেকে সহস্র কলকারখানা ও লক্ষ লক্ষ অটোমোবাইলের এক্সহস্ট নির্গত কার্বন মনোক্সাইড ও অন্য সব কালো ভারী বায়বীয় আস্তরণ সরিয়ে মুক্ত হতে চায়। মেঘগুলিকে সরিয়ে দিয়ে আকাশ একা হতে চায়। গ্রীষ্মকালে সেজন্যেই বিশাল

আকাশময় বায়ু, বিশাল বাতাস বয়, তেমনি বিরুদ্ধ বাতাসও। পৃথিবীময় একটাই তো আকাশ নেই, যখন যে মানুষ আকাশের দিকে তাকায়—সে নিজের জন্যে আলাদা একটা আকাশ পায়, সেই আকাশ যেমন বাইরের চরাচরে থাকে তেমনি বুকের ভেতরে কিম্বা মস্তিষ্কের সমস্ত কোষিকায়, রক্ত ও লসিকায় ব্যাপ্ত, তাই ঘুমিয়ে পড়লেও কারো নিজস্ব আকাশ হারিয়ে যায় না। তেমনি গাছেদের আকাশ থাকে আলাদা আলাদা, প্রত্যেক মহীরুহের থাকে বিশাল চুম্বনরত আকাশ। আকাশের সঙ্গেই গাছেদের যত মান অভিমানের পালা। প্রতি গ্রীষ্মে কাল বৈশাখী। এমনি অনেক গাছে বজ্রপাত হানে। গাছ মরে গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘদিন। তারপর কখনো সেই মৃত শরীর থেকেই আবার ফিনিক্স পাখির মতন জেগে ওঠে নতুন গাছ। মানুষের অবশ্য এমনটি হবার জো নেই। গন্ধের ভয়ে, সংক্রমণের ভয়ে, ধর্মের খাতিরে তাকে কেউ কেউ গর্ত খুঁড়ে কবরে শুইয়ে দেয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।

কখনো বিরুদ্ধ বাতাস অন্য বাতাসে হুমড়ে পড়ে। সেজন্যে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ঝড় হতে থাকে। এবং আলোআঁধারি, গাছের শুকনো বিবর্ণ পাতারা উড়তে থাকে, উড়তে উড়তে কোন সবুজ ঘাসের মাঠ, কিম্বা গোরস্থান। সে দেখতে পায় সারি সারি সমাধিফলক, উড়তে থাকা কালো ছোপ ছোপ শাদা বাসি ফুল, নিমতলা বা কেওড়াতলা শ্মশানে যেমন ফলক তেমনি নয়, অনেকটা মুসলমানদের কবরস্থান কিম্বা হিন্দু শিশুদের গোরস্থানের মতন কোন সৌধ কিংবা বাঁধানো চত্তর ছাড়াই সবুজ আলোআঁধারি মাঠের মধ্যে সারি সারি সমাধিস্থল। ক্লোজ আপে একটা ফলক ভীষণ আপন লাগে। সেই ফলকে যেন ওরই নাম লেখা। সে কি ছোটবেলায় মারা গেছে? অথবা সে ধর্মান্তরিত হয়েছিল? তাহলে ওর নাম পাল্টায় নি কেন? সে কি আদৌ কোন ধর্ম মানত? তাহলে—

হঠাৎ হকারের ডাকে চোখ খুলে দেখে—অমৃতপ্রাশ। হকারমশাই মাত্র একশো টাকার বিনিময়ে এই মহার্ঘ ঔষধের একটি ফাইল বিক্রি করছেন। বন্দুকের নল থেকে ছোঁড়া গুলি, পিস্তল থেকে ছোঁড়া বুলেট ও মিস হতে পারে, কিন্তু এই ফাইলের প্রত্যেকটি অমৃতপ্রাশ বড়িই অব্যর্থ। যাদের শরীরে সামান্য যৌবন অবশিষ্ট অথচ পরিপূর্ণ আনন্দের জন্যে হাহাকার রয়েছে তাদের জন্যে মহৌষধ এই অমৃতপ্রাশ। কোন কেমিক্যাল নেই, কোন সাইড এফেক্ট নেই, ভারতীয় গাছগাছালি ফুল ফল ও শেকড়বাকড়ের নির্যাস কথা বলবে, আনন্দময় করে তুলবে প্রতিটি রাত্রি! এত সুন্দর বলছে লোকটি! এই কামরায় প্রতিটি যাত্রীর মুখের দিকে তাকায় পরিতোষ। আজ ট্রেন এত ফাঁকা কেন? তারপর হকারের দিকে তাকায়। তাকাতেই চোখাচোখি। হকার তখনই অর্থপূর্ণ হেসে বলে, নির্ঘাত কাজে লাগবে, মিস হবে না, ফাইলের বাইরে আমার নাম ও ঠিকানা লেখা রয়েছে, আমি নিশ্চিত, একবার ব্যবহার করলে আপনি আমার ঠিকানা খুঁজে আবার নিয়ে যাবেন, বারবার নিয়ে যাবেন, অনেকেই নিয়ে যান!

পরিতোষ অবাক হয়, হকার ভদ্রলোক কি ওকেও সম্ভাব্য ক্রেতা ভাবছে? তাকে দেখে কি বিগত যৌবন টিমটিম করে জ্বলতে থাকা প্রদীপশিখাটির মতন লাগছে? পরিতোষ মনে

মনে লোকটার উপর ক্ষুব্ধ হয়। ক্রুদ্ধ হয়। সে মুখ ঘুরিয়ে জানালার বাইরে তাকায়। বাইরে বিশাল নদী। সে কী এখনো স্বপ্ন দেখছে? এ পথে নদী আসবে কোত্থেকে? সে চোখ কচলায়। তখনই ট্রেনের গতি ধীরে হয়। আর দেখে শোভাবাজার স্টেশান। একটু দূরে নদীঘাট। তাহলে কি ও ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছে? এখন কী হবে? ওর মান্থলী তো শিয়ালদহ অব্দি।

শোভাবাজার ছেড়ে ট্রেন চলতে শুরু করে। হকারটি এই স্টেশানেই নেমে গেছে। অথবা নেমে আবার অন্য কামরায় উঠেছে। লোকটা নিশ্চয়ই কিছুদিনের মধ্যেই বড়লোক হয়ে যাবে। একশো দশ কোটি মানুষের দেশে, অমৃতপ্রাশের মতন মহার্ঘ ঔষধের প্রচার ও প্রসার হলে লোকটার বড়লোক হতে কতদিন? তখুনি চোখে পড়ে সামনের দেওয়ালে বাত হাঁপানী শ্বেতী অর্শ্ব ও ভগন্দরের পাশাপাশি স্ত্রী পুরুষের নানা যৌনরোগের অব্যর্থ হেকিম মহঃ নাসিম এর ঠিকানা সহ বিজ্ঞাপন। হেকিমরাও কি অমৃতপ্রাশ বিক্রি করে? মহানগরীর নানা দেওয়ালে এই হেকিমদের এত বিজ্ঞাপন দেখে ওদের রমরমা ব্যবসার আঁচ পাওয়া যায়। অথচ এই 'অমৃতপ্রাশ' এর বিজ্ঞাপন কোথাও দেখেছে বলে পরিতোষের মনে পড়ে না। অমৃতপ্রাশ বিক্রেতা কি হেকিমদের বিজ্ঞাপন দেখে নিজের প্রোডাক্টের এরকম বিজ্ঞাপন দিতে পারে না?

বিজ্ঞাপন দেখে এক প্রিয়মানুষ নাসিম সাহেবের কথা মনে পড়ে। যোধপুর মিউজিয়ামে অ্যাসিস্টেন্ট কিউরেটার ছিলেন নাসিম সাহেব। অনেক পরে প্রমোশান পেয়ে কলকাতা যাদুঘরে বদলি হয়ে এসেছেন। নাসিম সাহেব ওর সঙ্গে মুঘল মহলের ধ্বংসাবশেষ দেখতে লোদ্রভা গিয়েছিলেন, আর পরে বিল জমা দিয়ে যাতায়াতের পুরো খরচটা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকেই আদায় করেছিলেন। তখন পরিতোষ এল. ডি. সি. মাত্র। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষা পাশ করে প্রথম পোস্টিং পেয়েছে যোধপুর। পূর্বাঞ্চলের তুলনায় ঐসব দিকে তখন তুলনামূলক প্রতিযোগিতাটা কম ছিল বলে সে ওখানে গিয়েই পরীক্ষা দিয়েছিল আর যথারীতি কৃতকার্যও হয়েছিল। সায়েন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলেও সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি পরিতোষের একটা গোপন আকর্ষণ সবসময়ই ছিল। একটা চোরাটান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে চাকরির সুবাদে সেজন্যেই হয়তো তখন ইতিহাস ও সাহিত্যের একটা মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিল নিজস্ব মাধুরী মিশিয়ে। নাসিম মানে 'মৃদুমন্দ শীতল হাওয়া'। রাজস্থানের প্রখর গ্রীষ্মে শুধু ভোরবেলাতেই সামান্য শীতল হাওয়া বইতো বলে পরিতোষের মনে হতো—ভোরের বাতাস! ধীর, স্থির, শান্ত কিন্তু একরোখা প্রকৃতির ত্রিপুরার ছেলে এই মানুষটির কাছে গেলেই একটা শীতল স্নেহচ্ছায়া ওকে ঘিরে থাকতো। আর ছিলেন রাজস্থানী কবি যুগল পরিহার—মাড়োয়ারি মাসিক পত্রিকা 'মাণক' এর সহসম্পাদক। মূলত এই দুজনের প্রেরণাতেই পরিতোষের পরবর্তী উচ্চশিক্ষা, ওর জীবনের যত উন্নতি। আর সাহস জুগিয়েছেন পরিতোষের মা। যতবার ছুটিতে বাড়ি এসেছে আর প্রত্যেকটি চিঠিতে মা লিখেছেন—তুই পারবি, তুই অবশ্যই পারবি!

পরবর্তী সময়ে সিনিয়র কিউরেটর ডক্টর ফণি চক্রবর্তীও ওকে অনেক প্রশ্রয় ও প্রেরণা

জুগিয়েছেন। নাহলে এতদিনে সে বড়জোর ইউ. ডি. সি. হতো। কিন্তু এখন সে ও একজন কিউরেটর। স্যার আশুতোষ মিউজিয়ামে পোস্টিং এর সুবাদে গত তিনবছরে মহানগরীর বুদ্ধিজীবী মহলে পরিচয় লেখক হিসেবে ওর সুখ্যাতি বাড়িয়েছে।

কিন্তু পরিতোষ নিজেকে কিউরেটর কিম্বা লেখক কিছুই ভাবে না। অন্ততঃ এরকম ভাবনাকে মনের মধ্যে ডালপালা গজাতে দেয় না। না জানি কেন মনে হয় নিজেকে কিছু ভাবার মধ্যে একটা দাসত্বের গ্লানি লুকিয়ে থাকে। ঐ নির্দিষ্ট পেশা বা কোনকিছু হয়ে ওঠার প্রতি দাসত্ব। পরিতোষ যে আর সহস্র জীবনের পাশাপাশি জীবন হিসেবে বাঁচতে চায়। কি জানি এর থেকে আলাদা কিছু হলেই এই জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে কিনা! কিছু হয়ে উঠলেই আরো কিছু পাওয়ার বাসনা জাগে— নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, বাড়ি, গাড়ি ও বহু বিজ্ঞাপিত সহস্র পণ্য—আরো চাই, আরো চাই! যেমনটি চায় সুরতি। যেজন্যে শত চেষ্টাতেও ওরা পরস্পরের মন পেল না। এখন সম্পর্ক টিকে আছে নেহাৎই শরীরের জন্য, শরীর শরীরকে চায় বলে, অবশ্য চাইলেই যে সবসময় পাওয়া যায় - তা নয়। আকাঙ্ক্ষার টিলাভূমি ফুলতে ফুলতে পাহাড় হয়ে ওঠে, বনভূমি তত কমে আসে। পাহাড়ের মাথায় ওঠা একটি একা গাছ ভীষণ একাকী এবং নিঃসঙ্গ। তার সঙ্গে সমতলের গাছ-গাছালির কোন সখ্যতা হয় না। তবু সব মহীরুহ আর ফুলের গাছেরা বিভিন্ন উচ্চতায় যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে নিজের মতন বাড়তে বাড়তে সংগোপনে ভাবতে থাকে মিলনের শ্বাসরোধী কথা। শ্বাসরোধী মিলন? পরিতোষের কাছে পরিবার নামক ধারণাটাই তখন হাস্যকর মনে হয়। তখন মনে হয়, শরীর নয়, সম্পর্ক টিকে থাকে সন্তানের জন্য। দুজনেই সন্তানকে ভালোবাসে, ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। ইউরোপীয় মা-বাবারা এরকম ভাবে না। ওরা অনেক বেশি যৌবনমুখী বলে ওদের বিচ্ছেদে সন্তান কোন প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে না। ওদের সমাজে এটা সাধারণগ্রাহ্য ব্যাপার। এতে শিশুদেরও তেমন মানসিক চ্যুতি ঘটে না হয়তো। যেমনটি আমাদের সমাজে সম্ভব নয়। ডিভোর্সি বাবা-মায়ের সন্তানকে সমাজ ও পরিবেশ এমন কি স্কুলের বাচ্চারা নানাভাবে খ্যাপায়। অতিষ্ঠ করে তোলে ওর জীবন। কৈশোরের সামান্য অভিমানকে তখন কেউ এতটুকু মূল্য দেয় না বলেই আজকের ক্রমভঙ্গুর পরিবারগুলিতে আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে আর আত্মঘাতে কৈশোরের অধিকারও সেজন্যেই হয়তো এত সর্বনাশা! পরিতোষের মনেও একই ভয় ছেয়ে থাকে, এসময়ে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে ওর কেরিয়ার লোপাট হয়ে যাবে, মস্তিষ্ক বিকৃত কিম্বা একই কারণে আত্মঘাতিও হতে পারে ওদের সন্তান। সেজন্যেই ওরা হয়তো পাশাপাশি আছে। অন্তত সেরকম বলে পরস্পরকে হুমকি দেয় অথবা ভয় দেখায়। মনে হয় নিজেকেও।

পরিতোষ এ বিষয়ে একইরকম ভাবে। আর এতবছর পাশাপাশি থেকেও সুরতিকে ভালভাবে চিনতে না পারার ক্লান্তিতে ভোগে। নিজেকে লেখক ভাবলে আরো কষ্ট পেত সে। পরিতোষ ভাবে, আচ্ছা, এই ট্রেনের শেষ স্টেশন যেহেতু প্রিন্সেপ ঘাট সেখান থেকে নাসিম সাহেবের বাড়ি গেলে হয় না! প্রিন্সেপ ঘাট থেকে খিদিরপুর আর কতদূর! হেঁটেও যাওয়া যায়। নাসিম সাহেবের নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির ঠিকানা ওর মুখস্থ। কখনো সখনো

অফিসের কাজে ওঁর বাড়ির ঠিকানায় ক্যুরিয়ারে চিঠি পাঠাতে হয়।

পরিতোষ ঘড়ি দেখে। এখন বিকেল পাঁচটা। ট্রেন হাওড়া ব্রীজের নীচ দিয়ে বাবুঘাট স্টেশনে ঢুকছে। পরের স্টেশনই প্রিন্সেপ ঘাট। আমিনাভাবির হাসিমাখা উজ্জ্বল মুখটা চোখে ভাসে আর যোধপুর শহরের পাউটা বি রোডের বাড়ির দরজায় পা রাখতেই চিক সরিয়ে হাসিমুখে 'আ যাইয়ে'—দৃপ্ত আহ্বান! আমিনা-ভাবি হুবহু রাজস্থানী মহিলাদের নকল করে কথা বলতে পারে। নাসিম সাহেবের বাড়িতেও পর্দা ও বোরখা ছিল। কিন্তু সেগুলি পরিবেশ অনুযায়ী ব্যবহৃত হতো, ব্যক্তি বিশেষের জন্যে ব্যবহৃত হতো। পরিতোষের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। নাসিমের বড়ছেলে আমন তখন হামাগুড়ি দিত। পরিতোষের কোলে হিসি করেছে কতবার!

বাবুঘাটেও কোন চেকার উঠলো না দেখে পরিতোষের অর্ধেক শঙ্কা দূর হয়ে যায়। অবশ্য প্রিন্সেপ ঘাটেও কোন কালোকোট পরা ভদ্রলোক ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। তাহলে? পরিতোষ ভাবে, ঘুমিয়ে পড়ার কথা বলবে, না জেনে এই ট্রেনে উঠে পড়েছে! তারপরও যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে চুপচাপ জরিমানা দিয়ে দেবে, অযথা তর্ক করবে না। একথা ভাবতেই ও আরো ঝরঝরে হয়ে ওঠে। তবু একটা অপরাধবোধ, সামান্য কুণ্ঠা মনের মধ্যে থেকেই যায়। আমিনাভাবি নিশ্চয়ই সব পুরনো প্রসঙ্গ তুলবে। যোধপুরের গল্প শুরু হবে। সুরতি ও শঙ্খের কথা জিজ্ঞেস করবে। এমনকি মজা করে সর্বানীর কথাও জিজ্ঞেস করতে পারে। আবার নাও জিজ্ঞেস করতে পারে। অনেক পুরনো কথা যে। শঙ্খ এবছর ক্লাস নাইনে। কিন্তু আমিনাভাবি ওকে এখনো দেখেনি। যাব যাব করেও শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়নি। নাসিমসাহেব অবশ্য শঙ্খকে দেখেছে গতবছর বইমেলায়। একটা 'জাতকের গল্প' উপহার দিয়েছে। পরিতোষও তখন আমনকে দেখেছে। আমন এখন যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং এ তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। বাড়ি থেকেই কলেজ যাওয়াআসা করে। খুব সুন্দর দেখতে। গ্রীকদের মতন নাক, চোখ, মুখের গড়ন, গায়ের রঙ ও উচ্চতা। ওর সঙ্গে ঘন্টাখানেক ঘুরেই শঙ্খ ওর ফ্যান হয়ে উঠেছে। এরপর কয়েকবারই আমন দাদার বাড়ি যাওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে। কলেজের মেয়েদের কাছে সে নিশ্চয়ই ব্লু আইড বয়। আমন মানে শান্তি। নাসিমের ছেলে আমন! শান্তির মূর্তরূপ— ভীষণ শান্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত ওর কথাবার্তা - চলনবলন। শঙ্খের মতন চঞ্চল নয়। অবশ্য চারপাঁচ বছর পর ওর বয়সে শঙ্খ কেমন হবে—কে জানে!

বাবুঘাট পেরিয়ে একটু গিয়েই ট্রেনটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর দাঁড়িয়েই থাকে অনেকক্ষণ। গঙ্গার হাওয়ায় ভেসে আসে পেচ্ছাবের উৎকট গন্ধ। পরিতোষ নাকে রুমাল চাপা দেয়। একটা দুটো করে একঝাঁক মাছি এসে কামরায় ঢোকে। পরিতোষের গা ঘিন ঘিন করে। পুতিগন্ধময় কোন আবর্জনার স্তূপ, মলমূত্রের ঢের থেকে উড়ে এসে ট্রেনের সিটগুলিতে বসছে। যাত্রীদের জামাকাপড়, পরিতোষের প্যান্টে ও হাতে বসতে চাইছে। পরিতোষ রুমাল ঝেড়ে মাছি তাড়ায় আবার নাকে চাপা দেয়। বেপরোয়া মাছিরা আবার এসে বসে; পরিতোষ আবার তাড়ায়। উৎকট গন্ধে গা গুলায়। বমি বমি লাগে। পরিতোষ

সিট থেকে উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে নেমে পড়ার কোন উপায় নেই। দুপাশে আগাছা ও আবর্জনার স্তূপ। তারই মধ্যে কামরার অন্যদিক থেকে খালিগা কোমরে দড়িবাঁধা হাফপ্যান্ট পরা একটি ছেলে এসে দুপাশে সিট ধরে ধরে অ্যারোবেটিকস্ দেখাতে শুরু করে। ওর ঠোঁটে ডটপেন দিয়ে গোঁফ আঁকা। নোংরা ফ্রকপরা ওর বোনটির ঠোঁটে ও পায়ে আলতা, হাতে ঘড়ি আঁকা সে একটা ডুগডুগি বাজাচ্ছে—ডুগডুগ ডুগডুগ। সেই তালে ভাইটি লাফাচ্ছে। সে কখনো হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয় আবার পরমুহূর্তেই একলাফে সোজা দাঁড়ায়। আবার উল্টো হয়ে দুহাত দিয়ে হাঁটতে থাকে কামরাময়। ওর হাফপ্যান্টের পোস্টাপিস খোলা। সে সোজা হলে ওর নুংকু পায়ের আর উল্টো হলে মাথার দিকে টুং টুং করে। পরিতোষ ভাবে, সার্কাসে কিম্বা খেলার মাঠে, সিনেমা কিংবা টি. ভি. তে যাদেরকে অ্যারোবেটিকস করতে দেখা যায়—সবাই নিশ্চয়ই প্যান্ট বা শর্টস এর নিচে জাঙ্গিয়া পরে থাকে। আর ওরা কেউ এরকম লক্ষ লক্ষ ভনভনানির মাঝে রেলের কামরায় অ্যারোবেটক্সের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ছেলেটার লাফঝাপে মাছিরাও ব্যতিব্যস্ত। তবু এত এত মাছির মাঝে যতই লাফাক না কেন ওদের মুখে বুকে হাতে পায়ে ফ্রকে ও খালি গায়ে এমন কি টুং টুং করা কালো রুগ্ন নুংকুতে মাছি বসতে দেখে পরিতোষ। তবু ওরা আসায় এই পুতিগন্ধময় মাঝি ভনভন থেমে থাকা সময়টা একটা গতি পায়। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও এহেন জীবনপ্রবাহ অবাক করে দেয়। সেজন্যেই হয়তো বৈজ্ঞানিক যুগের আগেকার তাবৎ স্থাপত্যকর্মে, কিম্বা চিত্রকলায় সে যেমন জীবনপ্রবাহ খুঁজে পায়, আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলায় কিম্বা আজকের অনুকূল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সমসাময়িকদের শিল্পকৃতিতে তেমনটা পায় না। এই সময়ের জীবনপ্রবাহ অধিকাংশ শিল্পীর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই হয়তো তাদেরকে এত টেকনিক নিয়ে ভাবতে হয়। ঘন ঘন টেকনিক পাল্টাতে হয়। অথচ রাজস্থানী বা হিমাচলী শিল্পীরা, কিন্নর কিংবা মীনাকাররা এমনকি ইউরোপের গথিক শিল্পীরা তো সারাজীবন একই বিষয় নিয়ে কাজ করে গেছে। এদের তো বারবার টেকনিক পাল্টাতে হয়নি।

কেউ কেউ বলে—ওগুলি বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু পরিতোষের তেমন মনে হয় না। বরঞ্চ সে ঐসব চিত্রকলায় এক আশ্চর্য প্রবাহ এবং গভীর জীবনবোধ অনুভব করে। চীন ও জাপানের প্রাচীন চিত্রকলাও তেমনি প্রাণবন্ত এবং আধুনিক। কেউ ওর সঙ্গে একমত নাও হতে পারে ! এই যে ছেলেটি লাফাচ্ছে, আর মেয়েটি ডুগডুগি বাজাচ্ছে, আর মাছিরা ব্যতিব্যস্ত, আর মলমূত্র আবর্জনার গন্ধে এক দরিদ্র কিশোরের অপুষ্ট পুরুষাঙ্গ কখনো তার মাথার দিকে আবার কখনো পায়ের দিকে অবলীলায় টুংটুং করতে করতে বড় হচ্ছে। এই চিত্রে এক অন্যমাত্রা সংযোজিত হয় যখন সে ও তার ছোট বোন হাত পেতে পয়সা নেয়। পরিতোষ জানে, ওরা ভিক্ষে নিচ্ছে না। ওরা পরিশ্রমের বদলে পয়সা নিচ্ছে। আজকের পৃথিবীতে সবচাইতে ভাল বিজনেস শো-বিজনেস. যত তাড়াতাড়ি এই ব্যবসায় পয়সা কামানো যায় আর কোন ব্যবসায় তা নেই। অবশ্য শিল্পীদের চাইতে আড়কাঠিদেরই এখানে বেশি রমরমা। এরাই এন্টারটেইনমেন্ট আওয়ার বিক্রি করে। পয়সা ফেকো তামাশা দেখো। তামাশার ফাঁকে ফাঁকে নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখো অথবা বিজ্ঞাপনের নচ্ছ্রার

ফাঁকে ফাঁকে কাঙ্খিত তামাশা দেখো। দেখতে দেখতে তামাশা ও বিজ্ঞাপন একাকার। দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই ক্রেতা হয়ে ওঠো। শুধু আমরা কেন, মিডিয়ার নকল করে পয়সা উপার্জন করা এই খুদে এন্টাটেইনমেন্ট শিল্পীরাও ক্রেতা হবে। এখনো ওর মুখে আছে কোন চুইংগাম কিম্বা বাবলগাম, লাফাতে লাফাতে সে চিবিয়েই যাচ্ছে যেমনটি চিবায় কোন কোটিপতি ক্রিকেট কিম্বা টেনিস তারকা। এতে নাকি একাগ্রতা বাড়ে।

অথচ এরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, ফুটপাতে কিম্বা রেললাইনের পাশে পুতিগন্ধময় বস্তিতে থাকে, বড় হয় এবং বংশবৃদ্ধি করে। এদের লেখাপড়ার বালাই নেই, জীবনমৃত্যুর পরোয়া নেই, লক্ষ মাছি ও অজস্র কৃমিকীটদের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে উঠতে এভাবে নতুন প্রজন্ম, বিশ্বের ভবিষ্যৎ নাগরিকবৃন্দ ক্রমশঃ ঢালাও বিজ্ঞাপনে মন কেড়ে নেওয়া বহুজাতিক কোম্পানীগুলির তৈরি নানা চটকদার পণ্যের ক্রেতা হয়ে উঠছে। সেজন্যে ওরা পয়সা কোথায় পাবে, এভাবে এন্টারটেইনমেন্ট এর চেষ্টা করে পয়সা উপার্জন করবে কজন? অন্ধকার জগতের জন্য চাই পেশীশক্তি, সন্ত্রাসবাদের জন্য চাই পেশীশক্তি, সুইসাইড স্কোয়াডের জন্যে চাই আপাতঃ আয়েসকাঙ্খী বর্তমানে সুখ চাওয়া অসংখ্য মাছি, যাদের মৃত্যু নিয়ে তেমন হৈ চৈ হবে না। টাকা দিয়ে ওর পরিবারের মুখ বন্ধ করে ওরই ভাই কিংবা প্রতিবেশী কিশোর কিম্বা সদ্যযুবককে পরবর্তী মিশন, পরবর্তী অপারেশন এর জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে।

পরিতোষ মেয়েটির হাতে পাঁচটাকার একটা কয়েন তুলে দেয়। আর তখুনি ট্রেন চলতে শুরু করে। ও কয়েন না দিলে যেন চলতো না। কামরার আলো জ্বলে ওঠে। ও কয়েন না দিলে যেন জ্বলতো না। বহুবছর পর কলকাতায় আবার যখন তখন পাওয়ার কাট যখন তখন লোডশেডিং শুরু হয়েছে। মাঝেমধ্যে রেলও এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। যদিও এমনটি হওয়ার কথা নয়। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কিম্বা সি. ই. এস. সির মতন রেলের কোন বকেয়া নেই। তবু কত কী যে হয়! সবকিছুর ব্যাখ্যা মেলে না। এ সময়ে সবই সম্ভব।

ট্রেন যখন প্রিন্সেপ ঘাটে থামে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চারপাশে ছেয়ে গেছে। যদিও মাথার উপর দ্বিতীয় হুগলী সেঁতুর ঝলমলে আলোকময় পুরো নদীবক্ষ ও চারপাশকে আলোকচ্ছটায় স্বপ্নিল করে তুলেছে। ট্রেনটা আসতে দেরী করায় অপেক্ষমান যাত্রীরা বাসে কিম্বা মিনিবাসে করে চলে গেছে। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। একপাশে আরো দুটি ফ্রকপরা মেয়ে তেমনি ডুগডুগি বাজাচ্ছে আর পাঁচ-ছটি নানাবয়সী কিশোর অ্যারোবেটিকস করছে। দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্ম একদম খালি হয়ে গেলেও ওদের অ্যারোবেটিকস্ থামে না। বরঞ্চ যতক্ষণ ট্রেনটা দাঁড়িয়ে থাকে একটা খালি কামরার নানাদিকে ওরা ছড়িয়ে পড়ে অ্যারোবেটিকস্ করতে থাকে। পোস্টাপিস খোলা ছেলেটিও ওদের সঙ্গে ছন্দে ছন্দে লাফাচ্ছে। পরিতোষের মনে হয় আগে দেখা মেয়েটি ওর বোন না-ও হতে পারে। সে এখন অন্য ছেলেদের কাছে গিয়ে বাজাচ্ছে। এটা কি ওদের ট্রেনিং সেন্টার?

তাই হবে! শ্লথপায়ে প্ল্যাটফর্মের মেনগেটের দিকে এগুতে গিয়ে পরিতোষ দেখে

পোস্টাপিস খোলা ছেলেটি ও আরেকটি ছেলের মাঝে দাঁড়িয়ে এখন ডুগডুগি বাজাচ্ছে আরেকটি মেয়ে। কপালে লাল ফিতে বাঁধা উনিশকুড়ি বছর বয়সী একটি ছেলে ঘুরে ঘুরে ওদের লাফঝাপ দেখছে আর মাঝেমধ্যেই একে ওকে শুধরে দিচ্ছে। নিজে করে দেখাচ্ছে। এই পেশাদারিত্ব পরিতোষের ভাল লাগে। দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কেরামতি দেখতে ইচ্ছে করে।

তবু সে স্টেশান থেকে বেরিয়ে আসে। না, কোন কালোকোট পরিহিত ভদ্রলোক ওর দিকে হাত বাড়িয়ে আসেন নি বলে জীবনে প্রথমবার জরিমানা দেওয়া থেকে রেহাই পেল। একটা গুমটি মতন দোকান থেকে সিগারেট কেনে পরিতোষ। আর তখনই সম্ভবতঃ কোন রেলকর্মীকে কাগজে মুড়ে একটা 'সী পিরেট' রামের পাইট নিতে দেখে। ওর ভেতরটা কেমন করে ওঠে। হঠাৎ করে এসে পড়া প্রিন্সেপ ঘাট, গঙ্গার বাতাস, আলো ঝলমলে বিদ্যাসাগর সেতু আর গঙ্গার স্রোত তেমনি কাঁপা কাঁপা প্রতিফলন এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমোঘ কিছুর সম্ভাবনা তৈরি করে। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে দোকানের ছেলেটি হেসে বলে—নিপ ও আছে স্যার! 'ওল্ড মংক' এর হবে। আবার সম্বোধনের শৃঙ্খলধ্বনি! পনের ষোল বছর বয়সী ছেলেটি কি ক্রেতার মন পড়তে পারে। ওর জহুরির দৃষ্টি পরিতোষকে অবাক করে। লাইনে লেগে থাকলে ছেলেটি নিশ্চয়ই উন্নতি করবে!

পরিতোষ তক্ষুনি দাম মিটিয়ে একটা নিপ পকেটস্থ করে। এক প্যাকেট কাজুবাদাম কেনে। পাঁচটাকা জমা রেখে ছেলেটি একটি কাঁচের গ্লাসও দেয়। থার্মোকলের বাক্স থেকে দু'চার টুকরা বরফও দেয়। এতো দেখছি সোনায় সোহাগা। পরিতোষ চনমনে হয়ে ওঠে।

প্রিন্সেপ ঘাটের সিঁড়িতে বসে বহুদিন পর যেন কয়েকশতাব্দী পর রামের গ্লাসে চুমুক দেয়। প্রায় নীটই খায় সে। ওই বরফ গলে যতটুকু জল তাই দিয়ে সঙ্গে একটা একটা করে কাজুবাদাম—খারাপ লাগে না।

না, আজ আর নাসিম সাহেবের বাড়ি যাবে না। এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তারপর হেঁটে হেঁটে বাবুঘাট আর সেখান থেকে বাসে করে পত্রিকা অফিসে যাবে। অবশ্য পুরো পথটাই হেঁটে যেতে পারে, তিনচার কিলোমিটারের বেশি তো আর দূরত্ব হবে না। চুমুক চুমুক মদের সঙ্গে সিগারেটের টান দিতে দারুণ লাগে। আর আকাশ আর নদী আর দূরে বাবুঘাট থেকে স্টিমারের পারাপার, ওপারের বাড়িঘর মন্দির মসজিদ গীর্জার প্রাচীন আলোকমালা আর বাতাস আর বাতাস। আর রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে যাওয়া অ্যালকোহলের আচ্ছন্নতা, মস্তিষ্কের কোষে সিগারেটের ধোঁয়া, মানুষের আমেজের জন্য তৈরি এসব নেশা চমৎকার। হোক ক্ষতিকারক।

আঃ এই মুহূর্তে মরে গেলে কত ভাল হয়। কেউ জানে না আমি এখানে আছি আমার কাছে কোন পরিচয়পত্রও নেই। আমার পার্সে কোন নাম লেখা নেই। আমার শরীরে কোন উল্কি আঁকা নেই। আমার ব্যাগে হ্যাঁ, শুধু আমার ব্যাগে রাখা পাণ্ডুলিপিতে আমার নাম লেখা আছে। মরার আগে এই পাণ্ডুলিপিটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ভাসিয়ে দিলে কেমন হয়? আমার উপন্যাস ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে পড়বে অনেকদূর। তারপর আর উপন্যাস

থাকবে না, বিভিন্ন কাগজের কুটিতে বিভিন্ন শব্দ বা কয়েকটি অক্ষর যা দিয়ে কোনদিন কোন শব্দ গঠিত হয়েছিল বলে বোঝা যাবে না। আমি গিয়ে গঙ্গায় ডুবলে, কিছুক্ষণ পর আমিও ওদের সঙ্গে ভাসতে পারবো। অবশ্য অনেক অনেক পরে। আমার ভেসে উঠতে কয়েকঘন্টা লাগবে। ততক্ষণে অক্ষরগুলি অথবা শব্দগুলি ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে জলে ধুয়ে যেতে যেতে অনেকদূর চলে যাবে।

আচ্ছা, মাছেরা কি শব্দ খায়? পরিতোষের হাসি পেয়ে যায়। কাগজে লেখা শব্দ যখন জলে ভাসবে তখন তো আর কেউ সেটাকে উচ্চারণ করবে না! উচ্চারণ না করলে বাতাসে কোন কম্পন সৃষ্টি হবে না। বাতাসকে কাঁপাতে না পারলে কোন শব্দই তো আর শব্দ হয়ে উঠতে পারে না, শুধু নিরালম্ব অক্ষর হয়ে থাকে। আত্মার মতন, অবশ্য যদি আত্মা বলে কিছু সত্যি সত্যি থেকে থাকে। তাহলে তো পরিতোষ নিজেই নিজের মৃতদেহকে এবং এইসব ভাসমান অক্ষরগুলিকে দেখতে পাবে! কেমন করে দেখবে? আত্মার কি চোখ থাকে? চোখ ছাড়া কি দৃষ্টিশক্তি থাকে? চোখ দুটি তো দেহের সঙ্গেই খোলা অথবা বন্ধ অবস্থায় ভাসতে থাকবে তাহলে—

তখুনি গুমটির ছেলেটি এসে ওর কাছ থেকে গ্লাসটা চেয়ে নেয়। ও দোকান বন্ধ করবে। ওকেও চলে যেতে বলে। 'এক্ষুনি ডিউটিতে পুলিশ আসবে স্যার!' পরিতোষ ভাবে,—আঃ, আবার পরিচয়ের শিকলধ্বনি। সে ছেলেটির দেওয়া পাঁচ টাকা পকেটে ঢুকিয়ে ওকে হাত নেড়ে যেতে বলে। আর তখনই বিদ্যুৎ চমকের মত ওর মনে পড়ে,—আরে আমি যে আই ব্যাঙ্কে চক্ষুদান করেছি। এমনি ভেসে গেলে আমার চোখদুটি যে কোন অন্ধ মানুষকে চক্ষুষ্মান করে তোলার কাজে লাগবে না! কাজেই এভাবে মরা চলবে না। যতই গঙ্গার বুক থেকে দামাল হাওয়ার ঝাপটা আসুক! যতই বাতাসে মিশে থাকুক অতিপার্থিব এক আঁশটে গন্ধ!

সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে বোতলে আরো পেগখানেক মদ রয়েছে—প্যাকেটে দু-চারটে কাজুবাদামও রয়ে গেছে। সে বোতলটাকে মুখের সামনে নিয়ে পুরোটা নীট মেরে দেয়। অথচ গলা জ্বলে না, অথচ তেতো লাগে না। বুঝতে পারে অনেকদিন পর খেয়েছে তাই অনেক নেশা হয়েছে। এখন আলাদা কোন স্বাদ আর পাচ্ছে না। কাজুবাদাম ক'টি মুখে দেয়। তারপর চোখ বন্ধ করে চিবোয়। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেও হুগলী সেঁতুর আলোকমালা, গঙ্গা ও অন্যপারের দালানকোঠার আলোগুলি সব ওর সামনে জেগে থাকে। তেমনি বাতাসে তার জামা নৌকার পালের মতন ফুলে ফুলে ওঠে। সে টের পায়, কিন্তু ভেসে যায় না। জলে ডোবা মানুষের শরীর যখন একসময় ভেসে ওঠে তখনো হাওয়া ঢুকে জামাটা কচ্ছপের পিঠের মতন কিম্বা বিশাল একটা ফুটকা মাছের মতন ফুলে থাকে—কিন্তু এতে কোন গতি বাড়ে না! যে ঘাটে এসে মৃতদেহটি আটকে পড়ে, সেখানে কাক চিল শকুনিরা এসে জড়ো হয়। তার আগেই হয়তো মাংসাশী মাছেরা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে একটা আস্ত শরীরকে কঙ্কালের উপর কিছু দলা দলা মাংসে পরিণত করেছে। যদি জীবিত কারো চোখে পড়ে, ডেকে ডেকে আরো মানুষ জড়ো করে কেউবা পুলিশ ডাকে। সমবেত জনতা আহা উঁহু করে। পুলিশ এসে মর্গের ডোমসহ ট্রেকার ডাকে,

শনাক্ত করার চেষ্টা করে, ঠেলায় কিংবা ট্রেকারে চাপিয়ে মর্গে পাঠায়। সবাই থেকে থেকে বুকভরে জোরে প্রশ্বাস নিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ততক্ষণ অজস্র মাছি এসে ভন ভন করে। ভনভন করে কালো কালো ছোট মাছি, ভনভন করে নীল রঙের ডেয়ো মাছি আর গুড়ি গুড়ি আরো সব মৃতজীবী পতঙ্গ। গন্ধ ছড়ায়। ঐ পুতিগন্ধময় থেমে থাকা সময়ে গতি আনে শুধু একদল হাফপ্যান্ট পরা খালি গা কিশোরের লাফঝাপ, নোংরা ফ্রক পরা কিশোরীর ডুগডুগির ডুগডুগ ডুগডুগ ছন্দে ওরা অ্যারোবেটিকস্ করে। ওদের মধ্যে যে ছেলেটার পোস্টাপিস খোলা তার ঠ্যাং দুটি যেন আরো লম্বা হয়েছে, গায়ে কিছুটা মাংস লেগেছে, তার মানে সে যুবক হয়ে উঠছে! আর তাকে গোঁফ আঁকতে হবে না, অচিরেই নিজস্ব দাঁড়িগোফ গজাবে। আরে, ওর মুখটা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, গায়ের রঙ কিছুটা ফর্সা, ঠোঁটের উপর বেশ বড় বড় লোমে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ছেলেটা আগের মতন হাসিখুশি নেই। কেমন বিরক্তিভরা অথচ মায়াবী চোখে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর তারপর চোখাচোখি হতেই অবাক বিস্ময়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পরিতোষ ভালো করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, আরে,—এ যে শঙ্খ, আমার সন্তান শঙ্খ! বাবা সোনা আমার, তোর জন্যেই আমি বেঁচে আছি রে!

আবার ভাবে, সে কি আদৌ বেঁচে আছে? চোখে কিছু দেখতে পেলেই বেঁচে থাকা যায়? দুচোখে কিছুই দেখতে না পেয়েও দৃষ্টিহীনরা তো বেঁচে থাকে। তাহলে? তার জামা কি এখন পালতোলা নৌকার মতন ফুলে ফুলে গতিশীল, নাকি বেলুনের মতন ফুলে উঠে স্থির! একটা আজব আকৃতি, পরিতোষের সমস্ত অস্তিত্ব ঝাকিয়ে না জানি কেন একটা আর্ত চিৎকার নাভিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়েও গলার কাছে এসে থমকে যায়। আর তারপর সেই চিৎকারের বেলুন ফেটে অদ্ভুত নীল রঙের বিষাক্ত বাতাস শঙ্খের দিকে ধেয়ে যায়। পরিতোষ এটা চায়নি।

পরিতোষ এটা চায়নি কক্ষনো, কোনদিন চায়নি—তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ বিষাক্ত নীল বাতাস থেকে ছেলেকে রক্ষা করতে যায়। কিন্তু পারে না। শঙ্খই ঐ বাতাসে ধীরে ধীরে স্ফটিকের মত হয়ে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যায় আর পরিতোষ গঙ্গার ঘাটে একটা সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচের সিঁড়িতে আছড়ে পড়ে। সে টের পায় কিন্তু নড়তে পারে না।

দূর থেকে একটা টিনটিন টিনটিন ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়। তারপর থেমে যায়। সামান্য নিস্তব্ধতার পরই কারো পায়ের শব্দ আর নিক্বণ শোনা যায়। পরিতোষ কাউকে দেখতে পায় না। উৎকর্ণ থাকে। পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে কাছে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। আর তারপর আবার সিঁড়ি ভেঙে জলের দিকে নেমে যায়।

পরিতোষ তাকিয়ে দেখে ঘাগরা চোলি পরিহিতা এক যুবতী। তার ওড়নার পুতি কিম্বা সোনালি রূপালি ধাতব ঝালরে হুগলি সেতুর আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এই আলোআঁধারিতে মেয়েটি ওড়না খুলে ঘাটে রাখে, তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত আভরণ খুলে রেখে প্রবহমান চকচকে কালো জলে প্রতিফলিত নানা আলোকের মাঝে সিল্যুটের মতন ধীরে ধীরে নেমে যায়। হাঁটু জলে, কোমর জলে, বুক জলে। সে কি ডুবে যাবে? সে কি সত্যি

কোথা থেকে এসেছে, নাকি শঙ্খের মতনই ওর ভ্রম মাত্র। সে কী ওর খোয়ড়ি থেকে উঠে আসা যুবতী বিদ্যুৎ। পরিতোষ কিছু বলার আগেই যুবতী এবার জলে ডুব দেয়। পরিতোষের দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু তখনই অন্ধকারে যুবতী আবার শুশুকের মতন উঠে দাঁড়ায়। পরিতোষ ভাবে, ও তাহলে ডুব দিয়ে স্নান করছে! যুবতী আবার ডুব দেয়। আবার চারিদিকে জল ছড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। হাত দিয়ে গা মুখ কচলায়। আবার ডুব্ দেয়। এবার আর ওঠে না। পরিতোষ আবার শ্বাস ফেলতে পারে না—অনেকক্ষণ, প্রায় একমিনিট পর মেয়েটি আবার উঠে দাঁড়ায়। আর তারপর ধীরে ধীরে উঠে এসে আবার সিঁড়িতে দাঁড়ালে তার শরীরের জল ফসফরাসের মতন আলো ছড়ায়। এ যেন জলপরী। পরিতোষের পুরুষাঙ্গ জেগে ওঠে। তার মানে সে বেঁচে আছে। যুবতী গা মুছে একটা একটা করে পোশাক পরতে থাকে আর পরিতোষ আরো স্ফীত হয়। তার মানে সে সত্যিই বেঁচে আছে। যুবতী সিঁড়ি বেয়ে আবার ওর দিকে এগিয়ে আসে; ওর কাম প্রবল হয়ে ওঠে। ইচ্ছের রক্তপ্রবাহে ফুঁসতে থাকে সে। পরিতোষ উঠে বসে। যুবতী থমকে দাঁড়ায়। কোন্ সে নক্ষত্রলোক থেকে একরাশ সোনাঝরা আলোকছটা ওর সমস্ত শরীরে শিহরন জাগায়। সে ভাবে, না, এই নদী এখন শুধু নিবিড় এক অভিমান স্রোতই নয়, যার শুধু শব্দ শোনা যায়। গাঢ় কালো হয়ে ওঠা রক্তের ধারার মতন সেই অভিমান। নদীর অভিমানে নীরব প্রতিবাদের কণারা লুকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় অবলীলায় এক অতৃপ্তিমাখা উপন্যাসের চরিত্রকেও মূর্ত করতে পারে গোপন উচ্ছ্বাসে! একী! বুকের রক্ত চলকে ওঠে।

দূর থেকে ভেসে আসা মেঘের শব্দের মতন পরিতোষ অবাক বিস্ময়ে উচ্চারণ করে, -মু-ম-ল!

বাতাস ফিসফিস করে বলে—কৌন? রাণো? ম-হে-ন্-দ্র?

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBR
42793
02.07.2011

দুই

তোমার বিদ্যুৎ বিদীর্ণ বুকে আদিম কিংশুক
মুখর দুর্যোগে কোন্ সংসার পেতেছো?
সুবর্ণ আঁচলে বাঁধা মনিময় একমুঠো সুখ
আমি খুলে নিতে চাই মাঝরাতে শব্দ করো না
নিঃশব্দে জড়াও তুমি এই বুকে স্বর্গ সুষমা
সেই মুগ্ধ গোপনতা আমি ছাড়া কেউ তো জানে না।
লাজুক লতার মতো ছড়াও মাধুরী তুমি আদি মৃত্তিকায়

—মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

এরকম অদ্ভুত নিস্তব্ধ অরণ্যপথ আর দেখেনি সে। এতক্ষণ ধরে একটা পাখির ডাকও

শুনতে পায়নি। অথচ গাছগুলি সদ্য যুবতীদের মত এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুহাত মাথার উপরে তুলে আকাশ দেখছে সব। রানা কুমার মহেন্দ্র উত্তেজনায় টানটান। এ সময়ে মাথা ঠিক রাখতে হবে। ঘোড়ার লাগামটা শক্ত হাতে ধরা। এ পথ ভীষণ জটিল। মাকড়সার জালের মতন ভুলভুলাইয়া গোলকধাঁধা। সেজন্যেই ধীরগতিতে এগুচ্ছে। অবশেষে পাঁচানো পথটা একটা সুদৃশ্য সিংহদুয়ারের কাছাকাছি পৌছুতেই দেখে ফটকের দুপাশে দুটো বাঘ ঝাপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ওদেরকে দেখতেই বাঘ দুটি গর্জন করে ওঠে। বাবলা গাছের ডাল থেকে একঝাঁক তোতাপাখি উড়ে চলে যায়।

ঘোড়ার সামনে নাতির নামে যে মেয়েটি গুটিগুটি এগুচ্ছিল সে ভয়ে চিৎকার করে ছুটে এসে রাণার বাঁ পা'টাকে জাপটে ধরে কাঁপতে থাকে।

-- ফিরে চলুন রাণাসা, নাহলে বাঘদুটো আমাদের দুজনকেই—

প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছে। গাছের শুকনো পাতারা উড়ে উড়ে যাচ্ছে রাণা বাঁহাতে নাতিরকে সামলে ডানহাতে ডালটাকে শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেস করে,

—যখন আমাকে আনতে যাচ্ছিলে তখন এরা কোথায় ছিল?

নাতির কাঁপতে কাঁপতে বলে,—তখন ছিল না, একি আপনি এখনো এগুচ্ছেন কেন? ফিরে চলুন! শুকনো পাতার উপর দিয়ে সরসর করে একটা গোখরো সাপ পাকদণ্ডী পার হয়ে যায়। মহেন্দ্র ওর বাঁপায়ে নাতিরের বুকের কাঁপন টের পায়। তবু একটা খটকা লাগে। তখুনি সে ক্ষিপ্রগতিতে ডানহাতের ভালটাকে একটা বাঘের মাথায় ছুঁড়ে মারে। ভালটা ঝনঝন ধাতবশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়লে রাণার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে। সে আলতোভাবে নাতিরের গাল টিপে দিয়ে বলে,—'অনেক নাটক হয়েছে, এখন এগিয়ে চল সুন্দরী, বাঘদুটোর পিঠে একটু হাত বুলাতে ইচ্ছে করছে!' নাতির চোখ তুলে তাকায়। দুষ্টুমিভরা মিষ্টি চাহনি। এখন ওর দৃষ্টিতে প্রশংসা। নিজের ঘাগড়াটিকে দুহাতে একটু উঁচু করে ছাড়িয়ে ধরে ঘোড়ার আগে আগে সে কোমর দুলিয়ে হাঁটতে শুরু করে। যতক্ষণ না ওরা সিংহদুয়ার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছে বাঘ দুটো তেমনি লেজ নাড়িয়ে গর্জন করতে থাকে। সিংহদুয়ারের ওপারেই সৌন্দর্যের হাতছানি। ভেতরে পা রাখতেই বাঘদুটো যেন পাথরের মূর্তি হয়ে পড়ে। গর্জন থেমে যায়। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহেন্দ্র একটা বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে,—বাহ্! শিল্পীর হাতে জাদু আছে!

—ঠিক বলেছেন রাণাসা! কিন্তু জানেন কি এর কারিগর কোন পুরুষ নয়, একজন নারী! নাতির রহস্যঘন দৃষ্টিতে মুচকি হেসে বলে।

—তাই নাকি, কে সেই পারিজাত শিল্পী? মহেন্দ্রর জিজ্ঞাসু চোখ চকচক করে ওঠে।

—সব বলবো আপনাকে, আগে লাগাম থেকে আমার চুলের বেণীটা খুলে দিন! এখানেই ঘোড়া রাখতে হবে!

মহেন্দ্র বিজয়ীর মতন ঘোড়া থেকে নামে। এখনো জোর বাতাস বইছে। নাতিরের চোলি ফুলে ফুলে উঠছে। ঘোড়ার লাগাম থেকে লম্বা বেণীটা ছাড়িয়ে মহেন্দ্র নিজের

হাতের মুঠোয় নেয়। নাতির ওকে নিয়ে কাকমহলে ঢোকে। এ ঘর সে ঘর পেরিয়ে একটা সুসজ্জিত প্রশস্ত ঘরে গিয়ে ঢোকে। আশপাশের কোন কামরা থেকে ইমন কল্যাণ রাগে সেঁতারের মুর্চ্ছনা শোনা যায়। কে এত সুন্দর বাজায়! ঐ ঘরে সাতটা কারুকার্যমণ্ডিত সুদৃশ্য খাটে জরির কাজ করা সাতরঙের মখমলের চাদর বিছানো। নাতির বলে,—আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি উপরমহলে গিয়ে রাজকুমারী মুমলকে খবর দিচ্ছি!

তারপর মিষ্টি হেসে বলে,—একি, বেণীটা ছাড়ুন, আমাকে ধরে রাখলে চলবে?

মহেন্দ্র ওর বেণী ছেড়ে দিতেই নাতির এক মুহূর্তে ভোজবাজির মতন উধাও। তক্ষুনি সেঁতারে বেজে ওঠে একটা করুণ সুর। কে এত করুণ সুরে সেঁতার বাজাচ্ছে? কী তাঁর মনের দুঃখ? রাণার মন কেমন করে।

সে বসার জন্যে পালঙ্ক সাতটার দিকে তাকায়। কোথায় বসা যায়! আচমকা ওর মাথায় কিছু খেলা করে। সে কোন পালঙ্কে না বসে একটি পালঙ্কের উপর নিজের এক পায়ের ভার রাখে। পা রাখতেই হুড়মুড় করে পালঙ্কটি নিচে কুয়োয় ঢুকে যায়। এবার মহেন্দ্র বাকি ছটা পালঙ্কেও এক এক করে পা রাখে। দেখতে না দেখতে পাঁচটা পালঙ্ক গহ্বরে ঢুকে পড়ে। শুধু একটা খাট বাকি থাকে। মহেন্দ্র মৃদু হেসে সেই পালঙ্কে বসে পড়ে। আর আশ্চর্য তখনই সেঁতারে করুণ সুরের মূর্চ্ছনা থেমে যায়। একটা মেয়েলি হাসি খিলখিলিয়ে ওঠে। একটা জানালা খুলে মাথা বের করে নাতির বলে,—শুভেচ্ছা রইল রাণাসা, আপনি অন্তিম পরীক্ষায়ও উতরে গেলেন! সত্যিকারের নির্ভীক আর বিচক্ষণ আপনি!

—আরে তুমি, এখনো এখানেই লুকিয়ে রয়েছো, যাওনি?

—হৃদয়টাকে একটু সামলে রাখুন, এই যাব আর আসবো! নাতির আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। অদৃশ্য সেঁতার আবার আগের মতন ইমনকল্যাণে সুরের বিস্তার ঘটায়। মহেন্দ্র গোঁফে তা দেয়। ছটফট করে। ইমনকল্যাণের আরোহ অবরোহ ওর হৃৎস্পন্দনের গতিকে সামলাতে পারে না। এরকম মানসিক অবস্থায় পৃথিবীর কোন সঙ্গীতই মানুষের কানে ঢোকে না। তবু সে মনকে শান্ত রাখার জন্যে ইমনকল্যাণে মন দিতে চেষ্টা করে।

এটুকু পড়ে শোনাতেই যুগলজী উঠে দাঁড়িয়ে পরিতোষের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, —বহুত খুব, বহুৎ খুব!

নাসিম সাহেব বলে ওঠে,—বাঃ! তুমি তো দেখছি সুন্দর হিন্দী লেখা শিখে গেছ! যুগলজী বধাই হো!

যুগল পরিহার পরিতৃপ্ত হেসে বলে,—ধন্যবাদ!

পরিতোষ ওঁর কাছে হিন্দী শেখে। নাসিমসাহেব ভাষার ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুতে। যুগলজীও তেমনি নাক উঁচু টাইপের লোক। ওদের মুখে এই প্রশংসা পরিতোষের ভাল লাগে। তখন আকাশে মেঘ ডাকে। যুগল পরিহারের বাগানে কোত্থেকে এক ময়ূর দম্পতি এসে জুটেছে। মরুশহরের আকাশে এত বিচিত্র রঙের মেঘের খেলা আগে কোনদিন

দেখেনি সে। ঘন্টাদুয়েক আগেই সূর্য উঠেছে। কিন্তু মেঘমালার সাড়ম্বর আগমনে আজকের সকাল উৎসবের সাজে সেজে উঠেছে। পরিতোষ বলে,—যুগলজী রামঅবতারকে খবর দিন, এই আকাশটার ভিডিও করে রাখুক! যুগলজী এই প্রস্তাবে খুশী হয়ে বারান্দা থেকে উঠে বৈঠকখানায় গিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরান। নাসিম সাহেব হেসে বলে,—যুগলজীর ফোনটা দেখতে একটা মোষের বাচ্চার মাথার মতন!

পরিতোষ পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখে—তাই তো! পর্দাটা হাওয়ায় উড়ছে। পরিতোষ বলে,—তাহলে 'মুমলরাণো'র স্টোরিলাইন যুগলজির পছন্দ হয়েছে। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা জোগাড় করতে ১৯৭২ থেকে ১৯৮৩ প্রায় একযুগ ধরে যুগলজী বেশ পরিশ্রম করেছেন। পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের বিখ্যাত কবি শাহ্ আব্দুল লতিফ, সচল 'সরমস্ত' এবং হাফিজের রচনাগুলি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন, হিন্দীর প্রসিদ্ধ লেখক রাম পঞ্জবাণী ছাড়াও রাজস্থানী লেখিকা রাণী লক্ষ্মীকুমারী চুড়াবতের লেখা প্রবন্ধগুলিও ওঁর গবেষণাপত্রে স্থান পেয়েছে! নাসিম সাহেব মুচকি হেসে বলে,—হুম! আমি রাজস্থান পত্রিকায় যুগলজীর লেখা পড়েছি! সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জে. এবোট, তিন সিন্ধী কবির বর্ণনা আর ঐতিহাসিক স্যার এইচ. এম. ইলিয়েটের সঙ্গে যুগলজীর তথ্যাবলীর মিল পেয়েছি। কিন্তু যুগলজী সবখানে উমরকোট লিখেছেন, অথচ 'র মেটেরিয়ল অফ সিন্ধী লিটরেচার' এর লেখক এল. এইচ. অজবানী এই উমরকোটকে অমরকোট বা অমর কা কিলা' লিখেছে।

তখন যুগলজী আবার এসে চেয়ারে বসলে পরিতোষ অমরকোট প্রসঙ্গ তোলে। সে বলে,—আমাদের 'সূর্যনগরী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কেন্দ্রীয় মরু অনুসন্ধানশালার অমলকুমার সেনও 'অমরকোট' লিখেছেন! যুগলজী হেসে বলে,—উমর নামেও একজন বিখ্যাত রাজপুত বীর ছিল। আমি মুমল-মহেন্দ্র প্রেমগাথা 'মারুনী'তে ও এই নাম পেয়েছি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুমেররা তখনো ইসলাম ধর্ম নেয়নি ; ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জয়শলমীর থেকে সত্তর পঁচাত্তর কি.মি. দূরে উমরকোটের রাজসিংহাসনে বসে হামীর সুমরা। তাঁর তিন মন্ত্রী। ডংবর সিংহ ভাটী, সিন্‌হিড়ো ধমাচানী আর রাণা কুমার মহেন্দ্র সোঢ়া। দ্বাদশ শতাব্দীতে উমরকোট সোঢ়া রাজপুতদের দখলে ছিল। সুমেররা ওদেরকে হারিয়ে সিংহাসন দখল করলেও উমরকোটে সোঢ়াদেরকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো!

নাসিমসাহেব বলে,—মহেন্দ্রর দিদিকে তো সোঢ়া রাজপরিবারের কন্যা হিসেবে হামীর সুমরা মহারাণীর মর্যাদা দিয়েছিল!

যুগলজী বলে,—এগজাক্টলী! মহেন্দ্রর কাব্যপ্রতিভা এবং শিল্পী মনোভাবের জন্যে হামীর সুমরার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বও ছিল প্রগাঢ়!

মিসেস পরিহার চা ও এক থালা ঘরে তৈরি গরম গরম ভুজিয়া নিয়ে আসে। আর তখনই গেট ঠেলে ঢোকে রাম অবতার। মিসেস পরিহার বলে,—আমি জানতাম, তাই চার কাপ চা-ই এনেছি! রামঅবতার বলে,—তাই নাকি, ঠিক আছে, দিন চা, তারপর কাহানী

শুনবো, তারপর আজকের আকাশের রেকর্ডিং দেখাবো, আমার ছাদ থেকে রেকর্ড করেছি!

রাম অবতার যুগলজীর সঙ্গে গিয়ে লোদ্রভা ও উমরকোটের ভিডিও এনেছে। সেই অনুযায়ী মনডোর ও কাইলানায় ফিল্মের শুটিং এর জন্য প্রাকৃতিক সেট তৈরি হবে। মনডোর ও কাইলানায় রয়েছে আরাবল্লীর দুটি আলাদা শৃঙ্গ। পরিতোষের স্টোরিলাইন সবার পছন্দ হলে সে-ই এই ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখবে। অবশ্য তারপর যুগলজী সম্পাদনা করবে।

চা খাওয়া হয়ে গেলে পরিতোষ আবার পড়তে শুরু করে। অন্যরা তখনো গরম গরম ভুজিয়ার স্বাদ নিচ্ছে। পরিতোষ পড়ে,—১৩৪০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। বসন্ত বিদায় নিয়ে সবে গ্রীষ্মের দিনগুলি...

রাম অবতার বলে,—সন তারিখ লেখার দরকার ছিল কি?

যুগলজী বলে,—মাঝখানে টোকো না রাম, আমরা তো আর ফিচার ফিল্ম বানাচ্ছি না, তথ্যচিত্রটাকেই একটু অন্য কর্ণার থেকে বানাচ্ছি। তথ্যচিত্রে সন্ তারিখ থাকবেই। কী বলেন নাসিম সাহেব?

নাসিম সাহেব মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, তবে এটা অনুমান মাত্র। হামিরই সুমরা বংশের শেষ রাজা। সে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হামির হাম্মু মহম্মদ নাম নেয়। আর ১৩৫২ সালেই না-জানি কেন দ্রাগুল পাহাড়ে পালিয়ে যায়। ১৩৫২ সালেই সে পাঞ্জাবে ফতেহ মসজিদ স্থাপন করে। ১৩৮২ সালে বর্তমান পাকিস্তানের প্যারেন্ডেজ গুজরাতে সাম্মাদের হাতে হামির হাম্মি মারা যায়। যাইহোক,—পরিতোষ পড়ো—'

পরিতোষ পড়ে,—বসন্ত বিদায় নিয়ে সবে গ্রীষ্মের দিনগুলি শুরু হয়েছে। হোরী উৎসবের আবীর গুলালের রঙ তখনো গা থেকে উঠে যায়নি। হামীর সুমরা তাঁর তিন মন্ত্রী আর কিছু সিপাহী নিয়ে গহন অরণ্যে শিকার করতে বেরিয়েছিল। তখন লোদ্রভা আর উমরকোট সবুজ অরণ্য ছিল। শিকারীরা একঝাঁক হরিণের পেছনে ধাওয়া করে ক্রমে গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়ে। তবে রাজস্থানের অরণ্য সে যতই গভীর হোক; যতই নিবিড়তা থাকুক না কেন, কখনোই তা অসূর্যম্পশ্যা ছিল না। মাঝদুপুরের খররোদে জঙ্গলের বেলেমাটি ভীষণ গরম হয়ে উঠতো। সেদিন তেমনি ঝলসানো উত্তাপে ঘেমে নেয়ে ওরা আরাবল্লী পর্বমালার দুই শৃঙ্গের পাদদেশে কুলকুল বহমান খরস্রোতা কাকনদীর কিনারায় পৌঁছে বিশ্রামের জন্য তাঁবু গাড়ে। ওদেরকে দেখতে পেয়ে কিছু বনজ ফলমূল নিয়ে কয়েকজন আরণ্যক আদিবাসী এসে ভীড় করে। ওদের কাছ থেকে ফলমূল উপহার পেয়ে রাজা ও মন্ত্রীরা খুশী। হামীর সুমরার আদেশে সৈনিকরা ওদেরকেও রুটি খেতে দেয়। খেতে খেতে রাজা ও পরিষদরা তখন আদিবাসীদের সঙ্গে এই জঙ্গল ও অঞ্চলের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলে। কথায় কথায় আদিবাসীরাই প্রথম এদেরকে মুমলের কথা বলে। আদিবাসী সর্দার ওদেরকে পাহাড়ের ওপারে যেতে বারণ করে।

এদের আতঙ্কিত চেহারা দেখে রাজা ও পরিষদরা অবাক। আদিবাসীরা মুমলকে

ডাইনীর মতন ভয় পায়। ওরা তখন আরো খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে যে পাহাড়ের ওপারে একটা আজব মহল রয়েছে। সেখানে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা থাকে। কিন্তু পথ খুব দুর্গম আর মহলে পৌঁছানোর অনেক আগে থেকেই সেই দুরূহ পথ একটা গোলকধাঁধা। পথময় এত জাদুজাল বিছানো রয়েছে যে আজ অব্দি কেউ ভেতরে পৌঁছুতে পারে নি। শুধু মুমলের আত্মীয় এক রাজকুমার মাঝেমধ্যে উটবোঝাই আনাজপাতি নিয়ে মীরপুর মাথেলা থেকে আসে। তাঁর লোকজন এখানে তাঁবু গেড়ে থাকে। শুধু সেই রাজকুমারই কাকমহল অব্দি যেতে পারে—অন্যরা অপেক্ষা করে। ওরাই গল্প করেছে—যে পুরুষ প্রথম এই জাদুজাল ছিঁড়ে মহল অব্দি পৌঁছুতে পারবে, তাঁর গলাতেই নাকি মুমল বরমালা পরাবে।

একথা শুনে হামীর সুমরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ঘন ঘন গোঁফে তা দিয়ে একসময় বলে ওঠে,—দেখাই যাক, তাহলে মুমলই হবে এ যাত্রার সবচাইতে বড় শিকার। রাণা মহেন্দ্র ছাড়া বাকী সবাই হামীর সুমরার মত সমর্থন করে। মহেন্দ্র অস্তগামী সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজা ও অন্য দুই মন্ত্রী তখন সূর্যের মুখোমুখি। ওদের চোখের সামনে মহেন্দ্র তখন বিশাল এক জমাটবাঁধা কালো ছায়া। সেই সকাল থেকে রোদ ঝলসানো মেঘহীন শানিত আকাশের নীচে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত রাজপুত বীরেরা তাই রাণা মহেন্দ্রর মনোভাব বুঝতে পারে না। দেখতে দেখতে মহেন্দ্রর পেছনেই সূর্য অস্ত যায়।

সন্ধ্যায় পেটে দু ঢোক সুরা পড়তেই ডংবর সিংহ ভাটী আর সিন্‌হিড়ো ধমাচানী এ নিয়ে ঠাট্টাতামাশা শুরু করে। লাল লাল চোখে ভাটী বলে,—মহেন্দ্র এ কথায় রাজী হবে কেন, কোন্ শালা চায় যে তাঁর ভগ্নীপতি আবার বিয়ে করুক, হা-হা-হা।

ধমাচানী মাথা নেড়ে বলে,—ঠিক কথা, কিন্তু রাজপুত হয়ে আমরা এমন শিকার হাতছাড়া করি কি করে?

হামীর সুমরা তখন গোঁফে তা দিয়ে বলে,—ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না, তবে শালেসা নিশ্চিন্ত থাকুন, মুমলকে আপনার দিদির জায়গায় বসাব না; ওকে তো আর মহারাণী করতে যাচ্ছি না!

ততক্ষণে মহেন্দ্র একটু বেশীই সুরাপান করেছে। সে ভাবে মুখ খুললে কী বলতে কী বলে ফেলবে! তাই জোর করেই নিজের ঠোঁটদুটিকে ব্যস্ত রাখতে ঝলসানো হরিণের মাংসে লবণ আর লঙ্কার গুড়ো মাখিয়ে মুখে চালান করে চিবোতে থাকে। আরো মদ, আরো মাংস খায়। তারপর দুই সেবকের ঘাড়ে ভর দিয়ে নিজের তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরে হামীর সুমরা দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে আসা খরস্রোতা কাকনদীর তীর ঘেঁষে ঘোড়া চালিয়ে একসময় কাকমহলের চৌহদ্দী পেরিয়ে যায়। দুই মন্ত্রী ও সিপাহীরা মহারাজের সাফল্য কামনা করে। আর নতুন রাণীকে নিয়ে উমরকোট ফেরার প্রস্তুতি নিতে থাকে। শুধু মহেন্দ্র একা চুপচাপ একটা পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে বসে

নানারঙের নুড়ি কুড়িয়ে একটার পর একটা ছুঁড়ে ফেলতে থাকে ঝর্ণার জলে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সবাইকে অবাক করে দিয়ে হামীর সুমরা ফিরে আসে শুকনো মুখে। কেউ ওকে কোন প্রশ্ন করার সাহস পায় না। রাণা মহেন্দ্র ঝর্ণার ধার থেকে উঠে হামীর সুমরার কাছে এসে দেখে সবার অলক্ষ্যে ওর হাত পা কাঁপছে। সৈনিকদের সামনে নিজের অপারগতাকে লুকাতে সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা বলে। খবর পেয়ে রাজবৈদ্য শশব্যস্ত হয়ে রাজার তাঁবুতে গিয়ে উপাচারে লেগে পড়ে।

তখন বীর ডংবরসিংহ ভাটী রণসাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে মুমল মহলের দিকে এগিয়ে যায়। সিপাহীরা ওর নামে জয়ধ্বনি দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ডংবরসিংহও ফিরে এসে অসুস্থতার ভান করে নিজের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। রাজবৈদ্য খবর পেয়ে তাঁর জন্যেও ছুটে যায়। রাণা মহেন্দ্র ভ্রু কুঁচকায়।

এবার বীর সিন্‌হিড়ো ধমাচানী গোঁফে তা দিয়ে সমরবেশে চেপে বসে ঘোড়ার পিঠে। সৈনিকেরা তাঁর জন্যেও জয়ধ্বনি দেয়। ওদের সঙ্গে গলা মেলায় রাণা মহেন্দ্রও। তাই দেখে একবার গোঁফে তা দিয়ে টগবগ করে ধুলো উড়িয়ে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয় ধমাচানী।

এক সৈনিক বলে ওঠে,—কি জানি পাহাড়ের ওপারে কী আছে যে সবাই অসুস্থ হয়ে ফিরছে!

অন্য এক সৈনিক গলা নামিয়ে বলে,—এমনও তো হতে পারে যে কাকমহলের তিলিস্মে সবাই ভয় পেয়ে বুরবক বনে ফিরছে!

এক বয়স্ক সৈনিক মাথা নেড়ে বলে,—সে তিলিস্মই হোক আর ভুলভুলাইয়া—সব জাদুজাল ছিঁড়ে সুন্দরীকে নিয়েই ফিরবে মহাবীর ধমাচানী, কত যুদ্ধে আমি ওকে দেখেছি!

কিন্তু সবার আশায় জল ঢেলে দিয়ে ধমাচানীও কেমন বিবর্ণ চেহারায় মাথা হেঁট করে ফিরে আসে। ঘোড়া থেকে নামার সময় রাণা মহেন্দ্র এগিয়ে যায়। ধমাচানী ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। ঘোড়া থেকে এক কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাওয়া জবুথবু মানুষ নেমে আসে। মহেন্দ্র ওর হাত ধরে তাঁবুর দিকে নিয়ে যায়। সে তখনো থরথর করে কাঁপছে। ভাগ্যিস কোন সৈনিক ওকে ধরে নামাতে যায়নি। তাহলে ওর এই অবস্থা দেখে সেনাবাহিনীতে ভয় ছড়িয়ে পড়তো। ধমাচানী কেমন জানি বোবা হয়ে পড়েছে। মহেন্দ্র ওকে বিছানায় শুইয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠায়।

তাঁবুর বাইরে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সৈনিকদের ফ্যাকাশে শুকনো মুখগুলির দিকে তাকানো যাচ্ছে না। মহেন্দ্রর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একেকজন চোখ নামিয়ে ফেলছে। তখন দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে একটুকরো কালোমেঘ দেখে কপালে ভাঁজ পড়ে মহেন্দ্রর। সে নিজের তাঁবুতে ঢুকে ঢকঢক করে একপাত্র মদিরা গলাধঃকরণ করে একমুঠো আখরোট আর বাদাম গিরির মিশ্রণ চিবোতে চিবোতে নিজেকে রণসাজে সাজিয়ে তোলে। কাটার, ভাল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সে একপাত্র জল খেয়ে নেয়। তারপর তাঁবু থেকে

বেরিয়ে একবার চারপাশে তাকায়। দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের দূরবর্তী কালো মেঘ সামান্য আকারে বেড়েছে। সে মনে মনে বলে,—আসুক ঝড়ঝঞ্ঝা! আঁধি-তুফান কোন কিছুই আজ আমাকে আটকাতে পারবে না! আমি খালিহাতে ফিরবো না, সেজন্যে জীবন দেয়াও শ্রেয়। সুমেরদের কাছে পূর্বপুরুষের পরাজয়ের এটাই হবে উপযুক্ত জবাব! দেখো সুমের বীররা দেখো, তোমরা যেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছো সেই অনিশ্চয়তার পথে রাণা মহেন্দ্র সোঢ়া জীবনপণ করে যাচ্ছে। কীধা কৌল ন চুকণাঁ, মর মুকণাঁ নহ মান। সত পুরখাঁ রী লজ্জড়ী, নিত রখৈ রহমান।। যে কথার খেলাপ হয় না। নিজের জীবন দিয়েও আত্মসম্মান রক্ষা করে, এমন পুরুষের লজ্জা ঈশ্বর স্বয়ং রক্ষা করেন। সে বীরদর্পে তাঁর প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চাপে। তারপর একবার সূর্যপ্রণাম করে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে আজকের অভিযানকে সমর্পণ করে। হে সোঢ়া যোদ্ধারা, তোমাদের রক্ত আমার ধমনীতে, তোমরা একসময় অপরাজেয় ছিলে, সম্রাট আকবরের বিশাল সৈন্য তোমাদের ভয় পেত, সুমেরদের কাছে তোমাদের পরাজয় তাই আমার কাছে আজও রহস্য, আজ তোমাদের উত্তরপুরুষ আমার ধমনীতে গোপনে প্রবাহিত তোমাদের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দিতে যাচ্ছি! আমায় আশীর্বাদ করো!

এবার যাত্রা শুরু। যতটা সম্ভব দ্রুত চড়াই অতিক্রম করে কাকমহলের মর্মর চৌহদ্দী পেরিয়ে যায়। পেছন থেকে হাওয়া বইছে বলে বাতাসের অনুকূলে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তখনই যা ঘটে, রাণার গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে ওঠে।

পাহাড়ের ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল হ্রদ। সেই হ্রদে সমুদ্রের মতন উঁচু উঁচু ঢেউ। মহেন্দ্র বিস্ময়ে হতবাক। সে ভাবে,—কাছাকাছি পৃথিবীর কতকিছুই যে আমরা জানিনা! এই হ্রদের কথা কেউ কখনো বলে নি তো!

আবার ভাবে,—মরীচিকা নয় তো!

তখনই গগনবিদারী চিৎকার। হ্রদের জল থেকে মাথাচাড়া দেয় কিম্ভুৎকিম্বাকার সব জন্তু। ওরা বেঢপ সব হাত মাথা নেড়ে বিকট চিৎকারে ওর দিকে এগুতে থাকে। তাই দেখে রাণার ঘোড়াটা ভয়ে আর্তহ্রেষ্যায় পেছন ফিরতে চায়। ততক্ষণে রাণারও নেশা কেটে যায়। সে নিজেকে সংযত করে। শক্ত হাতে লাগাম চেপে ধরে ঘোড়াটার মাথায় একটা চাপড় দেয়। তারপর মুখে চুকচুক শব্দ করে গলায় ও কেশরে হাত বুলিয়ে আদর করে ওটাকে বাগে আনে। কিন্তু এক পাও এগোয় না। কিম্ভুত-দর্শন প্রাণীরা ততক্ষণে হ্রদের জলে উত্তাল ঢেউ তুলে এগিয়ে আসে। মহেন্দ্র তাঁর কোমরবন্ধে ঝোলানো থলে থেকে সঙ্গে আনা পাথরের ঢেলা বের করে ঐ বিকটদর্শন জন্তুগুলির দিকে ছুঁড়তে শুরু করে। পাথর ছুঁড়ে পদাতিক শত্রু ও তাদের বাহনগুলিকে আহত করা সোঢ়াযোদ্ধাদের একটা নিজস্ব রণকৌশল। পরে মেবারের সেনারা এই কৌশল শিখে নিয়ে বারবার মোঘলদের নাস্তানাবুদ করেছে।

একটা বড় ঢেলা সবচাইতে কাছে এগিয়ে আসা দানবাকৃতি জন্তুটার মাথায় লাগতেই সেটি চিৎপটাং। আর দেখতে না দেখতেই বাকী সব জন্তুসহ হ্রদের জল সরে পাহাড়ের দুই ঢালের দিকে গড়িয়ে পড়ে। মাঝখান দিয়ে পথ দেখা যায়। মহেন্দ্র হতভম্ব। কিন্তু

BIRCHAND ... LIBRARY
R...
Accn. No. ... ...
Agartala

তখুনি গাঝাড়া দিয়ে এগুনোর [illegible] ভাবে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবল হাওয়ার ধাক্কা লাগছে পিঠে। মহেন্দ্র আবার ঢিল ছুঁড়ে দেখে পথটা কৃত্রিম কিনা, দুপাশের গাছপালা সত্যিকারের উদ্ভিদ কিনা! তারপর বোঝে তিলিস্মের প্রথম জাদু সে সফলভাবে নস্যাৎ করে ফেলেছে।

প্রবল হাওয়ায় তখন বাতাসে শুকনো পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে, গাছগুলির ডালপালা হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়েছে। তখন ঘোড়ার পেটে গোড়ালির খোঁচা দিলে ঘোড়াটি চলতে শুরু করে। যদিও মহেন্দ্র শক্ত হাতে লাগাম ধরে রাখে। কিন্তু কয়েক কদম এগুতেই হঠাৎ একটা গাছ থেকে একটা বিশাল অজগর লটকে হা করে ওকে গিলতে আসে। রাণা তৎক্ষণাৎ কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার বের করে এক কোপে মুণ্ডচ্ছেদ করে। একী, এটাও যে নকল! হা-হা-হা—

ভেতর থেকে উঠে আসা পুলক সংযত করে সে আরো সতর্ক হয়ে চলতে শুরু করে। সে মনে মনে এই তিলিস্মের বিভিন্ন জাদুকে অতিক্রম করার একটা সূত্র আবিষ্কার করে। এই সূত্র প্রয়োগ করে কিছুক্ষণের মধ্যে এমনি আরো কয়েকটি জাদুকে নস্যাৎ করে অতঃপর সে শ্লাঘা অনুভব করে। সূত্রটি হলো,—তিলিস্মের প্রতিটি জাদুকে নস্যাৎ করার ইচ্ছাশক্তি অতিক্রমকারী পথিকের প্রতিবির্ত ক্রিয়ার সহিত সমানুপাতিক; পথিক যত সতর্ক থাকবে প্রতিবির্ত ক্রিয়াও তত ক্ষিপ্র হবে। সাহস করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতিটি আক্রমণকারী জাদুকে প্রতিআক্রমণ করলেই সাফল্য অনিবার্য।

তখনই তেমনি আরেকটা ভয়ঙ্করকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলে ওর সামনে ভোজবাজির মতন আবির্ভূত হয় ঝলমলে ঘাগড়া চেলি পরা এক কিশোরী। সে নিজেকে নাতির বলে পরিচয় দেয়। নাতির রাণাকে হাতজোড় করে কাকমহলে স্বাগত জানায়। কিন্তু মহেন্দ্র কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে তক্ষুণি ঘোড়া থেকে নেমে ওর লম্বা চুলের বেণীটাকে লাগামের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। নাতিরের কোন ওজর আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে ভারী গলায় আদেশ করে,—'পথ দেখিয়ে ঘোড়ার আগে আগে চলো, চালাকি করলেই মরবে, তোমার লাশের উপর দিয়েই তবে—' মহেন্দ্র ইচ্ছা করেই কথাটা শেষ করে না। বেচারি নাতির ভয় পেয়ে যায়। সে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে রাণাকে বিভ্রান্ত করার অনেক চেষ্টা করেও বিফল হয়। রাণা মহেন্দ্র ততক্ষণে মুমলকে জয় করার সূত্র আবিষ্কার ও তাঁর সফল প্রয়োগের উপর্যুপরি ঘটনায় আত্মবিশ্বাসকে আরো পোক্ত করে ফেলেছে। এরকম অদ্ভুৎ শুনশান নিস্তব্ধ অরণ্যপথ আর দেখেনি সে। এতক্ষণ ধরে একটা পাখির ডাকও শুনতে পায়নি। কাকমহলের গোলকধাঁধায় পাখিরাও আসতে ভয় পায় নাকি? অথচ চারপাশের এই সমস্ত গাছপালা, ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপ তো সত্যিকারের উদ্ভিদ। পেছন থেকে ধেয়ে আসা প্রবল হাওয়ায় গাছগুলির ডালপালা নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে। এত হাওয়ায় পাখিরা দূরে কোথাও থাকলে উড়ে এসে নিজস্ব গাছের কোটর কিম্বা কোন গাছের ডালে, পাতার আড়ালে তৈরি নিজস্ব নীড়ে ফেরার কথা। কিন্তু এরকম দৃশ্য মহেন্দ্র দেখতে পায়নি। নাকি নিজস্ব টানটান উত্তেজনা আর অতি সতর্ক অশ্বচালনায় এগিয়ে যাওয়ার তালে এসব সে লক্ষ্যই করেনি! এমনিতে এই অরণ্যের গাছগুলোর একটা আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। সদ্যযৌবনে পা-রাখা

যুবতীদেরকে দোলপূর্ণিমার রাতে কিম্বা তার আগের বিকেলে যেমন যুথবদ্ধভাবে উমরকোটের উদ্যোনে দেখা যায়। গা-ময় ঠিকরে বেরিয়ে আসা রূপ আর কুমারী গায়ের গন্ধ। অবশ্য ঘোড়ার আগে চলতে থাকা এমনি এক কুমারীর দেহ সুবাসও এহেন অনুভূতি এনে দিতে পারে! নাতির ওকে গল্প শোনায়, এর আগেও নাকি দশ বারোজন রাজকুমার তিলিস্মের নানা জাদুজাল ভেদ করে কিছুটা এগিয়েছিল। কিন্তু কোথাও না কোথাও ঘাবড়ে গিয়ে ওরা মূর্চ্ছা যায় এবং কাকমহলে বন্দী হয়। পরে অনেক অনেক মোহর ও ধনরত্ন মুক্তিপণ দিয়ে ওরা ছাড়া পেয়েছে। তবে মহেন্দ্রর মতন এতদূর আজ অব্দি আর কেউ আসেনি! —আপনি সত্যি বীরপুরুষ, কিন্তু আমার কথা শুনুন, খামোখা জেদ করবেন না, এখনো পথ অনেক দুর্গম! আপনি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাইলে আমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পালান! এভাবে আমরা দুজনেই মুক্তি পাই!

—মহেন্দ্র মুচকি হেসে বলে, তোমাকে নিয়ে আমি কী করবো সুন্দরী?

—এই মায়াবী পুরীর যান্ত্রিক জীবন থেকে বাঁচাবেন, আর আপনার অন্তঃপুরে রেখে সামান্য সেবার সুযোগ দেবেন!

এটুকু বলেই ওড়না দিয়ে মুখচাপা দেয় নাতির। বোধহয় লজ্জা পেয়েছে। চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মহেন্দ্র আবার কুমারী গায়ের গন্ধ টের পায়। সে গা ঝাড়া দিয়ে বলে,—কী হলো, এগিয়ে চলো, তোমার ইচ্ছে আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো, আগে মুমলকে বিয়ে করি, তারপর ওকে যখন নিয়ে যাব সঙ্গে তোমাকেও—

- 'তাহলেই হয়েছে!' কথায় শ্লেষ মিশিয়ে বলে নাতির,—আপনি মুমলকে জানেন না, আমি এরকম বলেছি শুনতে পেলে পিঠের ছাল তুলে নেবে! অবশ্য আপনি আদৌ মুমলকে বিয়ে করতে পারবেন, নাকি যতদিন দেশ থেকে মুক্তিপণ আসে ততদিন কাকমহলে বন্দী থাকবেন কে জানে!

তখনই বাঘের গর্জন শোনা যায়। নাতির ভয়ার্ত হরিণীর মতন কানখাড়া করে এদিক ওদিক তাকায়। পথটা ডানদিকে ঘুরে গেছে। সেভাবে এগিয়ে যেতেই দেখে দূরে পাহাড়ের কোলে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি দোতলা প্রাসাদ। সামান্য দূরেই বনবীথি আবৃত প্রাসাদের সিংহদুয়ার। সেখানেই একটা বাঘ ওৎ পেতে আছে, আর অন্যটা অন্যপাশে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে! সেই ডাকে বাবলার ডালে বসে থাকা টিয়া পাখির ঝাক ভয়ে উড়ে গিয়ে ট্যা ট্যা করে ডাকছে।

নাতির ছুটে এসে ওর পা জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে—রাণাসা, ফিরে চলুন! সে থরথর করে কাঁপছে। ওর নরম বুক কাঁপছে কবুতরের মতন। কিন্তু মহেন্দ্র ধনুকের ছিলার

মতন টানটান। সে আত্মবিশ্বাসকে আরো পোক্ত করে, আর হাতের ডালটাকে বিদ্যুৎবেগে ছুঁড়ে মারে।

তিন

তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিতোষ চোখ কচলায়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। আলো অন্ধকারে পাশে বসা যুবতী ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে,—আমার নামও তো মুমল আছে, আপনি ডাকলেন তাই!

পরিতোষ হেসে জিজ্ঞেস করে,—আমার মতন দেখতে কোন মহেন্দ্রকে তুমি চেন নাকি?'

—না, তবে রাণা মহেন্দ্র সোঢ়ার কহাবৎ শুনেছি!

—সে তো ছশো বছর আগের কথা! তুমি আমাকে মহেন্দ্র বলে ডাকলে?

এ'কথার কোন জবাব না দিয়ে মুমল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। তারপর পরিতোষের দিকে এক পেগ হুইস্কি এগিয়ে দিয়ে মনে মনে বলে,—আপনি তো মহেন্দ্রই আছেন, রাণো ছাড়া মুমলকে এত আদর কে করবে? পরিতোষ এখনো ওর দিকে প্রবল অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকিয়ে থাকলে মুমল হেসে বলে,—আমিও জয়শলমীরের মেয়ে আছি, প্রথম নাচনা গানা টেরনিং করেছি যোধপুরের ঘাসমাণ্ডিতে। তারপর তকদির আমাকে এই কলকত্তায় লিয়ে এসেছে!

মুমল পরিতোষের মাথার বালিশে ভর দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে শোয়। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেজন্যেই এই কহানী এত ভাল লাগছে! কাকমহলে ঢোকার পথে তিলিস্মের প্রত্যেকটি জাদুকে একের পর এক চাকনাচুর করে এগিয়ে যাওয়ার এই তুক আপনি আবিষ্কার করেছেন!

এ'কথা শুনে পরিতোষ এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে, এখন দিন না রাত, হাতে কোন ঘড়িও নেই যে সময় দেখবে। শুধু আছে মদের গ্লাস, সেও মুমল, দশ ফুট বাই আট ফুট দুটো পাশাপাশি কামরা অ্যাটাচড বাথরুম -- সব ঝকঝকে পরিষ্কার আর ছিমছাম সাজানো। এঘরে একটা ছ ফুট বাই চারফুট খাট ছাড়া শুধু একটি টিপয়ে রাখা মীনাকরা পিতলের ফুলদানিতে একগুচ্ছ টাটকা লাল গোলাপ। গোলাপের সুবাসে ঘর ভরে আছে। এখানে এত টাটকা গোলাপ কোত্থেকে এল, সেই তখন থেকে মুমল তো ওর সামনেই রয়েছে!

মেয়েটির বয়স কত হবে? বড়জোর পঁচিশছাব্বিশ! ওর হাত ধরে ঘোড়ার গাড়িতে বসা আর মন্ত্রমুগ্ধের মতন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন এই ঘরে

পৌঁছে গেছে পরিতোষ! আগে ভাবতো, মানুষ যতই নেশাগ্রস্থ থাকুক সে কী করছে, কী বলছে, কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে—সে ঠিকই বুঝতে পারে! নেশাগ্রস্থ হয়ে অপরাধ করা বা অপরাধপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া মদ্যপদের চালাকিমাত্র। কিন্তু এবার ওর কী যে হলো!

নদীঘাটে ওকে মুমল বলে ডাকতেই মেয়েটি কিছুক্ষণ স্তব্ধ তাকিয়ে ওকে দেখতে দেখতে ধীরে কাছে এসে, ওর চিবুকে হাত দিয়ে মুখটাকে উপরে তুলে ধরে বলে,—ম-হে-ন্দ্রজী! রাণো! আপ এঁহা? আখির মুঝে ভী ঢুঁঢ় লিয়া? ক্যায়া বাৎ হ্যায়!

কী মিষ্টি রিনরিনে ওর গলার আওয়াজ। কী স্নিগ্ধ অথচ আকর্ষক ওর স্পর্শ! কী সম্মোহক ওর দৃষ্টি! পরিতোষ অজান্তেই বলে ওঠে,—এত সুন্দর মানুষ আছে, এত টলটলে অথচ গভীর চোখ হয় কারো?

ওর কথা শুনে মুমল হাসে না অথচ ওর সারা শরীরে যেন হিল্লোল বয়ে যায়। ওর হাত ধরে টানলে মুমলের আঙুলের ডগা থেকে পরিতোষের হাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। প্রবল সম্মোহক বিদ্যুৎ। যা শুধু পরিতোষকে ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে তোলে। তারপর খটাখট খটাখট.....। মুমলের পাশে বসে চলতে চলতে পরিতোষ সত্যি সত্যি রাণো হয়ে যায়। রাণো মহেন্দ্রর ডাকনাম। সেই রাণো তখন নিস্তব্ধ প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বাবুঘাট বা আরো এগিয়ে শোভাবাজার অব্দি বিস্তীর্ণ এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি। পথের দুপাশে সারি সারি সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টগুলি ওদের সেলাম করে। গঙ্গার বাঁধানো পাড়ের সারি সারি বৃক্ষরাজি মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে। আর ফুটপাতে প্রজাবৃন্দ খালি গা কিম্বা ছেঁড়া কাপড়ে ইঁটের উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে, হাজার হাজার প্রজা, শয়ে শয়ে উনুন। কী অসহায়ত্ব, কী দারিদ্র্য! মহেন্দ্র কবে ওদের সব দুঃখ দূর করতে পারবে। সে অবশ্যই করবে, আপাতত মুমল, এক মায়াময়ী ভাললাগা অস্তিত্ব ওর সময়টাকে ছেয়ে আছে, এতদিন পর কত যুগ কত বছর কত শতাব্দী পর মহেন্দ্র আজ সুখের সন্ধানে!

মুমল জানে, মানুষের জীবনে অনেক দুঃখ। এখানে অনেক সন্ধ্যার অতিথি ওকে অনেক দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছে। কিন্তু প্রিন্সেপ ঘাট থেকে তুলে আনা বাবুটি একেবারে অন্যরকম! সে যে সূত্রের কথা বলে সেও এক আজব তুক। লোকটা একেবারেই বাস্তবের ধারেকাছে নেই। মাতাল হয়ে এমনটা করছে বলে মনে হয় না, জীবনে অনেক মাতাল দেখেছে সে। কিন্তু কেউ ওকে এমন দুচোখ ভরে দেখেনি। এমনিতে রাজস্থান ও উত্তর গুজরাটে সুন্দরী মেয়েদের মুমল বলা হয়। সুন্দরী ছিল বলে ওর ঠাকুমাও ওর নাম রেখেছিল মুমল। কিন্তু এই প্রথম কারো চোখে রাজকন্যে মুমল হয়ে উঠতে পেরে তার যে আজ কী হয়েছে। সে জানে ছোটবেলার খেলাঘরের মতোই কিছু অনুভূতি এসে জমা হয়েছে। কিন্তু তার থেকেও বেশী, অনেক অনেক বেশী, গঙ্গাজীতে জোয়ার আসার মতন, লুনী কিংবা কাকনদীতে প্লাবন আসার মতন বা তার থেকেও বেশী প্রবল কিছু ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরিতোষের কপালে এক দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলে, পরিতোষ ওকে জড়িয়ে ধরে বুকের মাঝখানে চুমু খায়। তারপরই এক টানে ওকে নিজের উপরে নিয়ে নেয়। মুমল ওর নাক টিপে দিয়ে পাশে নেমে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, আভি নেহী।

পহলে কহানী শুনাইয়ে! ফির ক্যায়সে আপ মেরে মহল মে ঘুঁসে?

পরিতোষও ফিসফিস করে বলে,—আভি শুনাতে হ্যায়! সে আবার মুমলকে জড়িয়ে ধরতে যায়।

মুমল দুষ্টু হেসে আরো সরে গিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে,—না এখন না, আগে বলুন আপনি কেমন করে ঢুকলেন, শুনতে খুব ভালো লাগছে! আপনি কহানীকার, আপনার কাছে শুনতে শুনতে ছশো বছর পেছনে চলে যাচ্ছি আমার মহলে, লোদ্রভা পাহাড়ের নীচে, কাকমহলে! আপনি তখনো থেকে থেকে মোঁচে তা দিচ্ছেন আর এক অধীর অপেক্ষায় ছটফট করছেন। এক অদৃশ্য সেতারবাদিকার সুরের মূর্ছনা আপনাকে বারবার আনমনা করে দিলেও আপনি যে কোন সম্ভাবনার জন্য সমস্ত অস্তিত্বকে চাঙ্গা রাখছেন।

পরিতোষ বোঝে মুমলকে এখনো গল্পটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে এক চুমুকে হুইস্কির গ্লাস খালি করে বলে,—কিছুক্ষণ পর নাতির ফিরে এসে আমাকে অন্দরমহলে নিয়ে যায়। মাঝে কয়েকটা সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মহল পেরিয়ে একটি রাজকীয় বৈভবসম্পন্ন ঘরে পৌঁছুতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। চন্দনচূর্ণতরঙ্গে চারপাশ ম ম। সহস্র দীপমালার আলোয় ঝলমলে কামরার মাঝে একটি পালঙ্কে অপরূপা তুমি ঝর্ণার বেগবতী জলধারার মতন ঢেউখেলানো পোশাকে চাঁদের জলছবির মতন টলটলে মুখ নিয়ে বসে পলকহীন গভীর চোখে তাকিয়ে আছো—যেন কোন শিল্পীর তৈরি প্রতিমা! নাকি প্রতিমাই, আরো সতর্ক হই। কিন্তু তখনই তুমি বলে ওঠো,—'আরে আসুন, আসুন!' তুমি আমাকে মুখোমুখি বিছানো একটি মনোরম পালঙ্কে বসার জন্য ইঙ্গিত করলে। আমি তখনো অপলক। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? কী দারুণ দেখতে!

অথচ তোমার ইশারা আমাকে অবাক করে। সচকিত হয়ে ভাবি,—সামনের পালঙ্কে কেন? কামরায় আরো একটি সুসজ্জিত পালঙ্ক রয়েছে। এত পালঙ্ক কেন? এটা কি অতিথিশালা? অথচ এখানে তো বাইরের কেউ-ই আসতে পারে না। এখানেও কোন ধোঁকা কাজ করছে না তো?

আমি বলি,—না সুন্দরী, তোমার তিলিস্মের সমস্ত জাদুজাল ছিন্ন করে কাছে পৌঁছেছি। তাই এখন তোমার পাশে বসার অধিকারও অর্জন করেছি!

একথা বলেই আমি এগিয়ে তোমার পালঙ্কে তোমার পাশেই বসে পড়ি। তোমার চেহারায় তখন খুশীর বান ডাকে।

পরিতোষ ডানহাতের অনামিকা ও মধ্যমার পিঠ দিয়ে মুমলের কমলার কোয়ার মতন নরম ঠোঁট ছোঁয়। কিন্তু মুমলকে তখন গল্পে পেয়েছে। সে পরিতোষের গায়ে ওর নরম পা চাপিয়ে ফিসফিস করে বলে,—আপনি সত্যি বুদ্ধিমান এবং চিতাবাঘের মতন ক্ষিপ্র রাণা মহেন্দ্র, এরকম বীরপুরুষকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম বলে এত আয়োজন করতে হয়েছিল। আপনিও অনেক কষ্ট পেয়েছেন, তাই না?

মহেন্দ্রর অনামিকা ও মধ্যমা এবার মুমলের নরম তুলতুলে গাল ছোঁয়! মহেন্দ্র ফিসফিসিয়ে বলে,—নাও, এখন চিরদিনের জন্য তোমার হয়ে গেলাম! খুশী তো?

মুমল লজ্জায় মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলে। সে আবেগে থরথর। গাল দুটিতে রক্তিম আভা ছড়ায়। ওরা দুজনে তখন মহলের পাশেই পাহাড়ের গায়ে তৈরী শিবমন্দিরে গিয়ে পরস্পরকে গন্ধর্ব মতে আপন করে নেয়। তারপর?

দুজনেই নির্নিমেষ দেখতে থাকে পরস্পরকে। তাকিয়ে থাকে অপলক। তারপর ক্রমে খেলতে থাকে তখুনি আবিষ্কৃত নতুন সব খেলা। খেলতে খেলতে একসময় শিবমন্দিরের ঘন্টাধ্বনি শুনতে পায়। কে বাজায় ঘন্টা? এই মন্দিরে তো কোন পুরোহিত নেই। তাহলে কি এতক্ষণে ঝড় উঠেছে? কিংবা আঁধির প্রবল হাওয়ায় দুলছে পিতলের ঘন্টা? আর বাজছে। বাজতে বাজতে প্রবল হিল্লোল তুলছে মরুবাতাসে, মানুষের রক্তে? একেই কি বলে রুধির হিল্লোল? রক্তে এহেন উত্তাল ঢেউ ওঠে কীভাবে? কীভাবে মুমলের চেতনায় জেগে ওঠে জলস্তম্ভ? মহেন্দ্র তেমনি অজান্তেই খুলে ফেলে তার সমস্ত আভরণ। মুমলের স্তনদুটি প্রবল আঁধির দৌরাত্ম্যে বালির পাহাড়ের মতন সূর্যবন্দনা করে, স্বর্ণিম, আর উদর যেন মরুপৃষ্ঠ, প্রবল বর্ষণের আকাঙ্ক্ষায় ফুঁসছে নাভি, তার নীচে আন্দোলিত মরুদ্যান হাতছানি দিয়ে ডাকে—আয়, আয়! আরো নীচে রেশমি ঘাসে ঢাকা গোলাপী গুহাদ্বার। মহেন্দ্র আর থাকতে পারে না। কেশর সমন্বিত প্রবল উল্কাপাত ঘটে। গুহামুখ থেকে রক্তপাত, একটি কাতর চিৎকার! মহেন্দ্র এক মুহূর্ত থমকে আবার সচল হয়। বালির পাহাড় দলিত হয়, আন্দোলিত হয় উল্কার ঝড়, ভূকম্পনে আন্দোলিত হয় চরাচর। এবং মুমলের জীবনে এভাবেই রচিত হয় প্রথম যন্ত্রণার আনন্দলিপি। কী আনন্দ কী আনন্দ!

তারপর থেকে মিলনমধুর প্রতিটি মুহূর্ত, গল্প আর গল্প কত, গল্পে গল্পে পরস্পরকে জানা। গল্পে গল্পে বিনিদ্র রাত পার করে ওরা আবার আলিঙ্গনে ডুবে থাকে সারাদিন। দেখতে দেখতে দুটো দিন যে কীভাবে কেটে যায় কেউ টের পায় না। দুদিন পর মিলনসুখের প্রথম ঢেউ এর প্রভাব কাটতেই মহেন্দ্রর মনে পড়ে হামীর সুমরা ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের কথা। মহেন্দ্র মুমলকে ওদের কথা বলে। সব শুনে মুমল ওকে যেতে দেয় কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসার আব্দার করে।

এদিকে হামীর সুমরা ও তাঁর দলবল মহেন্দ্রর জন্য দুদিন অপেক্ষা করে অবশেষে ভারী মনে ফেরার উদ্যোগ করেছিল। হামীর সুমরা মনে মনে নিজেকেই দোষারোপ করে। কেন যে এমন জেদ চেপে গেল, আর রাজপুতের জেদ তো কাঁকড়া বিছের মতন, একগুঁয়ে, রাজার পাগড়ির সম্মান বাঁচাতেই তো প্রাণের বন্ধু, মহাবীর রাণা মহেন্দ্র নিজের জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে গেল! এখন মহারাণীকে কী জবাব দেবে হামীর? সে নিজে ও দুই মহাবীর মন্ত্রীমশাই যে তিলিস্ম ভেদ করতে পারেনি, সেটা ভেদ করে রাজার ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে শালেসা! এরকম অস্বস্তিকর অথচ বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন সে কোনদিন হয়নি!

এমনি ভাঙ্গা মনে সবাই তাঁবুগুলি গুটিয়ে নিয়ে ফেরার উপক্রম করছিল। শুধু

রাজামশাই আর রাণা মহেন্দ্রর তাঁবু গোটানো বাকি। তখনই প্রহরী চেঁচিয়ে ওঠে। সবাইকে চমকে দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঘোড়ায় চড়ে নেমে আসে রাণা মহেন্দ্র। সবার মুখে হাসি ফোটে। সৈনিকরা জয়ধ্বনি করে। তারপর সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়ালে ওর সঙ্গে যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে সব বলে দেয় মহেন্দ্র।

হামীর সুমরা ওকে ডেকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে যায়। সেবককে বলে সরবৎ বানাতে। তারপর মহেন্দ্রর কাছে সে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুমল সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে। বিস্তারিত জেনে রাজা তখন একবার ওকে দেখতে চায়। মহেন্দ্র বলে,—যে করেই হোক শুধু একবার, কেবলমাত্র চোখে দেখার ব্যবস্থা করে দাও শালেসা!

মহেন্দ্র বলে, কিন্তু ঐ প্রাসাদে যে আমি ছাড়া আর কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। হামীর সুমরা তখন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে হাঁটু নাড়াতে থাকে। দুজনেই চুমুক চুমুক সরবত খায়। কোথা থেকে কোকিলের কুহুধ্বনি ভেসে আসে। দূর থেকে কাছে। যেন কোকিলটা উড়ে এসে এবার কাছাকাছি কোথাও বসেছে। অথবা দূরবর্তী কুহুর জবাব দিচ্ছে কাছাকাছি কোন ডালে বসে থাকা একটি কোকিল। সেজন্যেই হয়তো এই কুহু এত দীর্ঘায়িত, এত আকুতিময়! হঠাৎ হামীর সুমরার চোখ চকচক করে ওঠে। সে বলে ওঠে, --আচ্ছা রাণা মহেন্দ্র, আমি যদি তোমার সেবক সেজে যাই!

—ছিঃ মহারাজ, একি কথা, আপনি আমার সেবক সাজবেন! তাহলে তো আমাকে খিদমৎ করার অভিনয়ও আপনাকে করতে হবে। এটা হয় না!

—কেন হবে না, এহেন সুন্দরীকে একপলক দেখার জন্যে আমি তাই করবো, সেখানে তো আর আমার রাজ্যের কেউ দেখতে যাচ্ছে না, তুমি তো সবসময়ই আমার আদেশ শিরোধার্য করে চলো। সবার অগোচরে কিছুক্ষণ তোমার খিদ্‌মৎ করার সুযোগ পাবো—এই যা! ঠিক আছে?

মহেন্দ্র আর কী করে, পরদিন ভোরে রাজাকে সঙ্গে নিয়েই রওয়ানা হয়। নিজের সুসজ্জিত ঘোড়ার বদলে রাজাকে একটি সাধারণ সৈনিকের ঘোড়া নিয়ে নিজের সেবকের পোশাকে যেতে দেখে অন্য দুই মন্ত্রী, রাজবৈদ্য ও সৈনিকরা অবাক। মহারাজের এ আবার কেমন শখ! সবাই বোঝে এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। কোন রাজাকে এরকম সেবকের পোশাকে কেউ কখনো দেখেনি! পথে যেতে যেতে মহেন্দ্র ভাবে,—পোশাক আশাক মানুষের ব্যক্তিত্বকে কত বদলে দিতে পারে! প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হামীর সুমরাকে এখন সেবকের পোশাকে একজন সাধারণ সৈনিক বলেই মনে হচ্ছে। ওঁর ঘোড়াটাও কত সাধারণ, থেকে থেকেই পিছিয়ে পড়ছে। সেজন্যেই হয়তো একটা অদ্ভুত দৈন্য রাজার ব্যক্তিত্বকে মলিন করে দিচ্ছে। না জানি কেন একটা অজানা আশংকায় রাণা মহেন্দ্রর বুক দুরুদুরু করে। কাক মহলের থেকে কিছুটা দূরেই প্রথম মহিলারক্ষীর নির্দেশ মেনে ওরই দেওয়া কালো কাপড়ে হামীর সুমরার চোখ বেঁধে দিতে হয়। কাকমহলে পৌঁছুনোর পর মহেন্দ্রর সঙ্গে অন্য পুরুষ দেখে সেবিকারা সব অবাক। ওরা ছুটে ছুটে পর্দার আড়ালে চলে যায়। মহেন্দ্র ওঁর চোখের কাপড় খুলে দেয়। তখন ওদের মধ্যে

সর্বকনিষ্ঠা ত্রয়োদশী নাতির এসে বলে,—রাণা মহেন্দ্র সোঢ়া প্রণাম। রাজকন্যে জানতে চাইছেন, আপনি এই প্রাসাদের নিয়ম ভাঙ্গলেন কেন? আপনি তো জানতেন এখানে অন্য পুরুষের আসা বারণ!'

রাজার চোখের বাঁধন খুলে দিতে দিতে মহেন্দ্র বলে,—খুব জানি,—মুমলকে গিয়ে বলো—এ আমার সেবকমাত্র! চিন্তার কিছু নেই!'

নাতির বলে,—ঠিক আছে এখানেই দাঁড়ান, আমি জিজ্ঞেস করে আসি!

নাতির নিমেষে উধাও। সেবকরূপী হামীর সুমরার চেহারায় একটা পারক্যবোধের ছাপ। মহেন্দ্র স্পষ্ট টের পায় আর হাত কচলায়। তেমনি একটু পরেই আবার ফিরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে,—ঠিক আছে, এযাত্রা যে কদিন আপনি এখানে থাকবেন আপনার সেবক এই বাইরের মহলেই থাকবে, আপনি বাইরে কোথাও গেলে আপনার সঙ্গে যাবে, নাহলে আমি এসে যা যা করতে বলবো সেই কাজগুলিই করবে, রাজকন্যে কিংবা অন্য কোন সেবিকা ওর মুখদর্শন করতে চায় না! শুধু আপনাকে খাসমহলে যেতে বলেছেন।

একথা শুনে হামীর সুমরার মুখ শুকিয়ে যায়। মহেন্দ্র প্রমাদ গোনে। কী করবে ভেবে পায় না, তখুনি হামীর সুমরা ওকে চোখ টিপে ইশারায় যেতে বলে নিজে নাতিরের পেছন পেছন হাঁটে। তারপর আবার পেছন ফিরে ইশারা ইঙ্গিতে একবার মুমলকে বাইরের মহলে বা মন্দিরে আসতে বলে।

খাসমহলে ঢুকতেই মুমল ছুটে এসে উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরে। দুদিন পর মুমলকে কাছে পেয়ে মহেন্দ্রও সব ভুলে যায়। যোদ্ধার পোশাক খুলে রাখে। মুমলও ধীরে ধীরে পদ্মের পাপড়ির মতন প্রস্ফুটিত হয়। এক এক করে সমস্ত আভরণ সরিয়ে ইঙ্গিত, কাঙ্ক্ষিত ভ্রমরকে পরাগসুবাসে আচ্ছন্ন করে তোলে। পুরুষের দুই বাহুতে কত শক্তি অথচ রতিক্রিয়ায় তা কত নরম কোমল ধারক ও ভালবাসাময়। মহেন্দ্রর কামশক্তি প্রবল অথচ উচ্ছ্বাসে অল্পক্ষণেই এলিয়ে পড়ে মুমলের বুকে। মুমল ওর চুলে আঙুল চালায়, পিঠ নেড়ে দেয়। মহেন্দ্রর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ওর অস্তিত্বে ঘূর্ণিঝড় তোলে। মহেন্দ্র চিৎ হয়ে শুলে মুমল ওর বুক পেটের লোমে বিলি কাটে, সুড়সুড়ি দেয়, চুমু খায়। মহেন্দ্রর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মুমল ওর সারা শরীরে চুমু খেতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোখরোর মতন আবার ফুঁসে ওঠে শরীর। ক্রমে প্রচণ্ড। এবার অগভীর কাকনদী কিম্বা লুনীনদীর বুকে অশ্বচালনার প্রশিক্ষণের সময় যেমন বিরামহীন মহেন্দ্র। চারিদিকে জল ছিটাতে থাকে আর তা অতিক্রম করে আনন্দ পায় অবিরাম পেশীসঞ্চালন। এভাবেই ক্রমে আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চোখের গভীরে শুধু প্রেয়সীর মুখচোখ আর জ্যোৎস্নার দ্যুতি।

সমস্ত চৈতন্যে তখন উন্মত্ত সাগরের প্রবল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বারবার। তারপর দীর্ঘক্ষণ ঢেউয়ের মাথায় চেপে দুলতে দুলতে একসময় মনের আকাশের তারাগুলিকে মিটিমিটি হাসতে দেখে, বড় হতে দেখে। সে ঝড়ো বাতাসকে বলে, ধীরে বও! তখুনি কোত্থেকে কুয়াশার চাদর এসে ঝাপসা করে দেয় সব। ওর গলায় ও চিবুকের কাছে মহেন্দ্রর নিশ্বাস দমকা হাওয়ার মতন বিহ্বল, সমান তালে দুজনের হৃৎস্পন্দন ও বুকের

ওঠানামার যুগলবন্দি পরস্পরকে পরিতৃপ্ত করে তোলে। কেউ চোখ খোলে না। শুধু কিছুক্ষণ পর মুমলকে জড়িয়ে থেকেই মহেন্দ্র একপাশে গড়িয়ে যায়। মুমলও পাশ ফিরে ওকে আঁকড়ে ধরে। আর তেমনি জড়িয়ে থেকেই দুদিনের উৎকণ্ঠা ও মিলনাকাঙ্খার অবসানে একে অন্যের অস্তিত্বে লীন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ওরা।

স্বপ্নহীন ঘুমিয়ে কাঁটায় কয়েক প্রহর। তারপর স্বপ্ন আসে। স্বপ্নের রঙীন মায়াময় গোলকে দুজনেই পরস্পরকে পায় রূপকথার মতন। মুমল শুয়ে থাকে মায়াঘুমে। মহেন্দ্র খুঁজে ফেরে ওকে জাগানোর সূত্র। ঘুমন্ত রাজকুমারীকে ডেকে ডেকে আকুল হয়। তখন চোখে পড়ে মাথার কাছে সোনার কাঠি, পায়ের কাছে রূপোর কাঠি। গল্পের মতন কাঠি দেখতে পেয়ে আশ্বান্বিত মহেন্দ্র কাঠিদুটোকে স্থানবদল করে। তাতেই জেগে ওঠে মুমল। ভালাবাসায় গাঢ় স্বপ্নগোলক স্পন্দিত হয়। ওরা অপলক পরস্পরকে দেখতে থাকে নির্নিমেষ। ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। তারপর একসময় প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরে একে অন্যাকে। রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়, হৃৎস্পন্দন বাড়ে ; স্বপ্ন ও জাগরণের সীমারেখা অতিক্রম করে ওরা আবার ঢেউএর দোলায় ভাসতে থাকে।

চার

আরণ্যমোহজাল ছড়িয়ে রেখেছে অলীক ঊর্ণনাভ
আলোকবিদারী ব্যাপ্ত হাঁ-মুখ, এতো গূঢ় বিমোহন
নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে
আমি আর পারছি না . . . . হে প্রগাঢ় শর্বরীসভাতা
ওগো রূঢ় রাত্রিলীন মায়া —সৈয়দ হাসমত জালাল

হামীর সুমরা ক্রমে ফুলতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। নাতির নামক পুঁচকে মেয়েটা প্রথমদিন ওকে দিয়ে মহলের বিভিন্ন কামরার ঝুল পরিষ্কার করায়। প্রথমবার দেখে বোঝা যায় নি এই সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত ছাদগুলির কোনায় কোনায় এত মাকড়সার জাল ছিল! হামীর সুমরা ভাবে,—কত পুরনো বাড়ি রে বাবা, মহলের দাসীদের পক্ষে এই ঝুল পরিষ্কার করা মুস্কিল! স্ত্রী মাকড়সারা এই জালে আটকে পড়া কীটপতঙ্গ খায়, পুরুষ মাকড়সারা স্ত্রীর ফাঁদে পা দিয়ে মিলনাকাঙ্খায় ওদের ঘিরে নাচতে নাচতে একসময় কাছে এলে যৌনমিলন ঘটে। কিন্তু তারপর? স্ত্রী মাকড়সা পরিতৃপ্ত সময়ে পুরুষ মাকড়সাটিকেই মেরে খেয়ে ফেলে। একটি স্ত্রী মাকড়সা তার জীবদ্দশায় এমনি কটা যে পুরুষ মাকড়সাকে শেষ করে কে জানে!

মুমল কি তেমন মাকড়সা? সে কি মহাবীর রাণা মহেন্দ্রকে জীবিত রেখেছে? নাহলে একটা পুরোদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোন অছিলায় মুমলকে এনে দেখানো তো দূরের কথা মহেন্দ্র নিজে এসে একবারও খোঁজ করেনি। ভীষণ রাগ হয়। আবার দুশ্চিন্তাও হয়।

এই মায়াবিনীর কবল থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে তো! এখানে প্রতিটি মুহূর্ত যেন একেকটি প্রহরের মতন দীর্ঘ।প্রতিটি প্রহর যেন একেকটা দিন। এত বিরক্তিকর এবং প্রলম্বিত সময়খন্ড হামীর সুমরার জীবনে আর আসেনি।

আজ নাতির এসে ওকে দিয়ে সব ঝাড়লন্ঠন পরিষ্কার করায়। আর তারপর এক মহলের সমস্ত কামরার আসবাব সরিয়ে ফরাশ বাইরে বের করায়। হামীর সুমরা জীবনে কোনদিন এত পরিশ্রম করেনি। নাতির ওকে ঘেমে স্নান করতে দেখে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াতে বলে। তারপর ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁকডাক করে ফিরে আসে। হামীর সুমরা ভাবে, যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষকে কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে। যেমন এই মধ্যযৌবনে নাতিরের খবরদারি ওকে শিক্ষা দিয়েছে, সাফাইকর্মীরা কতটা পরিশ্রম করে! অন্ত্যেবাসী সাফাইকর্মীদের প্রতি, ভৃত্য ও সেবকদের কাজের প্রতি নিজের অজান্তেই একটা সমীহ জেগে ওঠে ওর মনে। তখন ওড়নায় মুখ ঢেকে একদল সেবিকা ঝাড়ু ও বালতি নিয়ে এসে সবকটা কামরার মেঝেতে প্রথমে জল ছিটায়। তারপর ঝাড়ু দেয়।—বাঁচা গেল বাবা, এতটা ঝাড়ু দিতে হলে হামীর সুমরা মরমে মরে যেত।

এদের ঝাড়ু দেওয়া হয়ে গেলে হামীর সুমরা আবার সবকটা ফরাশ টেনে নিয়ে গিয়ে মেঝেগুলি ঢাকে। তারপর নাতিরের সঙ্গে ধরাধরি করে সমস্ত আসবাব আবার যথাস্থানে সাজিয়ে রাখে। মেয়েটি বেশ কর্মঠ ও ক্লান্তিহীন। হাসিমুখে কাজ করতে থাকে। মনে মনে পুঁচকে মেয়েটির প্রতিও একটা সমীহ জেগে ওঠে।

কিন্তু এই সমীহ বেশীক্ষণ থাকে না। আসলে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর সময়ে সামান্য আঘাত লাগলেই মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এত কাজ করার পর ওকে কয়েকটা বাজরার রুটি আর এক বাটি ডাল এনে খেতে দিলে নাতিরের এই খাতিরদারী হামীর সুমরার অহং-এ আঘাত করে। হামীর সুমরার ইচ্ছে করে এগুলি নিয়ে গিয়ে ওর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলতে। কিন্তু তখন ক্ষিদেয় প্রাণ ওষ্ঠাগত। এতো ক্ষিদে ওর জীবনে কোনদিন পেয়েছে কিনা সন্দেহ। তাই সমস্ত অহং ভেঙে সে ঐ বাজরার রুটি আর ডালই খেয়ে নেয়। কিন্তু মনে মনে ভাবে, বদলা নেবে! সে সুযোগ পেলেই এইসব—সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত। কিন্তু এই মহলে লড়াই করার মতন কোনই পুরুষ সঙ্গী নেই। সমস্ত রক্ষীরা বীরাঙ্গনা—অস্ত্রচালনার বাইরে ওরা মহলের মধ্যে ও চারপাশে বিছানো জাদু ও গোলকধাঁধাগুলিকেও সুচতুরভাবে ব্যবহার করে। সেজন্যে হামীর সুরমা অসহায়। সে মনে মনে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দেয়। আর না জানি কেন রাণা মহেন্দ্রর উপর রাগ বাড়তে থাকে।

পিতৃদেব-এর উপরও রাগ হয়। কেন যে তিনি পিতামহের কাছে পরাজিত সোঢ়া বংশের রাজকন্যাকেই ওর মহারাণী করে ঘরে আনেন। নাহলে আজ মহেন্দ্রর সঙ্গে বন্ধুত্বও হতো না আর এইরকম বিপাকেও পড়তে হতো না!

অবশ্য সোঢ়ীরাণী দেখতে খুব সুন্দর; একেবারে যেন ফুলপরী। ওকে কাছে পেলে হামীর সুমরা দুনিয়া ভুলে যায়। ওর কথা মনে পড়তেই নিজের বুদ্ধিদোষে সমস্ত রাগ

গিয়ে পড়ে মহেন্দ্রর উপর। রাগ না ঈর্ষা? হামীর সুমরা হঠাৎ আবিষ্কার করে—সে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। যে কাজ তাঁর মন্ত্রী পারল সে কাজ নিজে করতে পারেনি বলে ক্ষোভ যতটা তার থেকে অনেক বেশী জীবনে এই প্রথম কোন নারীকে পেতে চেয়ে পায় নি বলেই হয়তো! তার উপর সেই দুর্লভ শিকারকেই হাতিয়েছে তারই অধীনস্থ মন্ত্রী—এই ঈর্ষা ওর মনে তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছে।

মহেন্দ্রকে সে আর শ্যালক কিম্বা বন্ধু বলে ভাবতেই পারছে না। তার উপর ঈর্ষা হবে না তো কার উপর হবে? আর রাগ হচ্ছে অদেখা রাজকন্যা মুমলের উপর। এত দেমাক মেয়েটার? এখুনি হঠাৎ গিয়ে অন্দরমহলে হানা দিতে ইচ্ছে করে। মুমলের সামনে গিয়ে বলে, আমি রাজা, মহেন্দ্র আমার মন্ত্রীমাত্র! তোমার শর্ত অনুসারে সে-ই প্রথমে তোমার মহলে এসেছে বলে তুমি তাকে গন্ধর্বমতে বিয়ে করেছ! নিজের সর্বস্ব সঁপে দিয়েছ ওকে। আমি এতে কিছু মনে করবো না, এই নিয়ে কোনদিনই 'টুঁ' শব্দটিও করবো না। তুমি এখন আমাকে বরমালা পরিয়ে দাও!

কিন্তু হামীর সুমরা জানে এমনটি কিছুতেই সম্ভব হবে না! প্রথমত রাণা মহেন্দ্র তো আর হাতে চুড়ি পরে নেই, তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে গেলে সে ছেড়ে কথা কইবে না। দ্বিতীয়ত যদি নিজের দিদির সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা ভেবে সে স্বার্থত্যাগও করে তবু মুমল সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে, সে কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজী হবে না। উপরন্তু ওকে দৈহিক বা মৌখিক উপহাসের শিকারও করে তুলবে।

ছিঃ ছিঃ—তাহলে তো অন্য কারো কাছে মুখই দেখাতে পারবে না হামীর সুমরা!--দাঁড়াও, বোঝাচ্ছি একবার উমরকোট ফিরে যাই, পূর্ণশক্তির সেনাবাহিনী এনে তোমার প্রাসাদে আক্রমণ চালাবো! একথা ভাবতেই আবার মনে পড়ে মুমল প্রাসাদের প্রহরাকর্মীরা সবাই মহিলা আর চারপাশে বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিছানো জাদুজাল ও গোলকধাঁধা প্রায় দুর্ভেদ্য। হামীর সুমরার বাহিনী কোনমতেই এই গোলকধাঁধা ভেদ করে আসতে পারবে না! এসব ভেবেই সে একটু দমে যায়! প্রজাদের মতন কেবল বাজরার রুটি আর ডাল দিয়ে দুপুরের খাবার সারার পর ঢকঢক করে ঘটিভর্তি জল খেয়ে দারুণ তৃপ্তি পায় সে। ক্লান্তিতে ঘুম চলে আসে। যদিও নাতির কোনরকম খাতির করে ওর জন্যে খাট পালঙ্কের ব্যবস্থা করেনি, সেবককে সেবকের মতই থাকতে দিয়েছে! অগত্যা ঐ ঘরের ফরাশে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে সে। না, নাতিরের উপর রাগটা যেন আর নেই। ভীষণ পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমতী মেয়েটি। কাকমহলে আসার পর থেকে জীবিত মানুষের সঙ্গ যতটুকুই সে পেয়েছে—সে তো কেবল ঐ নাতির, নাতির আর নাতিরের সঙ্গ! এত অল্পবয়সী কন্যাকে এত ব্যক্তিত্বময়ী হতে এই প্রথম দেখল সে!

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল কে জানে! হঠাৎ মহেন্দ্রর ডাকে জেগে ওঠে। মহেন্দ্র চোখ বড় বড় করে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে,—একি মহারাজ, আপনি ফরাশে শুয়ে? তখুনি পেছন পেছন মুমল এসে ঢুকলে শব্দ করে বলে,—ওঠ! রাণীমাকে কুর্নিশ কর, তারপর চল তোকে ছেড়ে দিয়ে আসি!

হামীর সুমরা কি স্বপ্ন দেখছে? হাজার-হাজার প্রদীপশিখা হঠাৎ জ্বলে উঠল! সে কি কালো চোখ! টানা ভুরু! পদ্মের ডাঁটির মতন কোমল হাত! টকটকে লাল চোলি ও সোনালী জরির কলকা ও বুটিঅলা ঘাগড়ার নিচে সোনার নূপুর পরা সুন্দর পা'দুটি আলতা মাখা! গমরঙা পেশোয়াজে মুক্তোগাঁথা জাফরাণী ওড়নায় সোনার কাজ করা পাড়, সোনা ও পান্নার ঝলমলে চুড়ি, নীলাখচিত সোনার আংটি। সারা শরীর দিয়ে যেন দ্যুতি বেরুচ্ছে। এ কি কোন স্বপ্নের পরী না অপ্সরা? হামীর সুমরা এরকম সুন্দরী আর দেখেনি!

তখন মুমল বলে ওঠে,—ওকে যদি ছাড়তে হয় এখুনি বেরিয়ে পড়ুন রাণা, নাহলে ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে যে—কৃষ্ণপক্ষের রাত!

কী রিনরিনে মিষ্টি গলার আওয়াজ! হামীর সুমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তাই দেখে মুমলের চোখের দৃষ্টি কেমন পাল্টে যায়।—আপনার সেবকের চাউনি ভীষণ বাজে রাণা মহেন্দ্র, ওকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করুন।

মহেন্দ্রর মুখ শুকিয়ে যায়। তবু যথাসম্ভব রোয়াব সহকারে বলে,—চল ভাই, হা করে দেখছিস্ কী? কুর্নিশ কর!

হামীর সুমরা যন্ত্রের মতন একবার হাত তুলে কুর্নিশ করে বটে কিন্তু তখন ওর চেহারা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। চোখ লাল হয়ে উঠছে। এহেন উদ্ধত ও দুর্বিনীত সেবক কখনোও দেখেনি মুমল। রাণা মহেন্দ্র একে সহ্য করে কেমন করে? মুমলের কেমন একটা খটকা লাগে নাকি, এর পেছনে অন্য কোন রহস্য রয়েছে? এহেন বীর রাণা মহেন্দ্র ওর এই ঔদ্ধত্যকে মেনে নিল? এত দয়ার শরীর রাণার? এই জায়গায় যদি মুমলের বাবা হতো তাহলে এতক্ষণে ওর ঘাড়ে মাথা থাকত না। নিজের মেয়েকেও সামান্য ভুলের জন্য নির্বাসন পাঠিয়েছে, তাঁর সামনে সামান্য এক সেবক কিনা মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাবে! অথচ রাণা মহেন্দ্র এই সেবককে ছাড়ার জন্যই এতদূর গেল!

এত দয়ার শরীর রাণা মহেন্দ্রর ব্যক্তিত্ব বিরোধী বলেই খটকা লাগে, মুমলের মনে। তাহলে কি এর পেছনে আর কোন রহস্য আছে? কি জানি বাবা! পুরুষদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে—নারীর মন বোঝা ভীষণ কঠিন! শুনতে শুনতে সে নিজেও এটা বিশ্বাস করত। কিন্তু আজ অনুভব করে, পুরুষ নারী নির্বিশেষে যে কোন মানুষেরই মন বোঝা ভীষণ কঠিন!

কাকমহল থেকে পথে বেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে এসে মহেন্দ্র রাজার কাছে মুমলের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে,—ওতো আর আপনাকে বলেনি মহারাজ, আমি আপনাকে এই বেশে যেতে মানা করেছিলাম, আপনি শুনলেন না!

হামীর সুমরা কোন জবাব দেয় না। চুপচাপ ঘোড়া চালায়। মহেন্দ্রও চুপচাপ থাকে। পাহাড়ের কাছাকাছি এসে সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে দাঁড়ালে মহেন্দ্র তৎপর হয়ে নিজে ও মহারাজের ঘোড়াদুটিকে নদীতে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ায়। নিজেদের জন্য ছাগল ভরে জল নিয়ে গিয়ে রাজাকে দিলে সে স্থানীয় ঢঙে একহাত পেতে মহেন্দ্রর কাত করা ছাগল থেকে সামান্য জল খায় বটে কিন্তু একটা কথাও বলে না। একবার ওর দিকে

বড়োবড়ো চোখে তাকিয়ে একলাফে ঘোড়ায় চেপে বসে আবার চলতে শুরু করে।

মহেন্দ্র আর কী করে, সে তো মন্ত্রীমাত্র। তবু সে চলতে চলতে কিছু কথা বলে ভাব করার চেষ্টা করে, দিদিকে বলবেন, দীপাবলীর সময় আমি বউ নিয়ে উমরকোট যাবো, দিদিকে দেখিয়ে আনবো। লোদ্রভা থেকে উমরকোট নয়-দশ ক্রোশের মতন দূর হবে।

চড়াই অতিক্রম করতেই হামীর সুমরা বলে,—তুমি আগে নামো! মহেন্দ্র বোঝে রাজার সেবকের সাধারণ ঘোড়াটি আগে থাকলে মহেন্দ্রর তুর্কী ঘোড়াটির নামতে অসুবিধা হবে ভেবে রাজা এমনটি বলেছে। সে চুপচাপ আদেশ পালন করে। কিন্তু মনে একটা খটকা তবু লেগেই থাকে। মহেন্দ্র কোনমতেই সহজ হতে পারে না। সৈনিকরা ওদেরকে হর্ষোল্লাসে স্বাগত জানায়। বীর মহেন্দ্র ও রাজা হামীর সুমরার জয়ধ্বনি দিতে থাকে। জয়জয়কার শুনে নিজের নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে ডংবরসিংহ ভাটি আর সি্নহিড়ো ধমাচানী!

রাজা দুহাত উপরে তুলে ওদের জয়জয়কার থামিয়ে দিয়ে বলে,—তাঁবু গোটাও—এক্ষুণি কুচ করবো!

তারপর অন্য দুই মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বজ্রনির্ঘোষ আদেশ করে,—রাণা মহেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করো—এক্ষুণি! কোমরে শেকল বেঁধে নিয়ে চলো ওকে!

মন্ত্রী দুজন তো অবাক। মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে,—জেনেশুনে তো কোন অন্যায় করিনি মহারাজ, আপনারই আদেশ পালন করেছি মাত্র!

হামীর সুমরা একবার বাঁকা হেসে আবার বাঘের মতন গর্জে ওঠে,—দাঁড়িয়ে দেখছো কি, শেকল পরাও ওকে!

ভাটি আর ধমাচানী কি আর এই সুযোগ হাতছাড়া করে? ওরা তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে মহেন্দ্রর তলোয়ার, ভাল, কিরীচ ইত্যাদি সব কেড়ে নেয় আর তারপর হাতির পায়ে পরানো শেকল ওর কোমরে পরিয়ে দেয়। মহেন্দ্র কোনই বাধা না দিয়ে শুধু হাতজোড় করে একবার ওর অপরাধ জানতে চায়। তারপর কোন জবাব না পেয়ে ছলছল চোখে নীরবে আদেশ পালন করে।

মহেন্দ্র এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে না পারলেও প্রতিবাদ করতে পারত। সে জানে এই শিকারে দলের আশিভাগ সৈন্য রাণা মহেন্দ্রর নিজস্ব সোঢ়ী সৈন্য। রাণাকে গ্রেপ্তার করতে দেখে এরা হতবিহ্বল, অনেকেরই হাত নিশপিশ করছে হয়তো। সে বিদ্রোহ করলে এরা নির্ঘাত তারই সঙ্গ নেবে! কিন্তু মহেন্দ্র হৃদয়াবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটি সম্ভাব্য মহারণ ও ব্যাপক রক্তপাতকে আপাতত প্রতিরোধ করে। বয়স্ক সোঢ়ী সর্দার বীরেন্দ্র সোঢ়ার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হলে সর্দারের রক্তিম চোখ ও প্রত্যয়ী দৃঢ় চোয়াল দেখে। সে মাথা নেড়ে ইশারায় ওদেরকে সংযত থাকতে বলে। হঠাৎ করে মাথা গরম করে দিদির জীবনে বিপদ ডেকে আনতে চায় না সে। সেজন্যেই উমরকোট ফিরে রাজা

ওকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করলেও সে 'টুঁ' শব্দটি করেনি।

কিন্তু সোঢ়ী রাণী এক প্রৌঢ়া দাসীর মুখে একথা শুনে ছটফট করতে থাকে। হামীর সুমরা নিজে এসে খাসমহলে কাটিয়ে গেছে। কত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল মিলনমুহূর্তগুলি। দীর্ঘ অদর্শনের পর নিজেকেও পুরোপুরি সঁপে দিয়েছিল সোঢ়ীরাণী! আশ্চর্যজনকভাবে আজ বন্য বরাহের মতন রাণীর সমস্ত চড়াই উতরাই ও অরণ্যভূমি বারবার কর্ষণ করেছে হামীর সুমরা। আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে সেই বিবাহপরবর্তী নব যৌবনের দিনগুলির মতন। অথচ কী আশ্চর্য, এমন সাংঘাতিক খবরটা ওর কাছে গোপন রাখতে পারল মহারাজ? এমনকি তাঁর ব্যবহারে ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পায়নি, কৃষ্ণপক্ষের একফালি ম্রিয়মাণ চাঁদকে দেখে সোঢ়ীরাণী ভাবে,—পুরুষরা পারেও পটে! কিন্তু তারপর তারা ঝলমলে ভরাট আকাশে স্থির ধ্রুবতারার পবিত্র আলোক দেখে ভাবে, -- অবশ্য সব পুরুষ কি অমন হয়? তাহলে তো মহেন্দ্রও তার অভিজ্ঞতার কথা রাজার কাছে গোপন রাখত। পরে একদিন চুপিচুপি লোদ্রভা চলে গেলে ওকে কে আটকাত?

একটা টিকটিকি কোথা থেকে ডেকে বসে,—ঠিক ঠিক!

ক্রমে সেই সন্ধ্যা সোঢ়ারাণীর জীবনের বিষাদময় সন্ধ্যায় ডুবে থাকে। সোনায় সোনায় মোড়া রাজপুরী ম্লান হয়ে থাকে। ছটফট করতে থাকে। এই একপ্রহর আগেও যে পুরুষের বাহুতে নিজেকে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ভাবছিল, আদরে আদরে যার পৌরুষ তাকে অমোঘ সমর্পণ আর নিবিড় নিজস্ব প্রাপ্তির স্বর্গে পৌঁছে দিচ্ছিল সেই প্রিয়তমকে এখন নিষ্ঠুর অবিবেচক এমনকি মাঝেমধ্যে প্রতারক বলে মনে হয়। সন্দেহ হয় এক প্রহর আগের আনন্দঘন মুহূর্তগুলিতে রাজার বাহুতে সে থাকলেও কল্পনায় অন্য কেউ ছিল কিনা, যার দিকে হাত বাড়িয়েও সে তাকে জয় করতে পারেনি! আর সেজন্যেই—

রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত প্রায়, রাণীর ছটফটানি যখন খোলা ছাদের অন্ধকারে দ্বিতীয় প্রহর ছুঁইছুঁই, প্রৌঢ়া দাসী বিশ্বস্ত এক প্রহরী সর্দারকে নিয়ে আসে। তিনি কয়েদখানার ভারপ্রাপ্ত সর্দার। মদমত্ত মহারাজ তখন অসাড়ে ঘুমুচ্ছে—কী নিষ্পাপ চেহারা! সোঢ়ীরাণীর ভীষণ অভিমান হয়। দেখি মহারাজ, তুমি আমার কাছে কতদিন সব চেপে রাখতে পারো, আর আমি গোপনে তোমার পাপের কতটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি! যেদিন তুমি জানতে পারবে, আমি নিশ্চিত একদিন তুমি অবশ্যই জানতে পারবে, পৃথিবীর কোন স্বামী স্ত্রী চিরকাল পরস্পরের কাছে কোন কথা গোপন রাখতে পারেনি, আমিও পারব না, গোপন রাখতেও চাই না। সেজন্যে তুমি যদি আমাকে কোন শাস্তি দাও, তা আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু এও নিশ্চিত বলতে পারি মহারাজ, একদিন তুমি নিজের ভুল ঠিকই বুঝতে পারবে!

সোঢ়ীরাণী আগেই পালঙ্কে পাশবালিশে চাদর ঢেকে শুইয়ে এসেছে। এখন ওদের গায়ে কালো চাদর, রাণী ও তার দাসীর মাথা কালো ওড়নায় ঢাকা। ওরা সন্তর্পণে পা টিপে টিপে হেঁটে চলে। বুকের ভেতর কামারশালার মতন হাপর চলে। মহলের বাইরে এসে প্রহরী সর্দার ফিসফিস করে বলে,—ভয় নেই রাণীমা, আজ রাতের প্রহরায় সমস্ত

সোঢ়ী বংশীয়দের রেখেছি; কোন অসুবিধা হবে না।

তখন একজোড়া শুকসারি ডানা ঝাঁপটে রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে কারাগারের ছাদের দিকে উড়ে যায়। না জানি কেন রাণীর গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। রাণী কপালে হাত ঠেকিয়ে চোখ বুজে একবার মনে মনে গৃহদেবতা কূললক্ষ্মীকে স্মরণ করে,—আমার মান ইজ্জত, স্বামীর মর্যাদা ও রাজপুত নারীর অহংকারকেও রক্ষা করো মা! আমি যেন মাথা ঠাণ্ডা রেখে যথোচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারি! শুকসারি তো তোমারই আশীর্বাদের প্রতীক! ওরা কেন এদিকে উড়ে এল? একি কোন অশুভ লক্ষণ?

প্রৌঢ় দাসী ফিসফিসিয়ে বলে,—নিশ্চিত থাকো বেটি, কূললক্ষ্মীর বাহন দুটি তোমার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসেছে, নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে! সোঢ়ীরাণী মনে মনে বলে,—তাই যেন হয় মা, তোমার আশীর্বাদ যেন আমার সঙ্গে থাকে, আমার কোন পদক্ষেপ যেন স্বামীর মর্যাদাহানি না ঘটায়, পাশাপাশি আমি যেন আদরের ভাইটির উপর অত্যাচারকে সামান্য লাঘব করতে পারি!

ওরা সন্তর্পণে কারাগারে প্রবেশ করে। সত্যি কোন অসুবিধা হয় না। ওকে কাছে পেয়ে মহেন্দ্র সব বিস্তারিত জানায়। সোঢ়ীরানী হামীর সুমরার জেদ জানে। একবার যেটা গো ধরবে তা থেকে একচুলও সরানো মুস্কিল। তার উপর রাজা যতদিন ওকে নিজের মুখে সব খুলে না বলছে—সে তো এ বিষয়ে কোন কথাই রাজাকে বলতে পারবে না! এসব ভেবে রানী তার ছোটভাই ও প্রধান প্রহরীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে। ওরা জানে, আস্তাবলের প্রহরীরা প্রায় সবাই সুমরা কিন্তু উটচালকরা সোঢ়ীদের অনুগত। তাই ঠিক হয়, পরদিন সন্ধ্যার পর একটি উটের পিঠে চেপে রাণা মহেন্দ্র মুমলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে আর মিলনশেষে ভোরের আগেই ফিরে এসে আবার বন্দী হবে।

মহেন্দ্র এই শর্ত মেনে নিল—যতদিন রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজে থেকে ওকে মুক্তি না দেবে ততদিন মহেন্দ্র এভাবেই মুমলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে আর ভোরের আগেই ফিরে আসবে! অবশ্য শুক্লপক্ষের ছয়দিন আর কৃষ্ণপক্ষের ছয়দিন জ্যোৎস্না রাতে নিজেকে সংযত রাখবে যাতে কেউ দেখে না ফেলে!

—আচ্ছা যুগলজী, উমরকোট থেকে লোদ্রভা যদি আট নয় ক্রোশ হয় তাহলে উটের পিঠে এই কুড়ি পঁচিশ কি.মি পথ পেরিয়ে অভিসারে যাওয়া আর ফিরে আসার ব্যাপারটা কষ্টকল্পিত নয় কি? আমি আর পরিতোষ তো মাত্র একঘন্টা উটে চেপে দুদিন কোমর আর পিঠ ব্যথায় ভুগেছি।

নাসিমের এই প্রশ্ন শুনে যুগলজি একটু ভেবেচিন্তে বলে,—আপনি ঠিকই বলেছেন, এ নিয়ে অনেক ঐতিহাসিকই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় রোজ না হলেও মাঝেমধ্যে এটা সম্ভব! আপনারা পূর্বদেশের লোক, জীবনে প্রথমবার উটের পিঠে চেপেছেন, অনভ্যাসে এত গা-ব্যথা হয়েছে।

রামঅবতার বলে,—পূর্বদেশের লোক বলে নয় স্যার, আমিও যেদিন প্রথম চড়েছি—খুব কষ্ট হয়েছিল, পরে অভ্যস্ত হলেই ঠিক হয়ে যায়! এখন তো নানা মরুমেলার ঠ্যালায়

প্রায়ই উটের পিঠে চাপি—এখন আর অসুবিধা হয় না!

যুগলজী বলে,—তাছাড়া সোঢ়ারা উটচালনায় প্রচণ্ড দক্ষ। আজও যে কোন মরু উৎসব কিম্বা মরুমেলায়—যেখানেই উটদৌড় হয় সেখানে বেশ কয়েকজন সোঢ়া প্রতিযোগী থাকে। মাঝেমধ্যে তো ওরাই একচেটিয়া পুরস্কারগুলি জিতে নেয়! এখন ওরা 'সোঢ়ী' ছাড়াও 'পাওয়ার' উপাধি ব্যবহার করে।

রামঅবতার বলে,—সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাভেলরি বিভাগেও 'সোঢ়ী' ও 'পাওয়ার' উপাধির সৈনিকদের সংখ্যা অন্য রাজপুত বা ভীলদের থেকে বেশী, অবশ্য সুমরা বংশজ মুসলমানরাও কয়েক শতাব্দীর অভিযোজনে উটচালনায় বেশ দক্ষ।

ওদেরকে মূল গল্পে ফিরিয়ে আনার জন্যে পরিতোষ যুগলজীকে জিজ্ঞেস করে,—তাহলে আপনি বলছেন মহেন্দ্র রোজ অভিসারে যেত না, মাঝেমধ্যে যেত?

—হ্যাঁ পরিতোষ, অথবা প্রতিরাতে উট পাল্টাত! কিন্তু তাতেও মহেন্দ্রর সক্ষমতা অতিমানবিক বলে মনে হয়। প্রতিরাতে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার উটচালনার পর কারাগারে ফিরে নিশ্চয়ই ওকে সারাদিন ঘুমুতে হত! তারপরও গায়ের ব্যথা কমতো কিনা সন্দেহ —তারপর অভিসারে গিয়ে মহেন্দ্র আর কী করত-হা-হা-হা—

যুগলজীর রসিকতায় পরিতোষ হেসে ফেলে। হেসে ফেলে নাসিম আর রামঅবতার। নাসিম বলে,—প্রতিরাতে উট পাল্টালে এ দিকটা সম্ভব হলেও মিলনের ব্যাপারটা অবাস্তব মনে হয়। মহেন্দ্র নিশ্চয়ই শুধু চেহারা দেখতে আর দু'দণ্ড গল্প করতে এতদূর উট চালিয়ে মুমলের কাছে যেত না!

এ ব্যাপারে পরিতোষের ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই বলে সে চুপ থাকে। কিন্তু ওর চোখে ভাসে উমরকোটের জাদুঘরে রাখা রাণামহেন্দ্রর ঢাল তলোয়ার-এর বিশাল আকার। এত ভারী ঢাল একহাতে উঠিয়ে যে আত্মরক্ষা করতো, এত চওড়া আর সোয়া দুই হাত লম্বা তলোয়ার ঘুরিয়ে যে যুদ্ধ করত সেই মহাবীর মহেন্দ্রর শারীরিক সক্ষমতার মান নিয়ে পরিতোষের মনে কোনরকম সন্দেহ চাড়া দেয় না। বরঞ্চ মনে হয় রাণা মহেন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিকদের একজন, সেজন্যে তাঁর কাছে দুনিয়ার কোন প্রতিকূলতাই আর বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। কেননা সে বিশ্বাস করে—প্রেম কোন মানুষের চালিকাশক্তি হলে অজান্তেই তার সক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। আর অপ্রেম মানুষকে করে তোলে অকর্মণ্য, নিরুত্তেজ আর থেকে থেকেই আত্মঘাতী হওয়ার কথা ভাবতে থাকা একটা নিরুত্তেজ অক্ষম ফসিল!

পাঁচ

.... আজ আমার শরীরে বড়ো তাপ
আমাকে গ্রহণ করো
আমি তোমার ইতিহাসে যাবো।'

—সন্তোষ রায়

অসীম সহনশক্তি নিয়ে জন্ম নেয় এক একটা উট। এর আগে সে কখনো কোনো উটকে এমনি কাঁদতে দেখেনি। আজ সকালে এই উটটাকে কাঁদতে দেখে সে অবাক। দ্বিতীয়বার লোদ্রভায় এসে এমন বিপদে পড়বে নাসিম সেটা স্বপ্নেও ভাবেনি। সে যখন কাকপ্রাসাদে ঢুকছে তখনও ঠা-ঠা রোদ্দুর। বাবুল ও কিকর গাছগুলি ঝিমিয়ে পড়ে ধুঁকছিল। অন্যান্য ভগ্নাবশেষ ও পুরাকীর্তির আশপাশে গজিয়ে ওঠা গাছপালা এমন নিষ্প্রাণ থাকে না। কিন্তু এখানে নিরন্তর শুষ্কতা ও মরুবাতাসের প্রবল হুঙ্কার বিরুদ্ধে জীবনের লড়াই প্রকট। তখনও অবশ্য বাতাস ছিল না। খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হচ্ছিলো, কেননা প্রাসাদকায় কাঁকড়াবিছে আর গোখরো সাপের রাজত্ব। একটু অসাবধান হলেই যে কারো দংশনে মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। ঘন্টাতিনেকের মধ্যেই নিজের কাজ সেরে সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসে। তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এবং দেখতে না দেখতে ধূলিঝড়। আঁধি। একমুহূর্তের জন্যে সেই ভীমকায় অ্যানাকোন্ডার মতন আকাশছোঁয়া টর্নেডোটাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে। ওর বাহন উটটা প্রবল আর্তচিৎকার করতে থাকে। তারপর এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিজের বুকে মুখ গুঁজে বসে পড়ে। আর উটচালক? প্রবল হাওয়ায় মুঠি মুঠি ধুলো নাসিমের চোখেমুখে আছড়ে পড়ে। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পাশের ভাঙা মন্দিরটায় ঢুকে পড়ে। তবু মন্দিরের উঁচু প্রাচীরবেষ্টনকে ভেদ করে রাশিরাশি বালিকণা ওর ঘাড়ে ও হাতে তীরের মতন বেঁধে। বিঁধতেই থাকে। নাসিম অনেকক্ষণ উটপাখির মতন মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। ঝিম মেরে পড়ে থাকে যতক্ষণ না আঁধির ধুন্দুমার চলতে থাকে। এ যেন প্রলয় তাণ্ডব।

একটু পরেই সে কড়কড় করে বাজ পড়ার শব্দ শুনতে পায়। তারপর বৃষ্টির শব্দ। মুষলধারে বৃষ্টি। যাক, এতক্ষণে সে মাথা তুলে বসতে পারে। উঠে দাঁড়ায়। মন্দিরের বাইরে উঁকি দিয়ে বৃষ্টির প্রাবল্য লক্ষ্য করে। একে বৃষ্টি না বলে ঢল বলাই ভাল। কোনো আবহাওয়াবিদ থাকলে বলতেন 69 থেকে 70 RA। রাজস্থানে এমন বৃষ্টি সে কোনোদিন দেখেনি। অবশ্য আঁধির থেকে অনেক ভাল এই বৃষ্টি। এই বৃষ্টি না এলে এমনি আঁধি চলতো হয়তো সারারাত কিম্বা আগামীকাল অব্দি।

দুর্যোগের আগেই সে নিজের কাগজপত্র একটা পলিথিন প্যাকেটে পুরে নিজের ঝোলায় সামলে রেখেছিল। তারপর আঁধির সময় ঐ ঝোলার মধ্যেই মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। এখন ঝোলাটাকে মূল মন্দিরের সিঁড়িতে রেখে এগিয়ে গিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে হাত ধোয়। অঞ্জলি ভরে বৃষ্টির জল নিয়ে চোখমুখে ঝাপটা দেয়। এতে অনেক বালি ধুয়ে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্মল হয় না। দাঁতে বালি কিচকিচ করে। সে কাঁধের ব্যাগ থেকে টর্চ আর জলের বোতল বের করে। কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে একঢোক জল খেয়ে বোতলটা ব্যাগে রাখে। ঘন অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে মূল মন্দিরের দরজাটা দেখতে পায়।

দরজাটা মজবুত। সেটা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে। টর্চের আলো চারিদিকে ঘোরায়। সামনেই একটি ছোট নাটমণ্ডপ। একটু এগিয়ে গর্ভগৃহ। নাটমণ্ডপ ও গর্ভগৃহের মাঝে তৈরী ভোগমণ্ডপের চারটি দেয়ালই ধ্বসে পড়েছে। নাটমণ্ডপের দেয়ালগুলির পলেস্তারা খসে নানা জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে। আগেকার দিনের পাতলা পাতলা ইট। মেঝেও অনেক জায়গায় চলকা ওঠা এবং ধুলোয় ধুলোময়। একটি আলগা থাম ভেঙে একটা গন্ধর্ব আর একটা হাতীর পায়ের অংশবিশেষ আলাদা হয়ে গেছে। একটু এগিয়ে সে গর্ভগৃহে আলো ফেলে দেখে একটা কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। চারপাশে বাদুড় ও চামচিকের গন্ধ। এছাড়া পশুর বিষ্ঠা ও পেচ্ছাবের গন্ধে ওকি ওঠে বারবার। বাইরে এখনো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মান্দির ও কাকপ্রাসাদের চারপাশে জল জমে গেছে। বেশ কিছু গাছ উল্টে পড়েছে। রাতটা এই মন্দিরেই কাটানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অগত্যা একবার টর্চ জ্বালিয়ে মন্দিরটা ঘুরে দেখে নেয়।

প্রদক্ষিণ পথে চারকোণায় চারটি ক্ষুদে মন্দির। মেঝে আদ্যিকালের চ্যাপ্টা পাথরের। চারপাশের দেওয়ালে ভেতর দিকটায় সারি সারি মানুষসমান দেবদেবীর মূর্তি। কিন্তু সবক'টা মূর্তিই ভাঙা। যদিও প্রত্যেকটারই কোনো না কোনো অঙ্গ এখনও অক্ষত। ডমরু...পদ্ম...নর্তকের ধড়...বাহনের পেখম, শিংসুদ্ধ মাথা কিম্বা কেশরযুক্ত উর্দ্ধাঙ্গ মূর্তির পাশেই বালিচাপা পড়েছে। এছাড়া পশুপাখির বিষ্ঠা, অজস্র শুকনো পাতা আর মাকড়সার জাল মন্দিরের প্রদক্ষিণ পথটাকে দুর্গম করে রেখেছে। একটা ভাঙা গাছের ডাল দিয়ে মাকড়সার জাল সরিয়ে অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করে সামনে এগোয় সে। মূল মন্দিরের দুটো দেয়ালের উপরের অংশ নকশাদার পাথরের গ্রিলে তৈরী। রোদ ও বাতাস ভেতরে যাওয়ার জন্যেই হয়তো এই ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে একবার পুরোটা ঘুরে দেখে নিয়ে আবার মূল দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখনো জোরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির ছাট এতদূর অব্দি চলে আসছে। মূল মন্দিরের দরজাটা খোলা। গর্ভগৃহের ভেতরটা অবশ্য শুকনো ও পরিষ্কার। কোনোমতে ওর শোওয়ার জায়গাটা হয়ে যাবে। ঝোলাব্যাগটা পাশে রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে সে বসে পড়ে। পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস নেয়। এখানেও বাদুড়-চামচিকের গন্ধ। সে ঝোলা থেকে মোমবাতি আর দেশলাই বের করে। আলো জ্বালায়। টর্চ বন্ধ করে বাবু হয়ে বসে। ঝোলা থেকে টিফিনবাক্স আর জলের বোতল বের করে। একটা তোয়ালে বিছিয়ে তার উপর বড়সড় একটা রুমাল পেতে সে জয়শলমীর থেকে কিনে আনা রুটি আর ছোলার তরকারি খায়। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ। কিন্তু একটা রুটি খাওয়ার পরই আর ভাল লাগে না। কেমন গা গুলায়। হয়তো বাদুড়-চামচিকের দুর্গন্ধে ওক্কি আসছে। কিন্তু রেখে দিলে বাকি তরকারিটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সে আরো অর্ধেকটা রুটি ছিঁড়ে তা দিয়ে বাকি তরকারিটা খেয়ে নেয়। বাকি থেকে যায় আরো আড়াইটা রুটি আর দুটো কালাকান্দ। সে মনে মনে ভাবে, সকালে এগুলি খেয়ে উমরকোট রওয়ানা হবে। এই প্রবল দুর্যোগে বাহন উটটা কেমন আছে কে জানে! উটচালক কোথায় আশ্রয় নিয়েছে?

নাসিম মন্দিরের উঠোনে হাত বের করে বৃষ্টির জলে ধোয়। এতবছর ধরে সে রাজস্থানে রয়েছে কিন্তু একনাগাড়ে এত বৃষ্টি হতে দেখেনি কখনো। মন্দিরের বাইরে দস্তুরমতো জল জমে গেছে। সে মূল মন্দিরের দরজাটা লাগিয়ে দেয়। এই দুর্যোগের রাতে সাপখোপ কিম্বা অন্য কোনো প্রাণী প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঢুকে পড়তেই পারে। দরজার ছিটকিনি দুটো এখনও অক্ষত দেখে আনন্দ

হয়। সে আবার গর্ভগৃহে ফিরে আসে। চাদরটাকে ভাঁজ খুলে দেয়ালের গায়ে বিছিয়ে নেয়। শিবলিঙ্গটা গর্ভগৃহের মাঝামাঝি। টানটান হয়ে শুয়ে পড়তেই বুঝতে পারে যে গর্ভগৃহটি ছয়ফুট বাই ছয়ফুট। কেননা ওর নিজের উচ্চটা পাঁচফুট এগারো ইঞ্চি। তোয়ালেটাকে ভাঁজ করে মাথার নিচে দিয়ে ঝোলা থেকে একটা চাদর বের করে গায়ে দেয়। মোমবাতির আলোয় সুন্দর কারুকার্য করা সিলিঙটা দারুণ লাগে। সকালবেলা বেরোনোর আগে এই মন্দিরটার একটা সম্পূর্ণ পরিমাপ নিতে হবে। নাটমণ্ডপের দৈর্ঘ, প্রস্থ আর ছাদের ঢাল....গর্ভগৃহের দেওয়ালে খোদিত পদ্ম...পাথরের গ্রীলগুলির কারুকার্য এবং সবশেষে মন্দিরের শিখর। এই মন্দিরকে সজীব দেখাতে হলে হুবহু এমনি সেট বানাতে হবে যে!

মোমবাতির আলোয় দেখা যায় গর্ভগৃহের সিলিঙ ও কোণাগুলি মাকড়সার জালে ঢেকে গেছে। এত সুন্দর কারুকার্যে মাকড়সার জালের ছায়াগুলি এক অদ্ভুত দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে। এ যেন মহাকালের ত্রিমাত্রিক রূপ। একথা ভাবতেই একটা অদ্ভুত শিহরণ মাথার পেছন থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে কোমর অব্দি নেমে যায়। তারপর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে। জীবনে প্রথম এমন অস্বাভাবিক রাত কাটাচ্ছে সে। উটটা এখন কী করছে? উটচালকই বা কোথায় আশ্রয় নিয়েছে?

সেই সকাল আটটায় জয়শলমীর থেকে বাসে চেপেছে। ঘন্টাখানেক মরুপথে চলার পর বাস উমরকোট পৌঁছায়। উমরকোট ছোট শহর। বাসস্ট্যাণ্ড ঘিরে কিছু দোকানপাট, একটি স্কুল, পুরনো রাজবাড়ি, পুলিশ চৌকি, বি.এস.এফ ক্যাম্প ইত্যাদি সহ একটি সীমান্তবর্তী ছোট জনপদ। নাসিম আগেও একবার এসেছে কবি যুগল পরিহার আর নিজের সহকর্মী পরিতোষকে সঙ্গে নিয়ে। সেবারও ওরা উমরকোট থেকে উট ভাড়া করে উটের পিঠেই আরাবল্লী পেরিয়ে এসেছিলো। নাসিম উট ভালবাসে। এখন ওর ঘুম দরকার। ক্লান্তিতে শরীর অবশ হয়ে আসছে। সে টর্চটা প্যান্টের পকেটে রেখে মোমবাতি বুজিয়ে দেয়। নিকষ কালো গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু শব্দহীন নয়। বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়াও ভেতরে ইঁদুর কিম্বা চামচিকের চলাফেরার শব্দ। মাঝেমধ্যেই কিসে যেন ডানা ঝাপটায়। কিন্তু ক্লান্তিতে শরীর অবশ করে ঘুম আসে। সে ঘুমিয়ে পড়ে। পেরিয়ে যায় একটি স্বপ্নহীন রাত।

কাকভোরে ঘুম ভাঙতেই ধড়মড়িয়ে ওঠে। চোখ ডলে। নাটমণ্ডপের গ্রীলের ফাঁক দিয়ে অল্প আলো ঢুকেছে। ঐ গ্রীল দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। নাসিম চাদর দু'টি ভাঁজ করে ঝোলাব্যাগে ঢুকিয়ে রাখে। নাটমণ্ডপের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে আড়মোড়া ভাঙে।

ও চারিদিকে তাকায়। মন্দিরের পেছনদিকটায় একটা নিচু জায়গায় জল জমে পুকুরের আকার নিয়েছে। সে প্রকৃতির ডাক টের পায়। আবার গর্ভগৃহে ঢুকে ঝোলাব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরোয়। তারপর সাবান ও তোয়ালে বের করে ব্যাগটাকে মাথাভাঙা বৃষের ঘাড়ে ঝুলিয়ে সে মন্দিরের পেছন দিয়ে হেঁটে ঐ জমা জলের একপাশে ফণিমনসা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ে। এভাবে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার অভ্যাস নেই। ভয় করে কাঁটার খোঁচা না লেগে যায়! ঐ জমা জল বেশ স্বচ্ছ। সেখানেই শৌচ ও হাতমুখ সাবান দিয়ে ধুতে গিয়ে স্নান করার ইচ্ছে হয়। চারপাশে কোথাও কেউ নেই। সে জামাকাপড় খুলে রেখে ঐ হাঁটুজলেই বসে পড়ে স্নান করে নেয়। কী যে আরাম

লাগে তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। তারপর তোয়ালে দিয়ে গা মুছে পোশাক পরে। এবার গিয়ে উটটাকে দেখতে হবে। ওটা কী করছে কে জানে!

তখনই হঠাৎ ওকে অবাক করে দিয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে পবিত্র আজানের সুর। সে ঘুরে তাকায়। পশ্চিমদিকের ছোট একটা বাবলা গাছের মাথার উপর দূরে একটি মসজিদের মিনার দেখা যায়। নাসিম বুকভরে শ্বাস নেয়। এই পরিবেশে অপ্রত্যাশিত আজানের সুর ওর খুব ভাল লাগে। সে ঝোলাব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে পাথরের উপর বিছিয়ে নেয়। তার উপর হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বন্ধ করে। নামাজ পড়ে। যতক্ষণ আজানের সুর শোনা যায় যে এমনি নতজানু নামাজ পড়তে থাকে। তারপর চাদরটাকে ভাঁজ করে ব্যাগে রাখে। এবার সে গিয়ে উটটাকে দেখে আসে। উটটাও ওকে দেখে একবার হাই তোলে। কিন্তু উটচালক কোথায়? কোথাও প্রাতঃকৃত্য সারতে গেছে কি? লোকটা সারারাত কোথায় ছিল?

তখনো সূর্য উঠতে বেশ দেরী। নাসিম ভাবে, এবার মন্দিরটাকে মাপতে হবে। কারুকার্যমন্ডিত থামগুলির মাঝের দূরত্ব, উচ্চতা, পাথরের হাতি ও পদ্মগুলির স্কেচ এঁকে নেবে। দেয়ালের গ্রীলের নিচে পাথরে খোদাই করা নর্তকী ও বাদ্যকরদের নানা বিভঙ্গ, কোণায় কোণায় দ্বারপাল, যক্ষ ও যক্ষিনী, উপরের ছাদে উল্টো পদ্ম। এখনো সূর্য ওঠেনি। এগুলি আঁকার জন্যে আরো আলো চাই। নাসিমের হাই ওঠে। না-জানি কেন মনে হয় ঘুম পুরো হয়নি। সে ভাবে, আরো পঁচিশ-ত্রিশ মিনিটের আগে ভেতরে আলো আসবে না। ততক্ষণ অনায়াসে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। একথা ভাবতেই আরেকবার হাই ওঠে। মন্দিরের দরজাটা লাগিয়ে শুয়ে পড়তেই দু-চোখ জড়িয়ে আসে। সে ঘুমিয়ে পড়ে।

শুকনো ঝরাপাতার উপর দিয়ে কোনো সাপ কিম্বা গিরগিটি গেলে যেমন খসখস শব্দ হয় তেমনি ফিসফিস ফিসফিস ফিসফিস......। নাসিমের মনে হয় স্বপ্ন। কিন্তু গুঞ্জন বাড়তে বাড়তে ঢিলের মতন কিছু শব্দের অভিঘাতে ওর ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখে পাথরের গ্রীলের ফাঁকে ফাঁকে নানাবয়সী অসংখ্য মানুষের নাক, মুখ ও চোখ। মৌচাকে মৌমাছি বসার মতন বারবার সেই চোখ মুখ গোঁফ ও নাকগুলি পাল্টে যেতে থাকে। তিনদিকের গ্রীলেই কিশোর, যুবক ও মাঝবয়সীদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। নাসিম অবাক। বারবার চোখ কচলায়। সে হতবাক। ওকে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে। নাসিম ঘাবড়ে যায়। বাইরে হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। অনেকের দৌড়ঝাঁপ, বাঁশি ও দামামার শব্দ শোনা যায়। নাসিম নাটমন্দিরে এসে থমকে দাঁড়ায়। গ্রীলের চেহারাগুলি এবার আরো জোরে চেঁচায়। অনেকে গ্রীলের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওকে কাছে ডাকে। কেউ কেউ ওকে কাছে পেলে খামচে দেওয়ার মতন অঙ্গভঙ্গি করে। ওদের বিস্ফারিত চোখে ঘৃণা। ওকে কাছে পেলে চুল ছিঁড়ে নেবে। সে ভয়ার্ত চোখে দরজার দিকে তাকায়। ছিটকিনিটা লাগানো রয়েছে। কিন্তু দুজন সমর্থ মানুষ চারটে লাথি মারলেই দরজাটা ভেঙে যাবে। যদিও ওরা কেউ দরজার কাছে নেই। যদিও গ্রীলের বাইরে ভিড় বাড়ছে। ওদের হাতে লাঠিসোটা, দড়িদড়া, কারো কারো হাতে তলোয়ার। ..... মুসলমান....মন্দির....ফর্সা....লম্বা...একা....নিরস্ত্র....না-না সশস্ত্র....ইত্যাদি শব্দ ওকে তীরের মতন বিদ্ধ করছিল বারবার। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ। জল খেতে গিয়ে দেখে ঝোলাব্যাগটা কোথাও নেই। কোথায় গেল ঝোলাব্যাগটা? মাথা কাজ করছে না একদমই।

বাইরে হট্টগোল বাড়ছে। কেউ কেউ কিছু একটা শ্লোগান দিচ্ছে। অন্যরা তার জবাব দিচ্ছে। নাসিম দু'পা এগিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকায়। চারপাশের গাছগুলোর ফাঁকে যতদূর দেখা যায় মানুষের মাথা আর মাথা। সামনের মাথাভাঙা বৃষটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, আরে! ঝোলাব্যাগটা ঐ মূর্তির কাঁধে ঝোলানো ছিল যে! এখন মূর্তিটার কাঁধ শূন্য। বাইরের ভিড়ে কয়েকজন সাধুও রয়েছে; কপালে তিলক, গায়ে নামাবলী, হাতে ত্রিশূল। বাচ্চারা মহা উৎসাহে এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ঠিক তখনই দরজার ফাটলের ওপাশ থেকে কেউ একজন উঁকি দেয়। ওর বাদামী চোখের মণি রোদে চকচক করছে। নাসিম পিছিয়ে আসে। ওর শরীর কাঁপতে শুরু করে। নাটমণ্ডপের বাইরের গ্রীলগুলিতে এখন নাক-চোখ-মুখ আর কণ্ঠস্বর পাল্টাচ্ছে দ্রুত। ওরা কয়েকমুহূর্ত অবাক চোখে দেখছে তারপর কেউ কেউ পেছনের লোককে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে, অন্যদেরকে টেনে সরিয়ে নিজে সামনে চলে আসছে। কেউ কেউ গালি দিচ্ছে। নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না নাসিম। এত বছর ধরে সে রাজস্থানে রয়েছে। শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ বলে পরিচিত এই জনতা হঠাৎ এত ক্ষেপে গেল কেন? কী করেছে ও? কোনো রাজস্থানী ডায়লেক্টে গালি দিচ্ছে ওরা। ওকে সামনে পেলেই ছিঁড়ে খাবে।

নাসিম ভয়ে পিছোতে পিছোতে গর্ভগৃহের ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়ে। শিবলিঙ্গের পেছনের দেয়াল সেঁটে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ে। গর্ভগৃহ তখনও প্রায় অন্ধকার। এখন ওকে কেউ দেখতে পাবে না। ও ভয়ে কাঁপছে। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। নিজের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানির শব্দ সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে। সারা শরীর ঘামছে, হাতের তালুগুলি ভিজে গেছে।

ও কেবল শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শ্লোগান, গালি ও হট্টগোল। হট্টগোল বাড়ছে। বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে হঠাৎ সব চুপ। কিছুক্ষণ কান পেতে শোনার চেষ্টা করেও কোনো শব্দ শুনতে না পেয়ে নাসিম চতুষ্পদী জন্তুর মতন হামাগুড়ি দিয়ে গর্ভগৃহের বাইরে আসে। অবাক হয়ে দেখে গ্রীলের ওপারে আর একটি চেহারাও দেখা যাচ্ছে না। এটা কেমন করে সম্ভব হলো? গ্রীলের ওপারে গাছে পাতার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। নাসিম উঠে দাঁড়ায়। নাটমণ্ডপ পেরিয়ে আবার দরজার ফাটলে চোখ রাখে। মন্দিরের ভাঙা দরজায় এখন দু'জন বন্দুকধারী পুলিশের সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দূরে সারিবদ্ধভাবে আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে, হয়তো এখন পুরো মন্দিরটাকেই পুলিশ ঘিরে রেখেছে। একটু দূরে একটা পুলিশের জীপও দাঁড়িয়ে আর তার সামনে কয়েকজন অফিসার।

নাসিম একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক্, এবার তাহলে বাইরে বেরুতে পারবে! ওর মাথা একটু একটু করে কাজ করতে শুরু করে। সে আড়মোড়া ভাঙে। এটাই ওর দরজা খুলে বাইরে বেরুনোর উপযুক্ত সময়! নাহলে ওরা একটু পরেই দরজা ভেঙে ঢুকবে....অথবা গ্রীলের ফাঁক দিয়ে গুলিও চালাতে পারে। অবশ্য এসব করার আগে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবে তো নিশ্চয়ই! ওরা ওকে কী ভাবছে? ওরা পেয়েছেটা কী? সে তো আজন্ম এই দেশের সন্তান। আগরতলা ভি.এম হাসপাতালে ওর জন্ম। ওর বাবা ত্রিপুরা রাজবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত নায়েব সুবেদার। তিনি একটি কৃষ্ণচূড়া ও তার বড় হয়ে ওঠা শহর আগরতলা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে পারেন নি। সমস্ত আত্মীয়স্বজনরা চলে গেলেও তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু কামানচৌমুহনী ও মঠ চৌমুহনীর

মাঝামাঝি মসজিদ পট্টি অঞ্চলেই থেকে গেছেন। ঐ শহরের জল, মাটি, হাওয়ায় বড় হয়েছে ওদের সন্তান-সন্ততি। নাসিম আগরতলার গান্ধী স্কুলের ছাত্র। ১ম শ্রেণী থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি অব্দি ঐ একটা স্কুলেই পড়েছে। ফুটবল, ব্রতচারী, এন.সি.সি-ক্যাম্প ইত্যাদি বড় হওয়ার সঙ্গী। এম.বি.বি কলেজ থেকে ইতিহাস অনার্স নিয়ে স্নাতক হওয়ার পর ইউ.পি.এস.সি-র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে গত বারো বছর ধরে সে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসার। এম.এ করেছে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে। ছোটবেলা থেকেই সে অত্যন্ত নিরীহ ও ভীতু প্রকৃতির। প্রজাপতির পাখা, পিঁপড়ের ঠ্যাং কিম্বা ফড়িঙের ডানা ছিঁড়লে সে কেঁদে ফেলতো। যদিও জানে, কান্না একটি মেয়েলি ব্যাপার কিন্তু সে ঐ কথা মানে না। কান্না পেলে পুরুষ কী করবে?

বাইরে ভীষণরকম নিস্তব্ধতা। এই নৈঃশব্দ হট্টগোল থেকেও ভয়ঙ্কর। এর আতঙ্ক এখন স্থির। নাসিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আবার বুকভরে শ্বাস নেয়। তখনই একটু দূর থেকে আবার হট্টগোলের আওয়াজ, হাততালি ও শঙ্খ বাজার শব্দ শোনা যায়। তারপর কেউ মাইকে 'হ্যালো টেস্টিং ... এক-দো....হ্যালো টেস্টিং....এক-দো....' করতে থাকে। তারপরই কেউ একজন বক্তৃতা দিতে শুরু করে। মন্দিরের ভাঙা দেওয়াল, নাটমণ্ডপের বাইরের গ্রীল ও মন্দিরের ছাদে ঝুলে থাকা বাদুড় ও চামচিকের উগ্র গন্ধকে অগ্রাহ্য করে মাইকের শব্দ ওর কানে আসছিলো।

রাজস্থানী উচ্চারণের শুদ্ধ হিন্দিতে লোকটা বলে—'বন্ধুগণ, আমাদের এই শান্ত, নিরুপদ্রব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ঘৃণিত ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি চাই আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন এবং কোনোরকম উত্তেজনার শিকার হবেন না। আমি আপনাদের সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম সবিস্তারে জানাবো। আপনারা আগে ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা জানুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন।'

এবার লোকটা গলাখাঁকারি দিয়ে আওয়াজ পরিষ্কার করে বলে—'আজ কাকভোরে মোরগ ডাকার আগেই আমাদের গ্রামের এক কিশোর এই মন্দিরে একজনকে নামাজ পড়তে দেখেছে। তারপর সেই লোকটা একটু দূরেই বাবুল গাছের নিচে বসে থাকা একটি উটকে দেখে আবার গিয়ে মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মন্দিরের বাইরে বৃষের মূর্তির কাঁধে ঐ লোকটার একটি ব্যাগ ঝোলানো ছিল।

ঐ কিশোর পুরোহিতের ছেলে, হিন্দু সংস্কার ওর জন্মজাত। মন্দিরে কাউকে নামাজ পড়তে দেখে পবিত্র সংস্কার ও পূজাআর্চার পরিবেশে বড় হওয়া কিশোরটি মনে মনে অপমানিত বোধ করে আর ওর মনে একটি অপবিত্র আশঙ্কা জন্ম নেয়। এই ধর্মপ্রাণ বালকবীর নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দৌড়ে ঐ ব্যাগটি তুলে এনে ওর বাবাকে দেয়। সমস্ত কথা জানায়।

এই ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তী বৃত্তান্ত জানানোর আগে আমি আপনাদেরকে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলতে চাই! আপনারা সবাই জানেন, এই মন্দির ও মুমোলরাণো খ্যাত কাকপ্রাসাদ—যার সামনে আমরা আজ একত্রিত হয়েছি, এগুলি এই অঞ্চলের গর্ব। এই প্রাসাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতে মন্দিরটি যেরকম অবস্থায় ছিল, আমাদের চেষ্টায় ভবিষ্যতেও তেমনি রমরমা থাকবে। আমি ভেবেছিলাম এই অঞ্চলের ভাইবোনদের যথাসময়ে এই শুভসংবাদটি জানাবো। কিন্তু আজ এই অপ্রিয় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ায় আজই আপনাদেরকে জানাচ্ছি!'

একটু সময়ের জন্যে বক্তা চুপ। নাসিম অবাক। তবু মনোযোগ দিয়ে লোকটার কথা শুনছিল। লোকটা মাইকে একটু কেশে নিয়ে বলে,—ব্যাপারটা হলো, দু'দিন আগেই আমি শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে ফিরেছি। আপনারা জানেন যে আমি পারতে অঞ্চল ছেড়ে যাই না। সুখে-দুঃখে বিপর্যয়ে সবসময় আপনাদের পাশে থাকি। কিন্তু এই ব্যাপারটার সঙ্গে আপনাদের সবার স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে বলে আমি এ নিয়ে কথা বলতে গেছিলাম।

আসলে, কিছুদিন আগে আমি একটি বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছি। পরপর তিনরাত ধরে একই স্বপ্ন। পূজারীজীর কাছে এর অর্থ জানতে গেছিলাম।'

ভিড় সরব হয়ে ওঠায় মাইক কিছুক্ষণ চুপ। আবার শঙ্খ বাজার শব্দ শোনা যায়। তারপর আবার মাইক বলতে শুরু করে—'হ্যাঁ, জানি আপনারা আমার স্বপ্নের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান। সেজন্যে সবার আগে আমি আপনাদের সেটাই বলছি। সেদিন রাতে আমি দেরীতে ঘুমিয়েছিলাম। শেষরাতে হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম যে একটি সোনালী রঙের পাখি আকাশে উড়তে উড়তে পাক খেয়ে নিচে নামে আর একটি মন্দিরের চূড়ায় বসে। আমি অবাক হয়ে দেখি—ঐ মন্দিরের চূড়াটি হুবহু আমাদের কাকপ্রাসাদের শিবমন্দিরের মতন। পাখিটা খানিকক্ষণ ঐ শীর্ষদেশে বসে থাকার পর মন্দিরটাকে বারতিনেক চক্কর খেয়ে আবার অদৃশ্য। সারা শরীর ঘেমেনেয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমদিন আমি স্বপ্নটাকে পাত্তা দিইনি। দ্বিতীয় রাতে একই স্বপ্ন দেখার পরও আমি কাউকে কিছু বলিনি। কিন্তু মনে মনে এর মানে খুঁজতে থাকি। কিন্তু তৃতীয় রাতে আরো স্পষ্টভাবে একই স্বপ্ন দেখায় আমি পূজারীজীর কাছে যাই। তিনি নানা ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ ঘেঁটে একজায়গায় এর অর্থ খুঁজে পান। রাজর্ষি কাশ্যপমুণির মতে স্বপ্নদর্শনে সোনালি পাখি দেখা একটি ঈশ্বরের আদেশমাত্র। সেই আদেশ অনুযায়ী আমাকে এই মন্দিরের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। আর তিনবার পরিক্রমারও নাকি অর্থ রয়েছে।

প্রথম পরিক্রমা অনুসারে, আমাকে এখানে যজ্ঞ করাতে হবে। দ্বিতীয় পরিক্রমা অনুসারে, ঐ যজ্ঞের জ্যোতিকে দুনিয়ার কোণায় কোণায় নিয়ে যেতে হবে। আর তৃতীয় পরিক্রমা অনুসারে, যতদিন বেঁচে থাকব, এই মন্দিরের দেখাশোনা করতে হবে!

আমি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীজীকে এসব কথা বলায় ম্যাডাম মনোযোগ দিয়ে সব শোনেন। তিনি এই মন্দিরের মহত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমি প্রথমে এর ইতিহাস সম্পর্কে ম্যাডামকে অবহিত করি। সবাই বলে এই মন্দির নাকি মুমলের বীরাঙ্গনা ভগ্নী সুমলের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আসলে বৈদিক যুগ থেকেই এই মন্দির দেবতাদের বাসস্থান। যখনই দেবতারা স্বর্গ থেকে এই মরুপ্রদেশে আসতেন কিম্বা ফিরে যেতেন, পথে এখানে দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতেন। এখানে আগে যে শিবলিঙ্গটি ছিল সেটিকে বর্বর মুসলমান হানাদারেরা ভেঙে নিয়ে গিয়ে কোথাকার মসজিদের সিঁড়িতে লাগিয়ে দেয় যাতে প্রত্যেক মুসলমান সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় ঐ পাথরটিতে মাড়িয়ে যায়। এখানে ঐ শিবলিঙ্গটি স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব কেননা মরুযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে তিনি ও মা পার্বতী এখানে একবার রাত্রিবাস করেছিলেন। তখনই ওঁর পবিত্র বীর্যের কয়েকবিন্দু এই আরাবল্লী গাত্রে পড়েছিল। তখন স্বয়ং আরাবল্লীর অনুরোধে তিনি ময়দানবকে পাঠিয়ে এই মন্দির ও লিঙ্গ নির্মাণ করেন। এর প্রমাণ নাকি কোনো এক সংস্কৃত নাটকেই রয়েছে।

আমার ধারণা রাজনন্দিনী সুমলও আমার মতন স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মন্দিরটির পুনরুদ্ধার করেছিলেন। নতুন শিবলিঙ্গও তিনিই স্থাপন করিয়েছিলেন। যক্ষ, যক্ষিনী, গন্ধর্ব ও নানা দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে সাজিয়েছিলেন এই পবিত্র মন্দির। এখানে বারো বছর পর পর বিশাল যজ্ঞ হতো, সেই যজ্ঞের পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকত পরবর্তী দ্বাদশ বর্ষ। কিন্তু একশো বছর পেরনোর আগেই এই মন্দির আবার আওরঙ্গজেবের বর্বর সেনাবাহিনীর অত্যাচারে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।'

মাইকে এবার জল খাওয়ার শব্দ শোনা যায়। একবার জোরে শ্বাস নেওয়ার শব্দও শুনতে পায় নাসিম। তারপর আবার সেই দাম্ভিক উচ্চারণ.... ....

'মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং আশ্বাস দেন যে এই স্বপ্নাদেশ পালন করতে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন এবং শীঘ্রই আরেকবার আমার সঙ্গে বসে এর জন্য অর্থ সংগ্রহের যোজনা বানাবেন।

এবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আজ সকালে পূজারীজী ঠাকুরঘরে বসে চন্দন ঘষছিলেন তখনই তাঁর ছেলে এসে এই সাংঘাতিক খবর দেয়। এই পবিত্র মন্দিরপ্রাঙ্গনে একজন মুসলমানের নামাজ পড়া ও তারপর ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার কথা শুনে পূজারাজীর বুক কেঁপে ওঠে। তিনি চন্দন ঘষা থামিয়ে তক্ষুণি উত্তরীয় কাঁধে চড়িয়ে আমার কাছে চলে আসেন।

তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছি। আমি সমস্ত কাজ ছেড়ে ওঁর কথা শুনি, ঐ বীরবালকের উঠিয়ে আনার ঝোলাব্যাগটা দেখি। আমি জানি, আপনারা জানতে চাইবেন যে ঐ ঝোলাব্যাগে কী ছিল? সে কথাই আমি এখন বলবো, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। এই ব্যাগে আমাদের রাজ্যের নানা পুরাকীর্তি ও ধর্মস্থানের স্থাপত্যকর্ম নিয়ে লেখা একটি বই রয়েছে। এই বইয়ে রাজস্থানের সমস্ত প্রধান মন্দিরের প্রায় প্রত্যেকটি মূর্তির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও খোদাইকর্মের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া ঐ ঝোলাব্যাগে রয়েছে বেশ কিছু সাদা কাগজ, যাতে পেন্সিল দিয়ে কাকপ্রাসাদের নানা মহল ও কয়েকটা মন্দিরের ছবি আঁকা রয়েছে। একটা টর্চ, জলের বোতল, টিফিনকৌটো—যাতে এখনো দুটো রুটি রয়েছে। আর রয়েছে একটি তোয়ালে ও দুটো চাদর। কিছুদিন আগেই ডি.এম সাহেব আমাকে সতর্ক করেছিলেন। ওদের কাছে দিল্লি থেকে গোপন খবর এসেছে যে এই অঞ্চলের ধর্মস্থানগুলিতে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালানোর ষড়যন্ত্র চলছে। এসব দেখে আমি বুঝে গেলাম যে আজ এমনই একটা কিছু ঘটতে চলেছে। এই মন্দিরে লুকিয়ে থাকা যুবক এই ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

তারপর কী হলো আপনারা জানেন। পুরো অঞ্চলে খবরটা ছড়িয়ে যায়। আপনারা সবাই নিজের দরকারী কাজকর্ম ফেলে এখানে চলে এসেছেন। সশস্ত্র পুলিশ এসে মন্দিরটাকে ঘিরে ফেলেছে। জয়পুরে খবর চলে গেছে। সেখানে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলছে। দিল্লিতেও খবর পৌঁছুলো বলে।'

লোকটা আরেকবার দম নিয়ে একঢোঁক জল খেয়ে আবার তেড়েফুঁড়ে বলতে শুরু করে, 'এখন আমাদের সামনে সবচাইতে বড় প্রশ্ন ষড়যন্ত্রকারীরা এই মন্দিরটাকেই কেন বেছে নিয়েছে? আমার শান্ত এলাকাটাকেই কেন বেছে নিয়েছে? একটু ভাবুন, এই ধ্বংসাবশেষকে বেছে নেওয়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে! এর উত্তর আমি আপনাদেরকে দিই। এই ভাঙা শিবমন্দির কিম্বা এই ধ্বংসাবশেষকে আমরা যেভাবে ইতিহাসনির্ভর লোকগাথা মুমল-রাণোর অমর প্রেমকাহিনীর

লীলাস্থল লোদ্রভা বলে ভাবি, সীমান্তের ওপারের ভণ্ড ঐতিহাসিক ও কবিরা সেটা মানে না। আরাবল্লীর পশ্চিমকোলে একটি জনপদের নাম লুধানা। সেখানেও একটি ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই ভ্রমের মায়াজাল সৃষ্টি করে ওরা দেশবিদেশ থেকে আগত পর্যটকদের নিজেদের দিকে টানতে চায়। অথচ আমার দেখা স্বপ্ন কিম্বা মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডামের কথা সত্যি হলে এই তীর্থে যে পরিমাণ ভক্তজন ও পর্যটক সমাগম হবে তাকে কেন্দ্র করে আমাদের সংস্কৃতির নবজাগরণ হবে। এই নবজাগরণের বিজয়রথ এই অঞ্চলকে এক অনন্য হৃতগৌরব ও শক্তি প্রদান করবে।

কিন্তু আমাদের মুসলমান ভাই আর অন্য দেশগুলি তা চায় না। ওরা জানে যে এই মন্দির পুনর্নির্মিত হলে, আমাদের আভ্যন্তরীণ কুণ্ডলী ও সুপ্ত তেজ জেগে উঠে এমন বিরাট রূপ নেবে যে সমস্ত বিশ্ব আমাদের অধীন হয়ে পড়বে। ওরা সেটা বুঝতে পেরেছে। সেজন্যে সবার আগে ওরা এই ধ্বংসাবশেষকেই বেছে নিয়েছে। ওরা এমন কিছু করতে চায় যাতে এখানকার সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত হয় আর এই মহান সংকল্প অঙ্কুরেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেক্ষেত্রে সরকার বাধ্য হয়ে ধ্বংসাবশেষটিকে বিবাদাস্পদ ভাববে, অথবা কোর্টের ইঞ্জাংশান জারী হবে, আর আমরা কোনো নির্মাণকার্য শুরু করাতে পারবো না!'

লোকটা একবার থেমে আবার বলে—'আমি আপনাদেরকে ভরসা দিচ্ছি, আমি ও আমার দল প্রাণ থাকতে এমনটি কখনোই হতে দেব না! যতদিন আপনাদের শক্তি..উৎসাহ..সমর্থন আমার সঙ্গে রয়েছে, আমি ওদের এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেবো না! ঐ ঐশ্বরিক আদেশ, সোনালী পাখির মাধ্যমে পাওয়া স্বপ্নাদেশ অবশ্যই পুরো হবে। ঈশ্বর স্বয়ং যখন আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমরা কাকে ভয় করবো?'

আবার মাইক কিছুক্ষণ চুপচাপ। সমবেত মানুষজনের মধ্যে আবার একটা গুঞ্জন ওঠে। মাইকে আবার জল খাওয়ার শব্দ শোনা যায়। তারপরই সেই নেতা আবার বলেন,—'এখন আমাদের কী করা উচিত? আমরা জানিনা যে মন্দিরের ভেতর একটিই লোক, নাকি কয়েকজন রয়েছে! ওর কাছে কিম্বা ওদের কাছে কী ধরণের অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে? যদি একজনই হয় তাহলে সে ঠিক কী করতে চায়? তার পরিচয় কী? সে কোথা থেকে এসেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর আদায় করবে জেলা প্রশাসন। সেজন্যে সমবেত পুলিশ ও অন্য অফিসাররা রয়েছেন। এটা ওঁদের কাজ। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে গ্রীলের ফাঁক দিয়ে যাকে দেখা যাচ্ছে তাকে গ্রীলের ফাঁক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে না কেন?'

একটু দম নিয়ে লোকটা নাটকীয়ভাবে বলে—'সেটা প্রশাসন করতে পারে, যে কোনো মুহূর্তেই করতে পারে!'

নাসিমের পা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে। কোনোমতেই সে নিজের কাঁপুনি থামাতে পারে না। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে দাঁতি লেগে যেতে থাকে। সে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। সে এখন কী করবে? কেমন করে ওদেরকে বোঝাবে যে—

সমবেত জনতা জয়োল্লাসে ফেটে পড়ে। হাততালি দেয়। চেঁচিয়ে বলে—মেরে ফেলো, ওটাকে মেরে ফেলো!

ছয়

... যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো? সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমু খাবো

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শঙ্খ কাঁদো কাঁদো আওয়াজে বলে,—এখন পুলিশে খবর দেওয়া উচিত, তুমি বাবার ব্রিফকেস খুলে দেখো ল্যাটেস্ট কোন ফটো আছে কিনা, নাহলে পুরোনো ফটো হলে একটা দিতে হবে! আমি স্কুল থেকে ফেরা অব্দি যদি বাবা না ফেরে, ধরে নিতে হবে নির্ঘাত কোন বিপদ হয়েছে।

সুরতি ছেলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এইটুকু ছেলে, একেবারে বড়দের মতন কথা বলছে! গত চল্লিশঘন্টায় ও যেন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে! ঠ্যালার নাম বাবাজি! পরিস্থিতির চাপে, ঘাত প্রতিঘাতেই তো মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে ; মানুষ পরিণত হয়। সুরতিও নিজের অজান্তেই আগের থেকে অনেক বেশি শঙ্খের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছে! ওর প্রতিটি কথাই যেন সুরতির মনের কথা, শুধু উচ্চারণে ওর বাবার মতন গভীর আত্মপ্রত্যয় মূর্ত হয়ে ওঠে। এ যেন খুদে পরিতোষ, কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি মনের মতো ও আপন। গাঢ় নীল রঙের স্পোর্টসমডেল সাইকেলটা ওর বাবার একটা পুরোনো গেঞ্জির কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে সে আবার বলে ওঠে,—আচ্ছা মা, তুমি একটু বাবার ডাইরি টাইরি খুলে দেখতো—কোন সুরাগ পাও কি না!

'সুরাগ' শব্দটা আজকাল একটা টিভি সিরিয়্যালের দৌলতে খুবই প্রচলিত। কিন্তু এখন শঙ্খের মুখে ঐ শব্দটা শুনে সুরতির বুকটা কেমন ধ্বক্ করে ওঠে। ঐ শব্দটার সঙ্গে অপরাধ জগতের একটা মাখামাখি সম্পর্ক রয়েছে। না জানি কেন পরিতোষের বাড়ি না ফেরার সঙ্গে এই শব্দটা জড়াতে একদমই মন চাইছে না। তবু শঙ্খের পরামর্শ ওর কাছে অমোঘ মনে হয়।

তাই শঙ্খ সাইকেলে চেপে একবার হাত নেড়ে স্কুলের দিকে চলে গেলে সুরতি এসে পরিতোষের আলমারি খোলে। অন্যদিন এই সময়ে পরিতোষও বেরিয়ে যায়। সে সবসময় একঘন্টা আগে অফিসে পৌঁছোতে চেষ্টা করে। তাতে কখনো তার আগেই পৌঁছে যায় আবার কখনো ট্রেন ইত্যাদির গোলযোগ বা ট্রাফিক জ্যাম হলেও অফিস টাইমের মধ্যেই সেখানে পৌঁছোতে পারে। ওরা দুজন বেরিয়ে গেলে এরকম সময়ে সে আবার ঘুমুতে চলে যায়। এই সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে নটা দশটা অব্দি ওর একান্ত নিজস্ব আয়েশের সময়। একটা পাশপালিশ দুপায়ের নিচে দিয়ে অন্যটা বুকের কাছে রেখে কখনো চিৎ হয়ে আবার কখনো কাত হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া ওর ভীষণ প্রিয়। দশটা নাগাদ ঠিকে কাজের মহিলা আসে, বাসন মাজে, ঘর ঝাড়ু দেয়, ঘর মোছে। সে সময় ওকে উঠতেই হয়। তখন কাগজের বাকি খবরগুলি পড়ে। সে সময় দুধওয়ালাও আসে।

শুধু রবিবারে ও অন্য ছুটির দিনে পরিতোষ ও শঙ্খ বাড়ি থাকলেই যত ঝামেলা। সেদিন যেন সুরতির ঘুমই পুরো হতে চায় না। কেননা প্রতিদিনই টিভিতে লেট নাইট ফিল্ম দেখে ঘুমোনো অভ্যাস ওর। হোমওয়ার্কের চাপ না থাকলে শঙ্খ অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ে। এমনকি পরিতোষও। কালেভদ্রে কোন ফেভারিট সিনেমা থাকলে সে-ও অবশ্য দেখে। নিজের কোন লেখার কাজ থাকলে অবশ্য এই ঘরে এসে লেখে। কিন্তু অধিকাংশ দিনই ও ঘুমিয়ে পড়ে। 'আরলি টু বেড অ্যান্ড আরলি টু রাইজ... ..., জাতীয় নীতিকথা সুবিধামতন প্রয়োগ করে।

সুরতি একা বসে থাকে। সে কোন নীতিকথার ধার ধারে না। অনেক চেষ্টা করেও পরিতোষের পছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। তাহলে মনে হয় নিজের উপর জুলুম করা হচ্ছে। পরিতোষ পড়তে ভালোবাসে, লেখার টেবিলেও বুঁদ হয়ে থাকতে পারে, বিজ্ঞান, ভূগোল কিম্বা ইতিহাসের মতন অখাদ্য বিষয়েও ডুবে যেতে পারে। ওর বিনোদনের অনেক উৎস, আসল উৎস ওর মনের ভেতরে জেগে থাকা একটা অস্থিরতা, অপ্রাপ্তি, একটা নিরন্তর অনুসন্ধিৎসা। ঠিক একই কারণে এই সদাচঞ্চল মানুষটিকে মাঝেমধ্যে বিরক্তিকর মনে হয়। সুরতি প্রায়ই ওর বিনোদনের উৎসগুলি থেকে বিনোদিত হওয়ার তেমন কোন উপকরণ খুঁজে পায়নি। সেজন্যেই মানুষের জীবনে বিয়ের আগে প্রেম, আর পরস্পরের পছন্দ অপছন্দ জেনে নিয়ে তবেই পা বাড়ানো উচিত বলে মনে হয়। নাহলে ভাল না লাগা মনের গভীরে বিভিন্ন মুহূর্তের শবগুলি প্রবালের মতো তিলতিল করে জমতে জমতে একসময় এত বিশাল এবং জীবনময় ব্যাপ্ত প্রাচীর তৈরি হয় যে শুধু অপ্রেম মানুষের জীবনকে নিরর্থক করে তোলে। শুধু অপ্রেম! সুরতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গল্পের বই পড়তে সে-ও ভালবাসে। বিয়ের আগে গ্রামের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক উপন্যাস পড়েছে। শরৎচন্দ্র, বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, জরাসন্ধ, নিমাই, সঞ্জীব ও সুনীল ওর প্রিয় লেখক। বাকিরা বেশির ভাগই খটোমটো লেখেন, অবশ্য আরো অনেকের কিছু কিছু সহজ উপন্যাস সে পড়েছে কিন্তু ওদের নাম মনে থাকে না। বাড়িতে অবশ্য বই-এর কোন অভাব নেই। প্রায় সব লেখকের বই-ই রয়েছে। যোধপুর থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে আসার সময় পরিতোষের শুধু আটখানা বই-এর ট্রাঙ্কই ছিল। যোধপুরেও সুরতি অনেক উপন্যাস পড়েছে। পরিতোষের বন্ধু সুব্রত এয়ারফোর্সের 'করুণ পাঠাগার' থেকে এনে দিত। কিন্তু আজকাল টিভিতে এত সিরিয়্যাল থাকে যে বই পড়ার সময় পাওয়া যায় না। এগারোটা-সাড়ে এগারোটায় ও ছেলের ছাড়া গেঞ্জি জাঙ্গিয়া মোজা কিংবা রাতে পরা বারমুডা কেচে স্নান করে রান্না ঘরে ঢোকে। তখন থেকে একটা-দেড়টা অব্দি ওর ব্যস্ততম সময়। কোনকিছু উনুনে বসিয়ে খবরের কাগজও পড়ে অবশ্য। মাঝে দুবার চা বানিয়ে খায়। রান্না সেরে আবার স্নান করে, ঘর্মাক্ত ম্যাক্সি ধুয়ে দেয়। তারপর সামান্য প্রসাধন সারতে না সারতেই শঙ্খ চলে আসে। অন্য কোন অতিথি না থাকলে দুপুরের খাবারটা মা-বেটা টি. ভি. দেখতে দেখতেই খায়। তারপর শঙ্খ এই ঘরে এসে টেবিল চেয়ারে বসে হোমওয়ার্ক করে। বিকেলে প্রতিদিনই কোন না কোন

বিষয়ের প্রাইভেট টিউটর থাকে। সুরতি এই ঘরে শুয়ে শুয়ে টিভিতে কিছু বাংলা সিরিয়্যাল দেখতে দেখতে একসময় ঘুম এলে টি. ভি. বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে। কোন কোনদিন ভীষণ ক্লান্ত থাকলে শঙ্খও ওর পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়। আর একবার ঘুমোলে সে অচৈতন্যের মতন হয়ে পড়ে, হাজার ডাকলেও উঠতে চায় না, ডেকে ডেকে বিরক্ত হয়ে পড়ে। শঙ্খ সেটা বোঝে, তাই সে পারতে দুপুরে ঘুমোয় না।

পরিতোষের বেশিরভাগ ডাইরিতেই নানা মনীষীর কোটেশন আর কোটেশন। বাংলা হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা নানা কবির লেখা কিছু ভালোলাগা কবিতার লাইনও রয়েছে। গত বছরের ডাইরির পাতা উল্টাতে উল্টাতে একসময় একটা হেডিং দেখে চমকে ওঠে সুরতি। সাধারণত ডাইরির পাতায় কোন লেখার হেডিং আন্ডারলাইন করে না পরিতোষ। কিন্তু এই হেডিংটার নিচে লালকালিতে আন্ডারলাইন করে লেখা—'আমি খুন হতে পারি!' অবিশ্বাস্য! এরকম লাইন পরিতোষের হাতের লেখায় কল্পনাও করা যায় না। কোনরকম ঋণাত্মক কথাবার্তা ওর অভিধানের বাইরে। পরিতোষ কি তাহলে কোন নিগেটিভ গল্প লিখেছে? অথবা এটা নিছকই কোন ব্যঙ্গমাত্র। সুরতি চেয়ারে বসে টেবিলে ডাইরিটা রেখে অবাক বিস্ময়ে টানটান হয়ে পড়তে থাকে।

—এটাই বাস্তব। যে কোনদিন আমি খুন হতে পারি। যেকোন মুহূর্তে যে কোন ভাবেই আমি খুন হ'তে পারি। খুনের পদ্ধতি যাই হোক না কেন—আমি নিশ্চিত—আততায়ী আমাকে কোনভাবেই ছাড়বে না। এছাড়া তারও যে কোনই উপায় নেই! নাহলে তার অস্তিত্বও যে বিপন্ন হতে পারে। অন্তত এ মুহূর্তে আততায়ী এরকমই ভাবছে। এখন পুলিশবাবুরা জানতে চাইবেন (১) খুনের মোটিভ কী? (২) কে খুন করবে? (৩) কীভাবে করবে? (৪) খুন হওয়ার পর আমাকে দেখতে কেমন লাগবে? (৫) নানা পেশায় যুক্ত কয়েকজন ফটোগ্রাফার এর তোলা আমার মৃতদেহের কয়েকটি ছবির চুলচেরা বিশ্লেষণ।

এইসব প্রশ্নের জবাব আমিও বিস্তারিত জানিনা। ঠাহর করছি মাত্র। (১) মোটিভ ঃ অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন (ক) দারিদ্র্য + অর্ধশিক্ষা + অর্থলোভ (খ) পরকীয়া প্রেম + হতাশা + ভয় + রাজনৈতিক চাপ (গ) নিজে খুন হওয়ার ভয় + অসহায়তা + পেশাগত অসাফল্য (ঘ) উদ্দেশ্যহীন জীবন + শারীরিক অসুস্থতা + সামান্য মানসিক বৈকল্য যা কোনদিন যে কোন সময় প্রকট হয়ে উঠতে পারে (ঙ) ক + খ (চ) ক + খ + গ (ছ) ক + খ + গ + ঘ ইত্যাদি। এই সমস্ত মোটিভের মূলে যে ভদ্রমহিলা—তিনি আমার স্ত্রী। তিনি খুনিকে চেনেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন না যে আমি খুন হবো। তার চাইতে আমি আত্মহত্যা করলে কিংবা পাগল হয়ে গেলে তিনি অবাক হবেন না। কেননা বিয়ের আগে এক অপেশাদার জ্যোতিষী কুষ্ঠী বিচার করে বলেছিল, আমার একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে আর এই বিয়ের কারণেই নাকি আমার মৃত্যু হবে। সেজন্যে যে সমস্ত গ্রহরত্ন আর পাথর তিনি ধারণ করতে বলেছিলেন, আমার মা প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে ঋণ নিয়ে প্রায় বারোহাজার টাকা দিয়ে সেইসব কেনেন। আমার কোন ওজর আপত্তি ধোপে টেকেনা। মায়ের কান্নাকাটি ও আকুতি মিনতির কাছে হার মেনে আমি সেগুলি ধারণ করি। কিন্তু বিয়ের পর একদিন কোথায় কিভাবে সেগুলি

হারিয়ে ফেলি। এতদূর পড়ে কোন জ্যোতিষবিশ্বাসী পুলিশমশাই নিশ্চয়ই ভাবছেন যে আমার মধ্যে ভক্তি ও বিশ্বাসের ঘাটতি ছিল বলেই শনি, রাহু, কেতু ইত্যাদি গ্রহদেবতা বা অপদেবতার কোপে পড়েই আমার এমন দশা হয়েছে। আর যদি কোন যুক্তিবাদী পুলিশ এটা পড়েন, তাহলে নিশ্চয়ই উচ্চারণ করেছেন,—'বোগাস্'! কিম্বা 'রাবিশ!' ইত্যাদি কোন মোক্ষম শব্দ।

যাইহোক বছরখানেক পর যোধপুরে আমার কোয়ার্টারের পেছনে শখের চাষবাস করার জন্যে মাটি কোপাচ্ছিলাম। তখন আমার স্ত্রী সেগুলি খুঁজে পেয়ে আমাকে আবার মন্দিরে গিয়ে শোধন করিয়ে ধারণ করতে বলে। কিন্তু আমি যাইনি। তখন থেকে রত্নগুলি ওর গহনার বাক্সে রাখা থাকে এবং কয়েকমাস পর ছুটিতে নাগাঝাংকা গিয়ে সেগুলি সে মায়ের হাতে তুলে দেয়। এবার কিন্তু মা প্রত্যাশিত কান্নাকাটি করেনি। একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি। মাছের মতন তাকিয়ে চোয়াল শক্ত করে সেগুলিকে নিজের ঠাকুরের আসনে সাজিয়ে রেখে বিড়বিড় করে,—সবই আমার কপাল!

আমি বলি—ভাল হোক আর খারাপ হোক বিয়ে তো আমার হয়ে গেছে, সেটা তোমার গ্রহরত্ন আটকাতে পারেনি। মৃত্যুও আটকাতে পারবে না। তবে নিশ্চিত থেকো —আমি আত্মহত্যা করবো না! আমি জীবনকে ভালবাসি—এই পৃথিবীর বাতাস-মেঘ ও বৃষ্টিকে আমি ভালবাসি, যত শাকসব্জি আর ফল—আনারস-কাঠাল-কামরাঙ্গা-কলা আর সবচাইতে বেশি ভালবাসি নানা জাতের আম। ভালবাসি পাহাড় ও অরণ্য, পশুপাখি, পিঁপড়ে ও পাখির বাসা এবং মৌচাক আমাকে টানে। আমি ফুল ভালবাসি—বিশেষ করে সাদা ফুল, যত লাল ফুল আর চাঁপা। সাত ভাই চম্পা জাগোরে, জাগোরে ... ... গান আর গল্প ভালবাসি! গল্পের চরিত্র হয়ে পড়ি যখন তখন—

মা বলে,—সত্যি, গল্প পেলে তোর আর কিছু চাই না, ছোটবেলায় পরস্তাব বলেই তো তোকে ভাত খাওয়ানো যেত, কারো সাধ্য ছিল যে গল্প না বলে গলা দিয়ে একটা দানা গলায়!

একথা শুনে আমার স্ত্রীর ঠোঁট বাঁকানো আমার চোখ এড়ায় না। দৃষ্টিতে বিদ্রূপ। আমার রাগ হয়। মায়ের সারল্য ও অপত্যস্নেহকে ব্যঙ্গ করা আমার সহ্য হয় না। তবু চুপ করে থাকি। এই মহিলার মুখোশ খুলে দিলে মাকেই কষ্ট দেওয়া হবে। এতটুকু ইঙ্গিত পেলেই মা বুঝে যাবে তাঁর ছেলে কত সুখে আছে! তারপর মা মরে যাবে। বেঁচে থেকেও মরে যাবে। ছেলের অশান্তি ওঁর বুকে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকবে। ঠাকুরঘরে বসে বিলাপ করবে,—হা ঈশ্বর, এত টাকা খরচ করে গ্রহশান্তি করালাম, তার এই ফল, আমি কী পাপ করেছি ঠাকুর—ছেলেটা শান্তি পেল না! মা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। তারপর শুরু হবে আকুল কান্না—বাঁধভাঙ্গা অশ্রু গড়াবে দু-গাল বেয়ে। অজস্র মশা ছেঁকে ধরবে মাকে। শরীরের নানা জায়গা থেকে চাকা চাকা ফুলে উঠবে। রক্ত তো নেই শরীরে। লোহিককণিকার কাউন্ট পাঁচের কাছাকাছি। মশারা তাহলে মার শরীরে কি শোষে, ওরা কি লসিকা শুষে ফ্যাটফ্যাটে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে? লসিকা শুষলে ওদের ডিম পাড়তে দেরি হবে যে!

তারপরও প্রতিরাতে বিছানায় কাঁদবে মা,—খোকা রে বাবা আমার—কত কষ্ট করে—নিজে খেয়ে না খেয়ে. তোদেরকে মানুষ করেছি—এমনি সাতপাঁচ না ভেবে নিজের জীবনটাকে সর্বনাশের হাতে তুলে দিলি বাবা—আমাকে একবার খোঁজখবর নেওয়ারও সুযোগ দিলি না—এত শখের ছেলে তুই আমার—বুকের ধন—এমনি লানে বানে তোর জীবনটা নষ্ট হবে আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখবো বাবা! কী লাভ হল তোর এত লেখাপড়া শিখে—কী লাভ হল তোর এত গল্প পড়ে! স্কুলে পড়ার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার বইয়ের নিচে রেখে গল্পের বই পড়তে গিয়ে ধরা পড়ে কত মার খেয়েছিস তুই বাপের হাতে। আবার পরীক্ষার আগে রাতের পর রাত পড়েছিস, আমাকে জাগিয়ে পড়া ধরতে বলেছিস্! কিন্তু গল্প, গল্পই তোর জীবনে কাল হলো রে! বাস্তব আর গল্পের দুনিয়াকে তোর মতন আর কাউকে এত গুলিয়ে ফেলতে দেখিনি বাবা!

যাইহোক, মাকে আমি কিছুই বলিনি। যদিও এসব বিলাপ ও কান্নার দিন মায়ের ফুরিয়ে যায়নি। আমি না চাইলেও কোন আড়াল আবডাল থেকে অশান্তির হায়েনা হাসি মা দেখে ফেলে সেটাই আমার ভয়। সেদিনও তাই চেপে যাই। মাকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিইনি হায়েনার বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার হাসি। বরং মজা করেছি,—তোমার রাহু-কেতু-শনির বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম! যে জ্যোতিষবিদ্যায় সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর জায়গায় সপ্তম ও অষ্টম গ্রহ হল রাহু আর কেতু আর সূর্যকে নবম গ্রহ ধরে নিয়ে সমস্ত অঙ্কটঙ্ক কষে, তার ভবিষ্যৎবাণী যদি কারো জীবনে মিলেও যায়—সেটা কাকতালীয়!

রাহু, কেতু ও শনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনে মা প্রমাদ গোণে। তাঁর চোখে আতঙ্ক খেলা করে। আমার যুক্তি শুনে সেই আতঙ্ক কিছুটা স্তিমিত হলেও আশঙ্কায় থম মেরে থাকে। আমি এটা চাইনি। তাই মাকে জড়িয়ে ধরে বলি,—কেন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছো, এই মেয়েটাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব—আর তোমার নাতিকে বড় করতে হবে না? মানুষ করতে হবে না?

মা বলে,—ছাড় ছাড়—তোর ছেলেকে আদর করগে যা—

মা রান্নাঘরে চলে যায়। পান আর জর্দার গন্ধে ম ম করতে থাকে চারপাশ। মা ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই একজনের দৃষ্টি বলে,—'ঢঙ দেখে আর বাঁচি না!' আমি চুপ করে থাকি। এই অপমানও সহ্য করে নিই। প্রথমত বাংলা সিনেমার খলনায়িকাসুলভ এইসব ডায়লগ আমার নৈমিত্তিক জীবনে এক জ্বালাধরা সন্দর্ভ সৃষ্টি করে। ভদ্রঘরের ছেলে মেয়েদের মুখে কোন অশালীন শব্দ শুনলে আমি অবাক হই, আহতও হই। ভদ্রলোক কিম্বা মহিলার প্রতিপালন ও আন্তরিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা নিয়ে সন্দেহ জাগে—অবশেষে ঘেন্না করে। আমি আর ঐ মানুষটির সঙ্গে সহজ হতে পারি না। তার পেছনে কোন বাক্যব্যয় আমার রুচিতে বাধে।

আমার স্ত্রীর মুখে যখন তখন নানা অশালীন শব্দ। কথায় কথায় 'শালা' বলা তো ওর মুদ্রাদোষ। অন্য অশালীন শব্দগুলি তিনি প্রকাশ্যে বলেন না, জনান্তিকে বোন

ভগ্নীপতি আর আমার সামনে অবলীলায় বলেন। এতে ওঁর কোন অপরাধবোধ নেই। বরঞ্চ অশালীন রকবাজদের ভাষায় গল্প করে তিনি নিজেকে আধুনিক ভাবেন, শ্লাঘা অনুভব করেন। আর যখনই ঐসব শব্দ ব্যবহার করেন ওঁর চেহারায় একটা অকাট মূর্খ রূঢ়তা ফুটে ওঠে, চোখের দৃষ্টিও অন্য পাড়ার কুকুরকে তাড়িয়ে এসে লেজ নাড়তে থাকা বীরাঙ্গনার মতন জ্বলজ্বল করতে থাকে।

ওঁর নানা প্রকাশভঙ্গি আর তার সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত শব্দাবলী যা মাথা ঝাঁকিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসে সেগুলিও আমার প্রায় মুখস্থ। কিন্তু ঐ মুহূর্তে তা নিয়ে কিছু বললে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যেত। আর সেই যুদ্ধে কোন পক্ষ না হয়েও আমার মা লজ্জায়-অপমানে-ঘৃণায় মরমে মরে যেতেন। তাই চুপ করে জ্যান্ত ছুঁচো গিলতে বাধ্য হই। ভেতরটা দুর্গন্ধে ভরে যায়। ওয়াক-থুঃ! বিয়ের দু'বছর পর থেকে গত তেরো বছর ধরে প্রায় তেরো'শ ছুঁচো গিলেছি আমি!—ওয়াক ওয়াক, থুঃ থুঃ। সবসময় ঘেন্নায় গা গুলায়। বমি বমি পায়। ভালমতন খেতে পারি না আমি। তবু বেঁচে আছি দীর্ঘ—তেরো বছর—আশ্চর্য!

ছুঁচো খেয়ে খেয়ে আমার সারা গায়ে ছুঁচোর মতন লোম উঠেছে। সারা শরীরে দুর্গন্ধ। যতই সুগন্ধী সাবান লাগিয়ে স্নান করিনা কেন—গা থেকে সেই গন্ধ আর যায় না। মাঝে একবার ছয়মাসের জন্য শ্রীনগর জাদুঘরে ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ছুটিতে এসেছিলাম এক ব্যাগ ও এক স্যুটকেস ড্রাই র‍্যাশন নিয়ে—যেগুলি আমার খাওয়ার কথা ছিল—না খেয়ে খেয়ে জমিয়েছি। তখন সেখানে জে কে এল এফ এর রমরমা, প্রতিদিন কোথাও না কোথাও বোমা ফাটছে, আগুন লাগছে আর গুপ্তহত্যা আর কারফিউ। আতঙ্ক ও অশান্তিতে খাবার রুচত না। তখন শঙ্খের বয়স বছর তিনেক। সেই ছুটিতে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলনের পর তিনি বলেন,—তোমার শরীরের গন্ধ কেমন পাল্টে গেছে, কেমন কাজুবাদাম কিসমিস চকোলেটের মতন বাচ্চা বাচ্চা গন্ধ—ফুলশয্যার পরের রাতে তোমার গায়ে অনেকটা এরকম গন্ধ পেয়েছিলাম। কাশ্মীর থেকে ফিরে ওদেরকে পুরোনো কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিতে এলেও তিনি একইরকম গন্ধ পান। আমার অবাক লাগে, আমি কিন্তু একটা আঁশটে জৈবিক গন্ধ ছাড়া আর কোন গন্ধ পাই না। তবু শরীরের খিদে মেটাতে হাসিহাসি মুখ করে ওর দিকে তাকিয়ে আরেকবার শরীর পাওয়ার কথা ভাবি। নিজেরই স্ত্রী, তবু এ যেন পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা!

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটা কনফারেন্সে একা মাউন্ট আবু গিয়েছিলাম। সাধারণত এ ধরনের আউটিংএ আমার স্ত্রীও সঙ্গে যান। কিন্তু তখন ছেলের পরীক্ষা ছিল বলে তিনি যেতে পারেন নি। সেবারও ফেরার পর তিনি আমার গায়ে একই ধরনের গন্ধ পান। পরদিন বাথরুমে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করি—এটা কোন কাজুবাদাম কিসমিস কিংবা চকোলেটের গন্ধ নয়। এবার তো আমি এসব জিনিষ আনিনি, ছুঁয়েও দেখিনি। তাহলে? এটাই আমার একান্ত নিজস্ব গায়ের স্বাভাবিক গন্ধ। যা আমার স্ত্রীর সংসর্গে এসে পাল্টে যায়। কেননা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে আমার স্ত্রীর গায়ের গন্ধ পেয়ে ভাবি

তিনি বুঝি এইমাত্র বাথরুম থেকে শাড়ি নাইটি কিম্বা কোন অন্তর্বাস খুলে গেছেন। কিন্তু কই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অনুভব করি ওর গায়ের গন্ধ তখন আমার গা থেকে বেরুচ্ছে। আমার নিজস্ব গন্ধটা হারিয়ে গেছে। কী আর করি, আমি যে স্ত্রী বিষয়ে ভীষণ অব্যবস্থিতচিত্ত। যত রাগই হোক, কামকে একদমই জয় করতে পারি না। সামান্য যৌনতার হাতছানিও আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। অসহায়ের মতন পেছনের দুপায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে শ্রীমতী খ্যাঁকানির পেছন শুঁকতে থাকি—ছোঁক ছোঁক ছোঁক।

এই কয়েকমাস আগে আমার কাকা মারা গেলে কিছুদিনের জন্যে গিয়ে বাড়িতে ছিলাম। তখনও আমার ছেলের পরীক্ষা চলছে। এবারও ফিরে আসার পর সেই রাতে তিনি আমার গায়ে কাশ্মীর কাশ্মীর গন্ধ পান। তখন আমি সাহস করে আমার সেই অনেক বছর আগে অনুভব করা বাথরুম সন্দর্ভের কথা বলি।

তিনি বলেন,—হুঃ!

আমি বলি,—আরে তুমি ভুলে গেছ শ্রীনগর থেকে প্রথমবার আসার পর তুমি বলেছিলে ফুলশয্যার পরের রাতের মতন গন্ধ। আসলে এটাই আমার নিজস্ব গন্ধ। ফুলশয্যার রাতে তুমি বগলে বডিফ্রেশনার আর জামাকাপড়ে সেন্ট স্প্রে করে এসেছিলে আর আমি সেই রাতে জলে কোলন ঢেলে গা ধুয়ে এসেছিলাম। তাই সেরাতে পরস্পরের গায়ের গন্ধ টের পাওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু পরের রাতেই প্রথম একে অন্যের গায়ের গন্ধ টের পাই। তখন অবশ্য গন্ধ নিয়ে কোন চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। তখন তো শুধু নানাভাবে মিলন আর অন্বেষণ। সেরাতে এবং পরবর্তী আরো অনেক রাতে যৌন আবেগে সব গন্ধ কখন নীল আলোতে বিলীন হয়ে যেত আর সেই আলো শরীরের রোমকূপ ভেদ করে আবার রক্তে মিশে গিয়ে আমাদেরকে মাতাল করে রাখতো।

তখন আমার হাতে পায়ে মানুষের মতন লোম ছিল। মাথার চুল, বগল আর শ্রোণীদেশ ছাড়া আর কোথাও তেমন লোমের আধিক্য ছিল না। সেজন্যে আমার স্ত্রীর ভীষণ আক্ষেপ ছিল। তিনি বলতেন,—তোমার মায়াদয়া কম! প্রশস্ত বুকভরা লোম থাকলে, সারা শরীরে লোম থাকলে তবেই পুরুষ মানুষ উদার হয়, তাঁর দয়ামায়া থাকে!

আমি রাগ চেপে হেসে বলতাম, তাহলে কোন জাম্বুবান কিংবা ওরাং ওটাংকে বিয়ে করতে!

একথা শুনে আমার স্ত্রী হা-হা-হা করে হেসে উঠতেন। তারপর প্রতীক্ষা করতাম, ও হয়তো কখনো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলবে,—সরি, তুমি রাগ করলে, সত্যি বলছি তুমি কষ্ট পাবে জানলে বলতাম না!

কিন্তু সে গুড়ে বালি, আমি কি ভাবলাম না ভাবলাম তাতে ওর বয়েই গেল কোনদিনই আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই ওর! তিনি তখন জাম্বুবান কিম্বা ওরাং ওটাংকে বিয়ে করতে বলার আমোদে বিভোর। আর আমি তখন তার প্রেমে হাবুডুবু, 'ফু' উচ্চারণ করলে আমি ফুলের বাগান উপড়ে আনার জন্যে তৈরি আর 'দ' উচ্চারণ করলে তক্ষুণি দিগন্তরেখা ছুঁয়ে ওকে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে উড়ে যেতে রাজি। কিন্তু তিনি একদমই

আবেগে ভাসেন না, তিনি ভীষণ বাস্তববাদী। আমার তথাকথিত আদেখলেপনা কিংবা ঢঙ দেখে তিনি বিরক্ত বোধ করেন। ওঁর দিদিকে বলেন,—এমন কল্পনাবিলাসী মানুষকে নিয়ে কি সংসার করা যায়? রাখ তোর প্রেম!

তিনি গর্ভবতী হলে প্যাসিভ স্মোকিং এ গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতির আশঙ্কায় ঘরে সিগারেট খাওয়া ছাড়লাম। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রস্তুত ডায়েটলিস্ট অনুযায়ী বাজার থেকে প্রোটিন-ভিটামিন-আয়রণ-ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ সব ফলমূল খাবার আনতাম। জোর করে সেসব খাওয়াতাম। ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাঁচা নিজেই করতাম। কিন্তু জোর করে ওকে দিয়ে নিয়মিত ঘর মোছাতাম। নিয়মিত ঘর মুছলে নাকি ডেলিভারির সময় কোন কষ্ট হয় না। আর প্রতিরাতে খাওয়ার পর ওকে নিয়ে যোধপুর এয়ারপোর্ট অব্দি হাঁটতে বেরুতাম। হাঁটাও নাকি গর্ভবতীর পক্ষে জরুরি। এসব নিয়ে ওর কোন আপত্তিকে আমি আমল দিই নি। সেইসময়, হ্যাঁ শুধু সেই সময় তিনি বাধ্য স্ত্রীর মতন আমার কথামতন চলেছেন। সেই সময় কোনোদিন আমাদের মাঝে কোন ওরাং ওটাং কিংবা জাম্বুমান প্রসঙ্গ আসেনি।

আমার ছেলের জন্মের পর প্রথম বছরটা আমাদের দাম্পত্যজীবন আর দশটা দম্পতির তুলনায় কম সুখের নয়। ওরাং ওটাং তো দূরের কথা ওর এক জামাইবাবু একটা লোমশ পুতুল উপহার দিলে আমার স্ত্রী সেটাকে ট্রাংকবন্দী করে রাখেন। তিনি মুখে না বললেও আমি বুঝি নিজের সন্তানকে আমার মতন করে তুলতে চান তিনি। আমি কি সত্যিই ব্যক্তিত্বময়? যাইহোক, একটা ছোট্ট শিশুকে তিলতিল করে বড় হতে দেখা, ওর হাসি, ওর কান্না, গানের ক্যাসেট চালিয়ে কান্না থামানো, ওর মাতৃদুগ্ধপান, আমার স্ত্রী-দুগ্ধ পান, ওর উপুড় হওয়া, দাঁত ওঠা, ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিতে শেখা, প্রথম মা-ম্মা—বা-ব্বা ডাক, প্যারামবুলেটরে বসিয়ে রোজ বিকেলে এয়ারপোর্ট রোডে কিম্বা কোনদিন রত্নাডার দিকে ঘুরতে বেরুনো, আইসক্রীম, মিরচিবড়া, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেস্তোরায় ঢুকে ইডলি ধোসা সাম্বার খাওয়া, ওর অন্নপ্রাশনে আমাদের বাড়িতে বিয়ের মতন উৎসব, ওর ওয়াকার ধরে ধরে হাঁটতে শেখা—হাঁটা শিখতেই পুঁচ পুঁচ শব্দ করা জুতো কিনে এনে দিলে ঘরময় পুঁচ পুঁচ পুঁচ পুঁচ - বা ব্বা - পুঁচ পুঁচ - মা ম্মা—চা-বাগানের ইটসোলিং পথে পুঁচ পুঁচ —আমাদের দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এরকমই আনন্দঘন ছিল। সেসব দিনের স্মৃতি আর সন্তানের বড় হয়ে ওঠা ঘিরে আজও আমরা একসঙ্গে আছি।

তারপর বিয়ের দুবছর পর যে বিকেলে প্রথম আমি ছুঁচো গিললাম, গিলতে বাধ্য হলাম – সেই থেকে আমার গায়ের গন্ধ একদমই পাল্টে গেল। তারপর থেকেই আমার গায়ে লোমের ঘনত্ব বাড়তে লাগলো। আমার কানে লম্বা লম্বা লোম গজালো—আমি এক মনুষ্যেতর পুরুষে পরিণত হলাম। পুরুষ, নাকি ক্লীব। শুধু যৌন জনন করতে সক্ষম, সন্তান প্রজনন করতে সক্ষম কোন মানুষকে যদি পুরুষ বলা হয় তাহলে আমি পুরুষ, সেজন্যেই আজও আমার শৌর্য-ব্যক্তিত্ব সব বাহ্যিক অভ্যাসের মতন অন্যদের চোখে স্বাভাবিকই ঠেকে। সেরকমই যাতে ঠেকে সেই চেষ্টাও বজায় থাকে সবসময়। অভিনয়,

আরোপিত কথাবার্তা, আরোপিত প্রেম, যৌনসঙ্গমও—যেরকম অসংখ্য পুরুষ মাঝেমধ্যে বেপাড়ায় গিয়ে শরীর হাল্কা করে। আমার যুক্তি, তাঁরা সেখানে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করে—আমার স্ত্রীর পেছনে তার দশগুণ অর্থব্যয় করি। কাজেই শত অপ্রেমেও যৌনসঙ্গম আমি করবোই। তবে ইচ্ছে থাকলেও প্রায়ই সম্ভব হয় না। প্রায়ই ওর নানারকম শারীরিক অসুবিধা ও অনিচ্ছা থাকে। প্রায়ই রাতে ভরপেটে হাসফাস করে—বয়েস তো আর কম হলো না—প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। আর কাকভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বিরক্তিকর সব উস্টুংপুস্টুং ওঁর একদমই পছন্দ নয়। অগত্যা আত্মরতি।

লক্ষ্য করেছি, আত্মরতিতেও আজকাল আমি আর ওকে কামনা করি না। তাহলে কাকে করি। সে কথাটা নাহয় না-ই লিখলাম। কারো কথা বা কারো নামই এখানে উল্লেখ করতে চাই না, এমনকি যিনি আমার জীবনকে পুতিগন্ধময় করে তুলেছেন এবং অজান্তেই পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন এক গুপ্ত ঘাতককে—এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি যে তিনি কে? আমার অবর্তমানে গুপ্তঘাতকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আবিষ্কৃত হলে ওর চাইতেও বেশি বিপদে পড়বে আমার সন্তান। চারপাশের মানুষজন যদি মায়ের দিকে আঙুল তোলে তাহলে ছেলেটা বাঁচবে কাকে নিয়ে?

তাই আমাকে হত্যার মোটিভ আবিষ্কারের ভার যে তদন্তকারীর উপর বর্তাবে তাকে বা তাদেরকে আমার বিনীত অনুরোধ,—প্রয়োজন নেই কোন মোটিভ আবিষ্কার। আপনি বা আপনারা আমার সন্তানের প্রতি দয়াপরবশ হোন। শুধু (২) খুনী কে? (৩) খুনের পদ্ধতি কী? (৪) খুনের পর আমাকে দেখতে কেমন লাগছে, মানুষের মতন নাকি একটা বিশাল ছুঁচোর মতন (৫) নানা পেশায় যুক্ত ফটোগ্রাফারদের তোলা আমার মৃতদেহের কয়েকটি ছবির বিশ্লেষণ করে খুনিকে ধরতে পারলে ধরে ফেলুন।

কিন্তু কখনোই এমনভাবে কেস লিখবেন না যাতে আমার সন্তান ও তার মা বিপদে পড়ে।

এই লেখা পড়ে সুরতির চোখ কপালে ওঠে। এসব কী লিখে গেছে পরিতোষ? পুরো লেখাটায় মা বা অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'তুমি' 'সে' ইত্যাদি সম্বোধন ও সেই অনুযায়ী ক্রিয়ার ব্যবহার করলেও 'স্ত্রী' শব্দটার আগে পেছনে 'তিনি' জাতীয় সম্বোধন ও তদনুযায়ী ক্রিয়ার ব্যবহার করেছে। এসবের মানে কী? এটি কি ওর কোন সাহিত্যকৃতি? এরকম ঋণাত্মক কথাবার্তা পরিতোষের কোন লেখায় দেখেনি সুরতি। লেখাটিতে কোথাও সুরতি কিম্বা শঙ্খের নাম উল্লেখ করেনি। কিন্তু ওর নিজের নাম রয়েছে। সাহিত্যকৃতি হলে নিজের নাম থাকবে কেন? সুরতির হাত পা থরথর করে কাঁপে, সত্যি সত্যি এরকম কিছু ঘটে থাকলে পুলিশ কি এই লেখাটি নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দেবে? নাকি এটাকেও একটা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পেশ করবে? পরিতোষের অনুভূতিগুলি বাদ দিলে এই লেখার ঘটনাপ্রবাহ যে ওদের দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়! শঙ্খ এই লেখাটি পড়লে কী ভাববে?

কোথায় গেছে পরিতোষ? সে তো ছেলেকে না দেখে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

তাহলে ফিরছে না কেন। সুরতির চিন্তা হয়। ইদানীং লোকটা হাইপারটেনশানের পেশেন্ট। এজন্যে একটা পাপবোধ ওর মধ্যে কাজ করে। নাহলে চল্লিশ ছোঁয়ার আগেই ওর হাইপারটেনশান হওয়ার কথা ছিল না। সেদিন চেকআপ করাতে গিয়ে হাসপাতালের গেটেই মাথা ঘুরিয়ে পড়েছিল। এখন নিয়মিত প্রেশারের ঔষধ খেতে হচ্ছে। পরশু সকালে খেয়েছিল কি? ঔষধগুলি তো সব ট্রে-তেই রাখা হয়েছে। সেদিনের মতন কোথাও মাথা ঘুরিয়ে পড়েনি তো? এইসব লিখে গেছে কেন? নাকি এগুলি আগেই লিখেছে? সে বেঁচে আছে তো? সুরতির বুকের ভেতরটা কেমন করে। সে কি এই লেখাটি ছিঁড়ে ফেলবে? অথবা ডাইরিটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে? কিন্তু তারপরই যদি পরিতোষ ফিরে আসে? অথবা পোড়ানোর সময় সে কিম্বা শঙ্খ চলে আসে। কী জবাব দেবে সুরতি? পরিতোষকে সত্যি সত্যি কেউ খুন করে ফেলেছে নাকি? তাহলে কী হবে? সুরতি এখন কী করবে? ওর হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যেতে চায়! তখনই সে ডাইরির দুই শাদা পাতার মাঝে একটা শুকনো চ্যাপ্টা চাঁপাফুল দেখতে পায়। কে দিয়েছে এই ফুল? সুরতি কি তাকে চেনে? পরিতোষ কি তাকেই আত্মরতিতে কামনা করে? সুরতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে,—সত্যি, একই ছাদের নীচে থেকেও দুজন মানুষের মধ্যে কত সহস্র যোজন দূরত্ব তৈরি হতে পারে। আজ এই মুহূর্তে সেই দূরত্ব আরো বেড়ে গেছে না চিরতরে মুছে গেছে তা ঠাহর করতে পারে না সুরতি। শুধু টের পায় পায়ের তলায় মেঝে সামান্য দুলছে, দুলছে কামরার আসবাবপত্র ও দেওয়ালগুলি। ভূমিকম্প এল নাকি? আসুক! প্রলয় নেমে আসুক পৃথিবীতে। সুরতি এখানেই বসে থাকবে। একচুলও নড়বে না আর। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে ডাইরির পরের পৃষ্ঠাগুলি পড়ার কথা ভাবে।

সাত

ওপারে দুটো ঠোঁট অনবরত নড়ছে। জিভ উঠছে, নামছে,
বেঁকে যাচ্ছে।
স্পষ্ট হয়ে উঠছে হাজার হাজার প্রশ্ন, ভেসে যাওয়া এই অকূলে।
ভেসে যাওয়াগুলো, একটা দুটো করে ডুবে যাবে দেখার বাইরে।
ভেতরে ক্রমশ জ্বলে উঠছে আলো।

এই সাক্ষাৎকার বহুদিন আগেই নির্ধারিত ছিল

—পল্লব ভট্টাচার্য

মাইক বলে,—'আপনারা ধৈর্য ধরুন। শান্ত হোন। ওকে এক্ষুণি মেরে ফেললে দুটো বিপদ হতে পারে। প্রথমত, সে যদি একা হয় আর মরে যায় তাহলে সমস্ত রহস্যই ওর সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। আমরা জানতেই পারবো না কে বা কারা ওর পেছনে রয়েছে। ওদের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি? দ্বিতীয়ত, মন্দিরের ভেতর ওর মৃত্যু হলে এক অপবিত্র মুসলমানের রক্তে আমাদের মন্দির

অশুচি হয়ে পড়বে! পুলিশ দরজা ভেঙেও ভেতরে ঢুকতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ঐ দুটি বিপদ থেকে যায়, সে নিজেকে গুলি করে শেষ করে দিতে পারে! আমরা সেটা চাই না! সেজন্যে উত্তেজিত না হয়ে আমাদের উচিত প্রশাসনের উপর ভরসা রাখা, সহযোগিতা করা; আমরা যেন ধৈর্য না হারাই। সেজন্যে আমরা সবাই মন্দিরের চৌহদ্দির বাইরে থাকবো, কেউ কাছে যাবো না। এখানে বসেই ঈশ্বরকে স্মরণ করব, যতক্ষণ অব্দি এই অপবিত্রের আতঙ্ক থেকে এই মন্দিরটি মুক্ত না হয় আমরা এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণের জন্যে নিজেদের একতা সংকল্প ও সদ্‌ভাবনা প্রকাশ করবো,—নিজেদের ভয়হীনতা প্রদর্শন করব। পূজারীজীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন নিজে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দেখাশোনা করেন। আর ভুলে যাওয়ার আগে আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি পূজারীজীর বীর সন্তানটিকে অভিনন্দন জানাতে চাই. সে আজ ভক্ত প্রহ্লাদ কিম্বা ধ্রুবের মতই ভক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন মানুষ ওকে মনে রাখবে!

আবার কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। মাইকে আবার একঢোঁক জল খাওয়ার শব্দ। তারপরই লোকটি আবার বলে—'অবশেষে আমি মন্দিরে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই, আমি জানি যে আপনি বা আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন। তেমনি এ দেশ ও বিদেশে আপনাদের ধর্মের বহু মানুষ টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে আমাব বক্তব্য শুনছেন। আজ থেকে ষাট বছর আগে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের থেকে আলাদা হতে চেয়েছিলেন, আর সাতান্ন বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেবা মন থেকে না-চাইলেও আপনাদেরকে আলাদা রাষ্ট্র দিয়ে দুর্গন্ধী পোকার মত আলাদা করে দিয়েছিলেন। ওঁরা মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান দিয়ে হিন্দুদের জন্যে শান্তিপূর্ণ হিন্দুভারত চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই তখন এদেশ ছেড়ে যেতে চাননি। আর আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ ও দেশের নেতারা তাদেরকে এদেশে থাকতে দেওয়ার মতো ক্ষমাহীন অপরাধ করেছিল। একজন দুজন নয়, প্রায় সাড়ে চার কোটি মুসলমান তখন এদেশে রয়ে গেল। সে সময় ওরা সবাই যদি চলে যেত, লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ যেমন নিজেদের ঘরবাড়ি সম্পত্তি ছেড়ে চলে এসেছিল, লক্ষ লক্ষ মুসলমান যেমন পাকিস্তান চলে গিয়েছিল; এতদিনে আমরা দুনিয়ার সামনে বিশাল হিন্দু সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম। আপনাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতাম। কিন্তু তা হয়নি। আমরা তা-ও মেনে নিয়েছি, আবার আপনাদেরকে আমাদের জল-মাটি-হাওয়া, উদার আইন ও সংবিধানে সমান অধিকার দিয়েছি। না-জানি কেন তবু আপনারা আমাদের বিনাশ চান! এ কেমন বেইমানি, এ কেমন নেমকহারামি? আমরা কেন তা ববদাস্ত করছি? আমাদের উদারতা, সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যকে দুর্বলতা ভাবা ঠিক নয। মন্দিরে আত্মগোপনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রতি আমার আবেদন, আপনি বা আপনারা শান্তভাবে দরজা খুলে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করুন। আমি আপনাদের সাময়িক সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তারপর প্রশাসন যা বাবস্থা নেওয়ার নেবে!

সমবেত জনতাকে আবার অনুরোধ করছি, আপনারা শান্তিতে বসে ঈশ্বরের নাম নিন আর সংকল্প করুন—যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রাচীন মন্দিরের পবিত্রতা সুরক্ষিত না হবে ততক্ষণ আপনারা এখান থেকে যাবেন না! আমি আপনাদেরকে যথাসময়ে সঠিক খবর দিয়ে যাব।'

লোকটার প্রতিটি কথা অগ্নিশলাকার মত কানে ঢুকছে। নাসিম দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবে। কিন্তু তখনই বাইরে হিংস্র জনতার জয়োল্লাস শোনা যায়। ভিড়ের দৌড়ঝাঁপ, পুলিশের

সিটির শব্দ আর অন্যদিকে মাইকে দ্রুতলয়ে কীর্তনের অভিঘাত ওকে ঘাবড়ে দেয়। এই ঘাবড়ে যাওয়ার অন্য নামই কি মৃত্যু? ওর মাথা কাজ করে না। কিছুই ভাবতে পারছে না। অভিরাম মামার কথা মনে পড়ে। ১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরার মান্দাই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এক প্রবল আত্মঘাতী আদিবাসী বাঙালী দাঙ্গা হয়েছিল। সেইসময় ওর মামা অভিরাম দেববর্মা দাঙ্গাবাজদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে কোনোমতে মসজিদ পট্টিতে এসে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। সারা বিকেল ওদের চালের ড্রামের পেছনে লুকিয়ে ছিল। তার সেই ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা দেখে বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। দাঙ্গাবাজরা তখন হয়তো মসজিদপট্টিতে ঢুকে নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায়নি, অথবা অভিরাম মামা যে সন্ধ্যার আঁধারে এদিক দিয়ে ঢুকেছে সেটাই টের পায়নি। কিন্তু ওরা সবাই ভীষণ ভয় পেয়েছিল। এই মানবসমাজে যে কোনোরকম সংখ্যালঘু হয়ে বাঁচা যে কী কষ্টের তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। অভিরাম মামা ওর সবচাইতে প্রিয় মামা। মায়ের সব থেকে ছোটভাই। নাসিমের মা মুসলমান ছেলের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিল বলে সারাজীবন বাপের বাড়ির কেউ তেমন যোগাযোগ রাখেনি। শুধু মায়ের ছোট দশরথ মামা আর এই অভিরাম মামা লুকিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে কাঁঠাল, আম, আনার, জাম্বুরা ও গোদকের সরঞ্জাম ইত্যাদি দিয়ে যেত। দশরথ মামা দারুণ বাঁশি বাজাতো, বাঁশের বাঁশি, আর অভিরাম মামা শোনাতো গল্প—অনেক অনেক গল্প। সেসব গল্প শুনেই নাসিম-রা বড়ো হয়েছে। অভিরাম মামাই ওকে অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা', 'রাজকাহিনী', বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' এনে দিয়েছিল। তিনি নাসিমের ছেলেদেরও প্রিয় দাদু। এবারও ওদের জন্মদিনে 'কেরেঙকথমা' উপহার দিয়েছে।

সেদিন অভিরাম মামা কেমন কাটা ছাগলের মতন ঠকঠক করে কাঁপছিল। নাসিমও অজান্তে এমনি কাঁপছে এখন। কোনোমতেই কাঁপুনি থামাতে পারছে না। কেন এমন হচ্ছে? সে যেন ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকা একদল আদিম শিকারীর ফাঁদে পড়া একটি বন্য জন্তু। আদিম শিকারীরা হিংস্র চিৎকার ও উল্লাসে ওর দিকে অস্ত্র তাক করে এগিয়ে আসছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে হয়তো একজন কিম্বা দু'জন শিকারীকে ঘায়েল করতে পারে। কিন্তু বাঁচতে পারবে না। মৃত্যু নিশ্চিত।

আচ্ছা, যুগলজী কিংবা পরিতোষ কি ওর এই বিপদের কথা এখনও জানতে পারেনি? মাইকে তো বলছে যে টিভির লোকজনও এসেছে। তাহলে? নাসিমের ঠোঁট দুটি জ্বলছে। সে জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করে। জিহ্বাও শুকনো প্রায়। এখন কী করা উচিত? মাথা কাজ করছে না। অভিরাম মামার লুকিয়ে থাকা সন্ধ্যা ও রাতে ওর আশেপাশে ওরা সবাই ছিল। কিন্তু আজ নাসিম একা। মায়ের কথা, সন্তানদের কথা, স্ত্রীর মুখ মনে পড়ছে বারবার। ওরা দরজা ভেঙে ঢুকলে নাসিম কী করবে? ঐ নেতার বক্তৃতার কথাগুলি কানে বাজে। পি-স্ত-ল! হ্যাঁ পিস্তল, সে কী বলবে যে ওর কাছে পিস্তল আছে! এই মিথ্যা বলে কোনো লাভ হবে কি?

একবার এই কথা বলার পর ধরা পড়লে কী হবে? সমস্ত মুক্তির রাস্তা তো এই মিথ্যের সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আগামী কয়েকঘন্টা শুধু এই মিথ্যেই ওকে বাঁচাতে পারে। একবারও যদি ওরা নিশ্চিত হয় যে ওর কাছে কোনো অস্ত্র নেই তাহলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা ভেঙে ফেলবে। দু-চারটে লাথি মারলেই এই দরজা ভেঙে পড়বে। তারপর? ওরা জানবে না যে নামাজ আর চৌদ্দদেবতা পুজো দুটোই ওদের বাড়িতে নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। বাবা কখনো মাকে ধর্মান্তরিত করেন নি। বাবার হাত ধরেই ওরা দুর্গাপূজা বা চৌদ্দদেবতার বাড়িতে খারচি উৎসবে যেত। কের,

সরস্বতী ও বিশ্বকর্মা পুজোর সময় অভিরাম কিম্বা দশরথ মামার হাত ধরে ঘুরে বেড়াত সারা শহর।

যে কোনো ভাবেই হোক নাসিমকে নিজের সত্য জানাতে হবে। পরিতোষ কিম্বা যুগলজী এখানে এসে গেলেই একমাত্র সেটা সম্ভব। ততক্ষণ অব্দি এই মিথ্যাই হয়তো ওকে আরও কিছুক্ষণ শ্বাস নেওয়ার সময় দিতে পারে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। হয়তো কোনো সুযোগ আসবে যখন সে সত্যি বলতে পারবে। ভিড়ের হাতে থেঁতলে যাওয়ার চাইতে পুলিশের হাতে ধরা পড়া অনেক ভাল। কিন্তু নাসিম নিশ্চিত, এখন এই উন্মত্ত জনতার হাত থেকে পুলিশও ওকে বাঁচাতে পারবে না। আর পুলিশেও তো এদেরই মতন সাধারণ মানুষেরই সংখ্যাধিক্য। ওঁরাও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ঐ নেতার বক্তৃতা শুনছে আর ওকে সাংঘাতিক কোনো সন্ত্রাসবাদী ভাবছে। ওর ভীষণ মাথাব্যথা করছে। কপালের দু'পাশের রগদুটি বুঝি ছিঁড়ে যাবে। সে দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে। চোখ বন্ধ করে।

তখনই বাইরে চকলেট বোম ফোটার মতন শব্দ হয়। পাখিরা সশব্দে ডানা ঝাপটে আকাশে ওড়ে। নাকি নাটমণ্ডপে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ? বাইরে রোদের তেজ বাড়ছে। বাতাসের সঙ্গে সেই উত্তাপ পাথরের গ্রীল গলে ভেতরে আসছে। নাসিম চোখ কচলায়। তখন বাইরে আবার বাজী ফাটানোর শব্দ। সে নাটমণ্ডপের দরজার ফাটল দিয়ে তাকায়। কেউ শূন্যে গুলি চালাচ্ছে কি? মাইকের কীর্তন ও জপমন্ত্রের উচ্চারণ ছাপিয়ে এই গুলির আওয়াজ ওর মনে আরো ভীতির সঞ্চার করে। বাইরে অনেকের হাতে গেরুয়া পতাকা, অনেক লাঠি ও ত্রিশূল। অনেকের মাথায় গেরুয়া কিম্বা লাল কাপড় বাঁধা। তখন আরেকটা পুলিশের জীপ এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ সমস্ত কোলাহল ও কীর্তন থেমে যায়। নিঝুম নিস্তব্ধতা। একটা কাক বিচ্ছিরিভাবে কাঁও-কাঁও করে ডাকতে শুরু করে। নাসিম ভীত পশুর মতন কানখাড়া করে, বাতাসে সম্ভাব্য মৃত্যুর গন্ধ শোঁকে।

কিছুক্ষণ পরই আবার মৃদু কোলাহল শুরু হয়ে যায়। নাটমণ্ডপের গ্রীলে কারো ছায়া দেখা যায়। নাসিম সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর হিন্দিতে বলে—শুনো! আমি মসজিদের ইমাম..........কাছে এসো!

লোকটির কণ্ঠস্বর আতঙ্কমাখা। নাসিমের মনে পড়ে সকালে সে আজানের শব্দ শুনে নামাজ পড়েছিলো। ইমাম বলে—ভয় পেয়ো না,—আমি একা এসেছি—কাছে এসো! লোকটা কেন এসেছে? নাসিমের ইচ্ছে করে লোকটাকে কোনো পাত্তা না দিয়ে আবার গিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকে পড়বে। আবার ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে কোনো জংলী জন্তুর মতন গর্জন করতে করতে এ... ব। কিন্তু সে একপা একপা করে এগিয়ে যায়। গ্রীলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটাকে ভালমতন দেখতে পায়। মাথায় ফেজ টুপি। গালের দাড়িতে মেহেন্দি করা। চোখ কোটরে। গায়ের রঙ ঝলসানো কালো। দুর্বল, হাড্ডিসার মানুষ। চোখের কোণে পিঁচুটি, গলায় কালো তাগায় ঝোলানো বেশ কিছু তাবিজ। ইমাম বলে—আমাকে ওরা পাঠিয়েছে—তোমাকে বোঝানোর জন্যে, কিন্তু তার আগে আমি কিছু বলতে চাই—'

লোকটার গলার আওয়াজ বুজে যায়। সে একবার ঢোঁক গিলে বলে—আমরা সকাল থেকে নিজের বস্তিতে গৃহবন্দী। তুমি কিছু করলে সবার আগে মারা পড়বো আমরা। ওরা এখন এই দরজা

ভাঙবে না। যতক্ষণ এস.পি সাহেব শহর থেকে না আসেন, ততক্ষণ ভাঙবে না। কিন্তু এরা যদি দরজা ভাঙেও, আমার অনুরোধ, এই সীমান্তবর্তী গ্রামের সমস্ত মুসলমানদের অনুরোধ, তুমি নিজেকে গুলি করে মেরো না! অন্তত এই মন্দিরের ভেতরে কিছু কোরো না, তাহলে ওরা আমাদের বস্তি জ্বালিয়ে দেবে, আমাদেরকে কচুকাটা করবে। অযোধ্যায় মসজিদ ভাঙার পর ওরা একবার আমাদের বস্তি জ্বালিয়েছে, অনেক যুবককে মেরে ফেলেছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে! এখন ওদের মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার অছিলা পেলে আমাদের কাউকে আস্ত রাখবে না! দূরদূরান্তের দানীগুলি (গ্রাম) থেকে অনেক মানুষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পৌঁছেছে। এ অঞ্চলের বিধায়ক—যে এতক্ষণ মাইকে কথা বলছিল সে-ই আমাকে মসজিদ থেকে ডেকে এনেছে। আমি শুয়ে ছিলাম। সকাল থেকে পিঠের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি। মাদ্রাসা যাওয়ার আগে পিঠে গরম জলের ব্যাগ দিয়ে সেঁক দিচ্ছিলাম। তখনই বিধায়ক আসে। আমাকে এখানে নিয়ে আসে। তুমি চুপচাপ নিজেকে ওদের হাতে তুলে দাও।

—কেন? আমি কী অন্যায় করেছি?

—মন্দিরে ঢুকেছ, নামাজ পড়েছ! তোমাকে এসব বলা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি? আমরা এতগুলি পরিবার একসঙ্গে থাকি, সবাই গর্তের ইঁদুরের মতন লুকিয়ে। এরপর কী হবে আমরা জানি, সেটা হতে দেওয়া যায় না, আল্লার দোহাই, তুমি আমাদেরকে বাঁচাও!

ইমামের দাড়ি নড়ছে। আতঙ্কে আওয়াজ কাঁপছে। সে একবার জোরে শ্বাস নিয়ে বলে,—আমি জানিনা তুমি কে....কী চাও.....এখানে কেন এসেছো? কিন্তু এটা জানি যে তুমি আর বাঁচবে না! কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। খুব বেশি হলে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসা অব্দি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। তখনও তুমি বেরিয়ে না এলে ওরা দরজা ভেঙে ফেলবে। এই গ্রীলের ফাঁক দিয়ে তোলা তোমার ছবি এর মধ্যেই টিভির পর্দায় চলে এসেছে। সমস্ত চ্যানেলের খবরে তোমাকে দেখানো হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার বাড়ির লোকজনকে খুঁজে বের করা হবে। খবরের কাগজ ও টিভির লোকেরাও অনেকে চলে এসেছে, ধীরে ধীরে আরো অনেকে আসবে। ওরা কেউ তোমাকে বলছে নিষিদ্ধ সংগঠন ফিকির সদস্য, অন্যরা বলছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার চর। সারা দেশে এখন আমাদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার লহর চলছে। সত্যি বলতে কি এখন সবাই তোমার মৃত্যু চাইছে। হিন্দুরাও চাইছে, মুসলমানরাও চাইছে।

ইমান ঢোঁক গেলে। চারপর তর্জনি দিয়ে দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলে, এসব দেখে দেখে আমরা বুঝে গেছি যে রাজনীতির মানুষেরা যখন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যেতে থাকে তখন সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে। আমরা গরীবরা একে অন্যকে মারতে থাকবো আর ওরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করবে। তোমার মৃত্যুতে ওদের ক্ষমতা ও শক্তি বেড়ে যাবে। ওরা তোমাকে ছাড়বে না.....

বলতে বলতে ইমামের গলার আওয়াজ নিচু হয়ে যায়। সে যেন অনেকটা আনমনেই বলতে থাকে—আমরা বস্তির সবাই গরীব......ধুনুরি, দর্জি, তাঁতী, রঞ্জক, ধোপা, উটচালক, মেষপালক আর চর্মশিল্পী। গতকাল যে লোকটা তোমাকে উটের পিঠে করে নিয়ে এসেছিল সেই সেলিমও

আমাদের বস্তিতেই থাকে। টাট্টি করতে ঘরে গেছিল। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় আর ফিরতে পারেনি। আর সকালে তোমার মন্দিরে নামাজ পড়ার গল্প চাউর হয়ে গেলে আর এদিকে পা মাড়াতে সাহস পায়নি। সে আমাকে বলেছে যে তুমি ভালমানুষ. গতকালকের টাকা গতকালই দিয়ে দিয়েছিলে।

ইমাম আবার ঢোঁক গিলে বলে—তুমি বা তোমরা কি করতে চাও তা জানিনা। কিন্তু আমরা জানি যে এটাই আমাদের দেশ, এখানেই আমাদের রুজি-রোজগার। আমরা এখান থেকে কোথাও যাব না। ওদের সঙ্গে মিলেমিশে. ওদেরকে খুশি রেখেই আমাদের চলতে হবে। এখানে আমাদের প্রায় দেড়শো ঘর—গায়ে গায়ে লাগা—যে কোনো একজনের ঘরে ঢুকলে ভেতর দিয়ে যে কোনো ঘরে যাওয়া যায়। ভয় আমাদেরকে এমন করে দিয়েছে। দারিদ্র্য. অশিক্ষা ও অপুষ্টিজনিত নানা রোগ ছাড়াও যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার ভয় আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে! তেমনি আমাদের প্রতি ঘৃণা ওদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে ......

লোকটা আবার ঢোঁক গিলে কাতরকণ্ঠে বলে—তাহলে প্রাথমিকভাবে ফলভোগ করবো আমরা দেড়শোটি পরিবার। এই উন্মত্ত ভিড়ের আক্রোশের সামনে কোনো আইনকানুন ...কোনো সুবিচার কিম্বা শুভেচ্ছা কাজ দেবে না। ওরা আমাদেরকে ছাড়বে না। আমরা মরবো. রক্তপাতে. ক্ষুধায় ও ত্রাসে। কারফিউ শুরু হবে। এই কারফিউ শব্দের মানে অন্যদের কাছে যা আমাদের কাছে তা নয়। আমাদেরকে অবরোধ করে তিলে তিলে যন্ত্রণা দেওয়া ও মানসিক নির্যাতনের কানুনী তরিকা হল এই কারফিউ। তখন আমাদেরকে বাঁচানোর কেউ থাকে না। আমাদের কিছু যুবক সবসময় সঙ্গে অস্ত্র রাখে......চালায়, আক্রমণকারীদের উপর. এমনকি কখনো আত্মরক্ষার্থে পুলিশের উপরও। কিন্তু এতে ওদের সাময়িক আত্মরক্ষা হলেও......দারিদ্র্য. অশিক্ষা. কর্মহীনতা আর সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোর গ্লানি. হতাশা ও সংখ্যাগুরুর প্রতি, সমাজব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা থেকে এভাবেই চলতে থাকে এক দীর্ঘকালীন অসম লড়াই। দোহাই তোমার. তুমি আমাদেরকে নতুন করে আরো যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিও না। তুমি কথা দাও—

নাসিম চুপ। সে কী বলবে? এই মুহূর্তে মায়ের মুখটা বারবার মনে পড়ে। স্ত্রী ও পুত্রদের কথা মনে পড়ে। আর বুঝি ওদেরকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে না!

ইমামও কিছুক্ষণ চুপ থাকে। তারপর আবার কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে আকুতিমেশানো আওয়াজে বলে—এই দেড়শো পরিবারকে আমি কেমন করে বাঁচাই? তুমি কথা দাও অথবা তোমার পিস্তলটা বা অন্য যে অস্ত্র সঙ্গে আছে তা আমাকে দিয়ে দাও। আমি কাউকে বলবো না!

নাসিমের হঠাৎ মনে হয় ইমামের দাড়ি আর নড়ছে না। হাওয়া থেমে আছে। আগের দারিদ্র্য ও করুণাভরা চেহারাও ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। ওঁর চোখে আর আতঙ্ক নেই। ঐ দাড়ির আড়ালে ওর চোখে ঝোপের পেছনে শিকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ওৎ পেতে থাকা চিতার মতন স্পষ্ট চতুরতার ছাপ লক্ষ্য করে নাসিম।

—তুমি আমাকে চুপিচুপি পিস্তলটা দিয়ে দাও। আমি গিয়ে মসজিদে তোমার জন্য আল্লাতালার কাছে দোয়া চাইবো—আর ওদেরকে অনুরোধ করব যাতে তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

তাহলে তুমি গণপিটুনির থেকে বাঁচবে—

নাসিমের চোয়াল শক্ত হয়। সে জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করে। তারপর কঠিন. আওয়াজে বলে—না, আপনি যান!

ইমাম কিছুক্ষণ গ্রীলে মুখ লাগিয়ে ওকে দেখতে থাকে। ওর চেহারায় নানা রঙ খেলা করে, —তোমার কিছু চাই? জল কিম্বা খাবার?

নাসিমের বুকটা আশায় ভরে ওঠে। সমস্ত অস্তিত্ব বলতে চায়—হ্যাঁ চাই, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করে—কেমন করে দেবেন?

—দরজা দিয়ে। আর তো কোনো রাস্তা নেই!

—না! আমার বিশ্বাস উঠে গেছে। আপনি সবাইকে চলে যেতে বলুন, আমি এদেশেরই নাগরিক, সরকারী কর্মচারী, মন্দিরের কোনো ক্ষতি করবো না। আজানের সুরে স্থানকাল ভুলে নামাজ পড়ে ফেলেছিলাম। রাত হলেই চলে যাবো।

—কেমন করে যাবে? কেউ আসবে তোমাকে নিতে? তোমার দলের লোকজন? নাকি সেলিমকে উট দিয়ে পাঠাবো?

ইমামের আগ্রহে নাসিম বিরক্ত হয়। সে আবার চোয়াল শক্ত করে বলে—আপনি যান!

লোকটা আবার কী যেন গুছিয়ে বলতে চায়। নাসিম ওর সমস্যা বুঝতে পেরে চিৎকার করে বলে—গেট লস্ট! দফা হো যাও যাঁহা সে!

নাসিম আর পারছে না। মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। রামঅবতার, পরিতোষ কিংবা যুগল পরিহার কি এখনো খবর পায়নি? কী করছে ওরা? সে পকেট থেকে রুমাল বের করে তা দিয়ে শক্ত করে কপাল বাঁধে। তারপর গর্ভগৃহের চৌকাঠে বসে পড়ে। কিছুই ভাবতে পারছে না। চোখ বন্ধ করে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দেয়। পৃথিবী কাঁপছে।

'ঐ শুনো।' একটা মেয়েলি আওয়াজ শুনে আবার চোখ খোলে নাসিম। প্রথমে কিছুই দেখতে পায়না। সবকিছু আবছা লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য সে নাটমণ্ডপের পাথরের গ্রীলের ফাঁক দিয়ে একজোড়া দশাসই গোঁফ দেখতে পায়। পুলিশের ইউনিফর্ম। এরকম ভারী মানুষের এমন সরু কণ্ঠস্বর! অন্যসময় হলে সে হেসে ফেলতে ফেলত। কিন্তু এখন আর হাসি পায় না। গোলগাল ফর্সা চেহারা। লোকটা কতক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কে জানে! নাসিম উঠে দাঁড়াতেই লোকটার ইউনিফর্মের কাঁধে অশোকস্তম্ভ দেখতে পায়। তার মানে নিশ্চয়ই আই.পি.এস অফিসার!

—কাছে এসো।' ওর খ্যানখেনে আওয়াজে নাসিমের মাথা ঝনঝন করে। সে বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। লোকটা গ্রীলের ফাঁক দিয়ে গুলি করবে না তো? নেতার কথা আর পুলিশের কাজ এক নাও হতে পারে! নাসিম এক পা-ও বাড়াতে ইতস্তত করে।

পুলিশ অফিসার বলে—ভয় পেয়ো না.....আমি কিছুই করব না। কিছু করতে হলে অনেক আগেই করা যেত। দরজাও ভাঙতে পারতাম....তোমাকে এখান থেকেও গুলি করে মারা যাবে!

কিন্তু আপাতত তেমন কিছুই করতে চাই না—আমি এখানকার এস.পি, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই!

এবার নাসিম গ্রীলের কাছে এগিয়ে যায়। মাথা ঘোরায়। পা কাঁপে। পুলিশ থেকে নিজেকে সত্যিকারের অপরাধীদের মত সতর্ক হতে দেখে সে অবাক।

—তোমার নাম কি? এস.পি হিন্দিতে জিজ্ঞেস করে।

নাসিম ইংরেজিতে জবাব দেয়, নাম দিয়ে কী হবে? মুসলমান কিনা এই কথাই নিশ্চিত হতে চাইছো তো? হ্যাঁ, আমিই সেই লোক যে ভোরবেলা আজানের সুর শুনে স্থান-কাল-পরিবেশ ভুলে মন্দির চত্বরের মধ্যেই নামাজ পড়ার অপরাধ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাস আলাদা হলে কি এক ধর্মস্থানে বসে অন্য পদ্ধতিতে ঈশ্বরকে ডাকা যাবে না?

ওর চুস্ত ইংরেজি শুনে এস.পি এবার ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করে—তুমি কি চাও?

—নাথিং! তোমরা চলে যাও, মুসলমান বস্তিতে ভয়ে লুকিয়ে থাকা আমার উটচালক সেলিমকে ডেকে দাও—আমি চলে যাবো!

—এখানে কেন লুকিয়ে আছো?

—লুকিয়ে নেই। রাতে আঁধি ওঠায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। এখন আটকে পড়েছি! কেটলীতে করে একটু খাওয়ার জল আনাবে? গ্রীলের ফাঁক দিয়ে জল খাবো।

এস.পি মুচকি হেসে বলে, যাক্, এতোটা তো বিশ্বাস করেছো!

তারপর ওয়াকিটকিতে কাউকে কেটলি করে জল আনার আদেশ দেয়। তারপর আবার নাসিমকে জিজ্ঞেস করে—কোত্থেকে এসেছো?

—যোধপুর।

—কোথায় যাচ্ছিলে? দেখে তো রাজস্থানী মনে হয় না, কোথাকার লোক?

—এখানেই এসেছিলাম, এই কাকমহল নিয়ে একটা ডক্যুমেন্টারি বানাবো—

—ও, তুমি ফিল্ম ডাইরেক্টর, একা কেন, বাড়ি কোথায়?

—না, আমি প্রত্নগবেষক। ত্রিপুরার লোক—আগরতলায় বাড়ি!

—বাংলাদেশি?

নাসিম একবার পুলিশ অফিসারের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে—না, আমি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসার!

—পরিচয়পত্র সঙ্গে আছে?

—না!

ততক্ষণে একটি কনস্টেবল একজোড়া বিখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানির কোল্ড ড্রিংকের বোতল

নিয়ে আসে। —জলের কেটলী পাওয়া গেল না স্যার।

অফিসারের ইঙ্গিতে সে বোতলদুটি গ্রীলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলে নাসিম সেগুলি লুফে নেয়। তারপর দাঁত দিয়ে ছিপি খুলে একবোতল পানীয় ঢকঢক করে খেয়ে নেয়। আরেক বোতল নিচে নামিয়ে রাখে।

ঠাণ্ডা পানীয়ে কিছু মেশানো ছিল না তো! নাকি ঠাণ্ডা পানীয়ের ঝাঁজে বুক ও পাকস্থলীতে জ্বলুনি টের পায়। খালি পেট বলেই হয়তো। গলা দিয়ে ঝাজযুক্ত ঢেঁকুর উঠে আসে। নাসিমের শরীর ঝাঁকুনি দেয়। এস.পি-র কপালে ভাঁজ পড়ে—কী হলো?

নাসিম অনেক কষ্টে বলে—মাথা ঘুরছে, শরীর টলছে—মাথা ব্যথা!

এস.পি বলে, 'হুম! তুমি একা এসেছো, পরিচয়পত্র সঙ্গে আনোনি কেন?

—ভুলে গেছি।

—ঐ ঝোলাব্যাগের জিনিসপত্র ও কাগজগুলি তোমার?

—হ্যাঁ।

—ঐ ছবিগুলি তুমি এঁকেছ?

—হ্যাঁ।

তখুনি এস.পির ওয়াকিটকিতে আবার কিছু মেসেজ আসে। লোকটা একটু দূরে গিয়ে দূরাগত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করে। তারপর আবার ওর কাছে এগিয়ে এসে চকচকে চোখে জিজ্ঞেস করে,—তুমি অর্জুনদেব চারণকে চেনো?

—হ্যাঁ, আমার অধ্যাপক বন্ধু, কবি ও নাট্যকার—

—হুম, পত্রকার যুগলজীকে?

—হ্যাঁ, সেও তো কবি—আমার বন্ধু!

এবার এস.পি হেসে বলে—দেখো জী নাসিম সাব, তোমার এই দুর্গতির জন্যে তুমিই দায়ী—আগে বলো নি কেন?

নাসিম ওর কথার কী জবাব দেবে? সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ওর দুচোখ জলে ভরে ওঠে। সমস্ত অস্তিত্ব নিংড়ে একা বোবা কান্না ওকে অবশ করে দিতে থাকে। উটের কান্না! সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায় নাটমণ্ডপের নোংরা মেঝেতে।

আট

A friend is one who knows your faults
yet loves you in spite of your virtues

যুগলজি জিজ্ঞেস করে,—তোমার রিজার্ভেশান তো মণ্ডোর এক্সপ্রেসেই!

পরিতোষ বলে,—না, মরুধরে রিজার্ভেশান করেছি—আগামীকাল দিল্লী থেকে পূর্বা ধরব!

—তারপর বউ নিয়ে ফিরছ কবে?

—ঠিক একুশ দিন পর!

মিসেস পরিহার বলে,—যেদিন ফিরবে, মালপত্র রত্নাডায় ভাড়াবাড়িতে নামিয়ে রেখে ফ্রেশ হয়ে এখানেই চলে এসো, সেদিন আমাদের সঙ্গেই ডালরুটি খাওয়ার নেমন্তন্ন রইলো! কোনরকম ওজর আপত্তি চলবে না!

ভাবীজির আন্তরিক নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না। নাসিম সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হেসে ফেলে। তারপর মাথা চুলকে বলে,—কিন্তু ভাবীজি সেদিন যে আমিনা ভাবী বলে রেখেছেন! আপনার এখানে বরঞ্চ পরে একদিন—

মিসেস পরিহার বলে,—না, তাহলে পরদিনই—নিজের ঘর গোছাতে তোমার বউ এর সময় লাগবে তো!

ঠিক আছে! পরিতোষ ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। যুগলজি চায়ের কাপের ট্রের উপর রেখে বলে,—না-ও, স্টোরিটা শেষ করো! কবে যে তুমি স্ক্রিপ্ট ধরবে?

কেন স্যার? বিয়ের পরদিন থেকেই—পরিতোষ হেসে জবাব দেয়।

নাসিম সাহেব বলে,—খবরদার এমনটি করতে যাবে না! বরঞ্চ কাহিনীর পাণ্ডুলিপিও তুমি যুগলজির কাছেই রেখে যাও! তিনি সেই অনুযায়ী একটা আউটলাইন করে রাখবেন—

যুগলজি বলে,—সেটাই ভাল হবে, বিয়ের পর কিছুদিন এসব কাজ করতে তোমার ভাল লাগবে না, পরে ধীরে ধীরে মিসেসকেও ইনভল্‌ভ করে নিতে পারলে আবার—

মিসেস পরিহার বলে,—খবরদার পরিতোষ, এই ভদ্রলোকের কথা শুনে বউকে ইনভল্‌ভ করাতে যেও না—অবশ্য সে যদি নিজে থেকেই—

যুগলজি বলে,—সবাইকে নিজের মত ভাবো নাকি, পরিতোষের স্ত্রী বাঙালি, ওদের রক্তে শিল্প-সংস্কৃতি—না-ও পরিতোষ, তুমি পড়ো দেখি এবার—

যুগলজির ঠোকামারা কথা শুনে ওর স্ত্রীর মুখ ভার হয়ে যায়। পরিতোষ তাই মজা করে বলে,—ভাবীজি, আজ থেকে স্যারের মাঝরাতে চা-কফি সাপ্লাই বন্‌ধ! যতক্ষণ না ঘুমান আপনিও কোন উপন্যাস পড়বেন!

ওর কথায় উজ্জীবিত হয়ে শ্রীমতী পরিহার বলে,—ঠিক বলেছ, তাহলেই টের পাবে, নিজে তো কুটো ভেঙ্গে দুটো করতে জানে না! তারপর একটু দম নিয়ে বলে,—যাইহোক, তুমি ভাই গল্পটা শোনাও—তারপর আমার অনেক কাজ।

একথা শুনে সবাই হেসে ফেলে। শ্রীমতী পরিহারও তখুনি বুঝতে পেরে হাসে। পরিতোষ পড়তে শুরু করে। 'প্রতিরাতে' শব্দের আগে লালকালিতে একটা 'প্রায়' লিখে সে পড়ে,—প্রায় প্রতিরাতেই মহেন্দ্র উটের পিঠে চেপে উমরকোটের কারাগার থেকে অভিসারে যেত লোদ্রভায় আরাবল্লী পাহাড়ের কোলে। আর ভোরের আগেই আবার ফিরে

বন্দি হতো। তারপর স্নান আর প্রাতঃরাশের পরই কারাগারের মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়তো সে। অনুগত সোঢ়ী কারারক্ষীরা ওর গা-হাত-পা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দিত। দুপুরে রাজবাড়ির অন্দরমহল থেকে গোপনে একথালি হাতে তৈরি রুটি- ডালবাটি ও সব্জি, কাঠবাদাম, কাজু ও কেশর দেওয়া পায়েস, ঘন দুধের রাবড়ি, কাশ্মিরী সেব আর কাঁদি কাঁদি কলা আসতো। মহেন্দ্র যথাসাধ্য খেয়ে আরেক ঘুম লাগাতো।

সন্ধ্যার আগেই কারারক্ষীর বেশে নিযুক্ত কোন সেবক ওকে ডেকে দিত। নাপিত এসে ক্ষৌরকর্ম করতো। মহেন্দ্র তারপর স্নানটান করে প্রসাধন শেষে গরম দুধ কিংবা ফলের রস খেয়ে আবার উটের পিঠে চাপতো। পূর্ণিমার আগেপরে ছয়-সাত রাত অবশ্য মহেন্দ্র নিজেকে সংযত রাখতো। কেননা, মরুভূমিতে জ্যোৎস্নারাতে অনেকদূর অব্দি অনায়াসে দেখা যায়। যে কোন রক্ষী কিংবা গুপ্তচরের নজরে পড়লেই মহাবিপদ! মহেন্দ্র ভীষণ সতর্ক থাকে।

অবশ্য ওর কারাবাসের কথা ও মুমলকে জানায়নি। তাহলে মুমল হয়তো ওকে আর ফিরে আসতে দেবে না। একই কারণে হয়তো মীরপুর মাথেলার সঙ্গে উমরকোটের যুদ্ধ লেগে যাবে। মাঝখান থেকে বিপদে পড়বে ওর দিদি আর একান্ত অনুগত কারারক্ষীরা। মহেন্দ্র এসব চায় না। সেজন্যেই ওকে কারাবাসের গল্প বলেনি, কষ্ট দিতে চায়নি; যুদ্ধ ডেকে আনতে চায়নি। সে যে মানুষকে ভালবাসে, প্রকৃতিকে ভালবাসে। রক্তপাত ভালবাসে না।

পৃথিবীর কোন কবিই অহেতুক রক্তপাত ভালবাসে না। কবিরা হাসতে ভালবাসে, অন্যদের হাসাতে ভালবাসে, অন্যের দুঃখে ব্যথিত হয়। কবিরা সৌন্দর্যের পূজারী, সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ ওদের পাগল করে তোলে। অজান্তেই বোকামি করে ফেলে। সেজন্যেই প্রেম বা অভিসার কেউ চিরকাল চেপে রাখতে পারে না। মহেন্দ্রও পারেনি। কিছুদিনের মধ্যেই সে হামীর সুমরার কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। তার আগে নিশ্চয়ই কোন রাজার চর ওকে যেতে দেখে রাজাকে খবর দিয়েছে!

সেরাতে উটের পিঠে চেপে বসার পর দেখে যে উটটা আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না। কী ব্যাপার? দুএকবার ওটার পেটে পা দিয়ে গুঁতো দেওয়ার পর উটটা বিকট আর্তস্বরে ডেকে ওঠে। উঠতে গিয়েও পারে না। এহেন পিলে চমকানো ডাক শুনে অগত্যা উটের পিঠ থেকে নেমে এসে সে কারণ অনুসন্ধান করতে থাকে। তখনই অট্টহাস্যে চমকে ওঠে মহেন্দ্র। ভূত দেখার মতন মহারাজ হামীর সুমরাকে দেখে সে। কয়েকজন রক্ষীকে নিয়ে ওর চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে হামীর সুমরা বলে,—এই উটের চারটি খুঁড়েই আমার সৈন্যরা পেরেক ঠুকেছে! ও আর উঠতে পারবে না, তোমাকে গোপনে বহন করার শাস্তি পাচ্ছে!

মহেন্দ্র অস্ফুট স্বগতস্বরে বলে,—ওহ্!

হামীর সুমরা তখন ওকে জেরা শুরু করে,—কতদিন ধরে এরকম ফাঁকি দিচ্ছ? মহেন্দ্র নিরুত্তর।

—কে তোমাকে কয়েদখানা থেকে বেরুতে সাহায্য করেছে?

মহেন্দ্র চুপ। পায়ে পেরেক ঠোকা উটটি আবার আর্ত চিৎকার করে ওঠে। রাজা জিজ্ঞেস করে,—কে উটের ব্যবস্থা করেছে?

মহেন্দ্র এসব প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। এরকম উদ্ধত ভঙ্গি দেখে হামীর সুমরার রাগ কিন্তু বাড়ে না। সে মহেন্দ্রকে এভাবে দেখতেই অভ্যস্ত। মহেন্দ্র কোনদিনই মাথা নীচু করে থাকে না। সে যে প্রকৃত বীর ও সাহসী যোদ্ধা! ততক্ষণে মহারাজের তলব পেয়ে কারাপ্রধান ও কর্তব্যরত কারারক্ষীরা ওখানে এসে দাঁড়ায়। ওদেরকে আসতে দেখে মহেন্দ্র মুখ খোলে,

—এদের কারো কোন দোষ নেই মহারাজ। আমি আপনার সঙ্গে সম্পর্কের জের টেনে এই সাধারণ কর্মচারীদের উপর প্রভাব খাটিয়েছি, ওরা জানে আপনি আমার বিশেষ বন্ধু ও ভগ্নীপতি, আজ কোন অজ্ঞাত কারণে আমার উপর রেগে আছেন, কাল রাগ কমে গেলে বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এই দেশপ্রেমী যোদ্ধাকে অবশ্যই কাছে টেনে নেবেন! সেই ভয়েই ওরা আমার আদেশ অমান্য করতে পারেনি! আর আমি তো নিজের বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই, সে-ও লোকচক্ষুর আড়ালে—যাতে আপনার সম্মানহানি না হয় —যত কষ্টই হোক ভোরের আগেই ফিরে আসি! তবু যদি অপরাধী ভাবেন, আমাকেই শাস্তি দিন—

মহেন্দ্রর কথা শুনে হামীর সুমরা হা। কী বলবে ভেবে পায় না। বুকের মধ্যে থেকে কুলকুল করে কিছু একটা প্রবাহিত হয় সারা শরীরে। মহেন্দ্র তো একটাও মিথ্যে কথা বলেনি,—সামান্যও ছল করেনি। তাহলে? মহেন্দ্র একবার বুকভরে শ্বাস নিয়ে বলে—আমার দেশপ্রেম ও আনুগত্য নিয়ে আপনার মনে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই, সেই অধিকারেই আর্জি জানাচ্ছি -- ওদেরকে ছাড়ুন, আমাকে দণ্ড দিন!

—কেন, তোকে কেন দণ্ড দেবেন, কী অন্যায় করেছিস মহারাজ দয়া করে তা আগে বলুন! হঠাৎ নারীকণ্ঠে এই দাবী শুনে সবাই চমকে ওঠে। মহেন্দ্র আঁতকে উঠে বলে, —দিদি! তুই এখানে কেন? যা, অন্তঃপুরে যা!

সোঢ়ী রানি বলে,—আমরা তো অন্তঃপুরেই থাকি, অন্তঃপুরকে সাজিয়ে গুছিয়ে পুরুষের আশ্রয় রচনা করতে থাকি, রাজধর্ম নিয়ে কাউকে কোন প্রশ্ন করি না আমরা, সবসময় হাসিমুখে পুরুষকে তৃপ্তির সংসারে বরণ করে নিই! রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা শত্রুর আক্রমণে সতীত্বে আঁচ লাগার সম্ভাবনা দেখা দিলে আমরা জহরব্রত করে আত্মাহুতি দিই! তা সত্ত্বেও কি রাজধর্মে কোন অন্যায়, অবিচার, কোন ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে পারবো না?

সবাই নিশ্চুপ। পেরেক বিদ্ধ উটনীর কাতর গোঙানি ছাড়া প্রত্যেকের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। বাতাস থেমে আছে। হামীর সুমরার কেমন যেন ভয় করে। অবশ্য ভয়ের কোন কারণ সে খুঁজে পায় না। মহেন্দ্র যত বিশাল চেহারার মানুষই হোক না কেন তার বহিরঙ্গে কোন দাপট নেই। রাজার সামনে তো নেই-ই। একেবারে খাঁটি বিনয়ী।

সোঢ়ীরানি একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে আবার বলে,—সতীসাধ্বী তো পুরুষের আত্মা কিংবা বিবেকের মতন, তাকে সবরকম প্রশ্ন করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে, মহারাজ জবাব দিন, নাহলে আমি জহর ব্রত করবো, অধর্ম আর সতী একসঙ্গে বসবাস করতে পারে না, সেজন্যে আপনাকেই জনসমক্ষে জবাবদিহি করতে হবে! হামীর সুমরার হা আরো বড় হয়। কোনদিন সোঢ়ীরানিকে একসঙ্গে এতকথা বলতে শোনেনি সে। ওকে শুধু মিটিমিটি সন্ধ্যা প্রদীপের মতন হাসতে দেখেছে। অথচ আজ যেন নিজেকে নিংড়ে স্ব-শূন্য হয়ে পড়ছে ক্রমে, হাঁপাচ্ছে। অথচ কী বৈভব! এই আধোঅন্ধকারেও প্রোজ্জ্বলিত অগ্নিমালা। এই রূপবতী হাহাকার, ঘৃতগন্ধ অশ্রু আর প্রতিবাদী নিশ্চিত অহং যেন হামীর সুমরার নিজের ভিতর থেকেই উৎক্ষিপ্ত হয়ে রানির কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সে একদমই রাগ করতে পারে না। সামনে এই বিশাল মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকায় সে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হলেও মনের কোন অসতর্কবৃন্তে কিছু স্মৃতিমালা দোলে, এর মধ্যে বাদুড়ের মতো জেগে থাকে লোদ্রভার কিছু বিস্মৃতিও।

তবু সে একদমই রাগ করতে পারে না। বরঞ্চ রা রা করে বিবেক জেগে ওঠে। এতক্ষণে বুকের ভেতর থেকে কলকল করে বয়ে যাওয়া কোনকিছুর মানে বুঝতে পারে। সে আর্দ্র হয়ে পড়ে। এ যেন কুড়ি বছর আগের রাজপুত্র হামীর, প্রেমিক হামীর, বন্ধুবৎসল-বন্ধুঅন্তপ্রাণ হামীর। মহেন্দ্রর এক একটি কবিতা শুনে ওর শব্দাবলি ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে ভলবাসতো যে হামীর। ছিঃ, বাসনার বশবর্তী হয়ে সেই বন্ধুকেই নিজের অহংকারের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে যাচ্ছিল সে। এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। হামীর সুমরার মন বলে,—তবু ক্ষমা চাইব! এছাড়া আমার পাপস্খলন কীভাবে হবে? সামনে যত কারারক্ষীই থাকুক না কেন, সবাই জানে মহেন্দ্র আমার বন্ধু। বন্ধু জানে আমার দুর্বলতা ও ভুল, বন্ধুই জানে আমার যতটুকু উদারতা! এরকাছে নতজানু হতে আবার লজ্জা কী?

এক কদম বাড়িয়েই রাজা আবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে—এই সমর্পণ কি মৃত্যুসম? মৃত্যু কাকে বলে? বন্ধুর ব্যক্তিত্বের কাছে রাজার অহং নিভে যাবে যে! সারা রাজ্যে টি টি পড়ে যাবে কি? যে অহং নিভে যায় সে অহং কি মরে যায়?—অহং আর আলো কি সমর্থক? নাকি অহং হলো মসৃণ অন্ধকার, অনেকটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো একটা আলোকভ্রম। আর বন্ধুর কাছে সমর্পণে যদি মৃত্যুই ঘটে তাহলে মৃত্যুরও কি আর একটা জগৎ রয়েছে যেখানে মৃত্যুর আর বিনাশ হয় না! রাজা আবার এগিয়ে যেতে যেতে ভাবে,—এই সমর্পণ তো প্রায়শ্চিত্ত। আর প্রায়শ্চিত্ত মানেই নতুন জীবন!

হামীর সুমরা তবু দুহাত বাড়িয়ে মহেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে বলে,—আমাকে ক্ষমা করো রানা! রানি আমার চোখ খুলে দিয়েছে, বাসনা আর হিংসার শিকার হয়েছিলাম আমি, স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার স্ত্রীর কাছেও ক্ষমা চাইছি! আমি মরমে মরে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচাও।

কিছুক্ষণ আবার সবাই চুপ। মহেন্দ্র অভিমানে নিঃসাড় পাথর। মরুভূমির সন্ধ্যায় সময় থেমে থাকে কিছুক্ষণ। নীরব অন্ধকারে খোলা আকাশের এক ফালি চাঁদ আর তারাদের

ঝিকিমিকি আলোর নীরবতা, জগৎ রহস্য, জানা অজানা সবকিছু, আর অশ্রু আর বিনাশ, আর সম্ভাবনার সৃষ্টি ইত্যাদি বুদবুদের মতন ওদেরকে ঘিরে একটা কিছু রচনা করে যায়। মরুভূমির সন্ধ্যায় সময় আবার গতিশীল হয়। তারপর শোনা যায় শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। কে কাঁদছে আর কে কাঁদছে না ঠাহর করা যায় না। মহেন্দ্রর কাঁধে মাথা গুঁজে থাকে হামীর সুমরা। হামীরের পিঠ ধরে থাকে মহেন্দ্র। দুজনার এ যাবৎ দৃঢ়তা কমনীয়তায় পর্যবসিত হয়। দুজনার অশ্রুতে সব অভিমান ও অহং ধুয়ে যায়। আনন্দে কেঁদে ফেলে সোঢ়ীরানি, কারাপ্রধান ও অন্য কারারক্ষীরা। গর্বিত উচ্চারণে রানি একটি দোঁহা আওড়ায়—হথলেবৈ রী মূঠ কিণ, হাথ বিলগ্গা মায়' লাঁথা বাঁতা হেকলো, চূড়ো মো ন লজায়*। (*মাগো, আমি পানগ্রহণের সময় স্বামীর হাত ছুঁয়েই বুঝতে পেরেছিলাম তিনি প্রাণ থাকতে আমার চুড়ির অবমাননা করবেন না, ভীরুতার এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে আমাকে অন্যের কাছে মুখ লুকোতে হয়।) কান্নার পবিত্র জলে সিক্ত হয় মরুভূমি। রাজপুতদের থেকে বেশি করে কে জানে যে অশ্রুসিক্ত আর রক্তস্নাত মাটি পৃথিবীর যে কোন বস্তুর চাইতে বেশি মহার্ঘ।

এবার রাজা কারাপ্রধান ও কারারক্ষীদের সামনে হাতজোড় করে বলে,—আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। রানা মহেন্দ্রর কারাবাসের খবর যেন কাকপক্ষীও টের না পায়। আপনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, আপনারা আমার বিরাট অন্যায়ের বোঝা খানিকটা লাঘব করেছেন; আপনারা শ্রেষ্ঠ নাগরিক।

তারপর কারাপ্রধানকে বলে,—'যান, উটশালে গিয়ে রানা মহেন্দ্রর জন্য আরেকটা উটের ব্যবস্থা করুন।' অন্য কারারক্ষীদের কাউকে বলে মহেন্দ্রর জন্য নতুন রাজবেশ আনতে। অন্যদেরকে বলে, রাজ্যজুড়ে উৎসব, সমস্ত সভাসদদের এখুনি খবর দিন আগামীকাল ভোরেই রাজসভা বসবে!

একজন প্রৌঢ় কারারক্ষী মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে,—কারাপ্রহরার কী হবে মহারাজ?

রাজা বলে,—কারাগারের প্রধান দরজায় তালা লাগিয়ে দিন, আজ রাতে কোন পাহারার প্রয়োজন নেই!

—যথা আজ্ঞা মহারাজ! এই বলে সবাই ওখান থেকে চলে যায়। বাকি থাকে শুধু রানা মহেন্দ্র, রাজা হামীর সুমরা আর সোঢ়ীরানি।

এবার ধীরপায়ে রানির দিকে এগিয়ে যায় রাজা। রানির গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাজা দুহাত বাড়িয়ে আলতো ছোঁয় রানির কাঁধ। তারপর ধীরে চাপ বাড়ে। রানি মাথা তুলে একবার রাজার চোখে তাকিয়ে তেমন কিছুই দেখতে পায় না—শুধু চকচকে কিছুতে নক্ষত্রের আলো বিচ্ছুরিত হয়। রাজা কি কাঁদছে। তাঁর হাতের থিরথির অনুতপ্ত স্পন্দন রানির কাঁধ বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। না-জানি কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। নির্নিমেষ। অজান্তেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে আরো—একেবারে আলিঙ্গনে। হঠাৎ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দাসীদের মধ্যে একজন গলাখাঁকাড়ি দিয়ে বলে ওঠে,—রানিমাকে ডাক, আমাদের অন্দরমহল সাজাতে হবে না?

তখন দূর থেকে ছুটে আসা উটের আওয়াজ শোনা যায়। হামীর সুমরা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রানিকে ছেড়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলে,—যাও মহারানি, দাঁড়িয়ে থেকো না আর, ভ্রাতৃবধূকে বরণ করার জন্য অন্তঃপুরকে সাজিয়ে তোল! মীরপুর মাথেলা পাঠানোর জন্য শুভেচ্ছাসামগ্রীর ফর্দ বানিয়ে ভাণ্ডারক ও কোষাধ্যক্ষকে পাঠাও। ওরা আগামীকালের জন্য বরণডালা সামগ্রীর ব্যবস্থা করবে!

ততক্ষণে নতুন উট এসে মহেন্দ্রর সামনেই বসে পড়েছে। হামীর সুমরা তখন রানা মহেন্দ্রর কাছে এগিয়ে ওর কপালে চুমু খেয়ে বলে,—যাও বন্ধু, তাড়াতাড়ি রওয়ানা হও! রাত বাড়ছে ক্রমে।

এবার মহেন্দ্র হেসে ফেলে। তারপর সেও হামির সুমরার গলা জড়িয়ে ওর গাল টিপে দেয়। ওর গোঁফ মুচড়ে দিয়ে বলে,—ধন্যবাদ রাজা! তোমাকে আরো আদর করতে ইচ্ছে করছে!

তখন হামীর সুমরা ফিসফিসিয়ে বলে,—হ্যাট! তোমার আদর চাই না, আমাকে তোমার দিদি আদর করবে, তুমি মুমলকে করোগে যাও—

মহেন্দ্র হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর গিয়ে উটের পিঠে বসে। সোঢ়ীরানির এ দৃশ্য বেশ ভাল লাগে। ভাইটা বড় হওয়ার পর থেকেই রাজপুত্র হামীরের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সোঢ়ী ও সুমরাদের চিরশত্রুতার অবসানে দুই রাজবংশ পরস্পরকে বিবাহবন্ধনে বেঁধে ফেলার পর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ওদের বন্ধুত্ব! এতবছর ধরে ওদের বন্ধুত্ব সারা দেশে একটা প্রবাদের মতন। রাজা ও মন্ত্রী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে এমন দৃশ্য খুব কমই দেখা যায়।

মহেন্দ্রকে পিঠে নিয়ে উটনী উঠে দাঁড়ালে কারাপ্রধান ও রক্ষীরা জয়ধ্বনি করে শুভেচ্ছা জানায়। রাজা হাত নাড়ে। তারপর মরুভূমির পথে ধীরে ধীরে রানা মহেন্দ্রর উটনী অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে রাজা কারাপ্রধানকে বলে,—পশুচিকিৎসককে ডেকে এই উটটার পা থেকে পেরেকগুলি বের করে চিকিৎসা করান, সবচাইতে বেশি কষ্ট তো আমি এই বেচারীকে দিয়েছি! এর কাছে যে কোন্ ভাষায় ক্ষমা চাই!

নয়

'আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস'

প্রথমদিকে মুমল ভীষণ জেদ করতো। মাঝরাতেই প্রিয়তমকে বিদায় জানানো যে কী কষ্টের! অথচ মহেন্দ্র ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ। সারাদিন নাকি তাঁর অনেক রাজকাজ। তবু মুমলের আকর্ষণে মাসে অন্তত কুড়িদিন উটের পিঠে এতটা পথ পার হয়ে আসে আর ওকে আদর করে ফিরে যায়। মুমলের গর্ব হয়, এহেন কর্মনিষ্ঠ ও বিচক্ষণ মানুষেরা আছে বলেই অনেক কাজের চাকা ঘুরছে, সাধারণ মানুষ সুবিচার পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা

ও আস্থাই যে কোন রাষ্ট্রের শাসকের সবচাইতে বড় সম্পদ। সেজন্যেই এবার মুমল উমরকোটে মহেন্দ্রর কাছে যেতে চেয়েছে। মানুষটার এরকম কষ্ট দেখে মুমলের একদমই ভাল লাগে না। এরকম চলতে থাকলে তো কিছুদিনের মধ্যেই রাণার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে। সেজন্যে মুমলের ভীষণ দুশ্চিন্তা। সে তাই প্রায়ই আব্দার করতো মহেন্দ্রে যাতে রাজাকে বলে উমরকোটের মন্ত্রীত্ব ছেড়ে এখানেই এসে পাকাপাকিভাবে থেকে যায়। অন্ততঃপক্ষে কিছুদিনের ছুটি নিয়েও তো আসতে পারে!

কিন্তু মহেন্দ্র মাথা নাড়ে। এই প্রসঙ্গ তুললেই ওর চোয়াল শক্ত হয়। সে কী গোপনে কোন ক্ষোভ কিম্বা দুঃখকে গিলে খায়? মাঝেমধ্যে ওর চোখে একটা উদাস দৃষ্টি মুমলকে উতলা করে তোলে। অবশ্য অধিকাংশ রাতেই ওরা মিলনের জন্যে এত ব্যগ্র থাকে যে রাতের আঁধারে শরীর শুধু শরীর, চোখে তাকিয়ে অন্য গল্প করার সময়ই পায় না। তবু মুমল দেখেছে, মাঝেমধ্যেই ওর মধ্যে কিসের যেন একটা তাড়া কাজ করে, এ নিয়ে প্রশ্ন করলে ওর নীরব দৃষ্টিতে থাকে অসহায়তার ছাপ। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভীষণ কামুক বাসনাদীপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টি আর মহেন্দ্র প্রবলতর হয়ে বুকে টেনে নেয় ওকে। মুমলও গলতে থাকে। সোহাগে ভালবাসায় ভিজতে থাকে। গলতে গলতে ভিজতে ভিজতে একসময় তার আর নিজস্ব কোন অস্তিত্বই থাকে না, সে যেন মহেন্দ্রর অস্তিত্বের অংশমাত্র। নিজের শিরা ধমনীতে, শরীরের সমস্ত কোষে অনুভব করে মহেন্দ্রর রক্তের স্পন্দন। এত বড় বুকের খাঁচায় হৃদপিণ্ডটাও কি সাধারণ মানুষের থেকে আকারে বড়? নাহলে নিজের রক্তের ছলক ছাপিয়ে শুধু মহেন্দ্রর রক্তের স্পন্দন ওর শরীরে দোল কিম্বা হোরী উৎসবের ধবলী বাজায় কেন? অথবা এটা ওর নিজেরই স্পন্দন, মহেন্দ্রর অস্তিত্বও আবেগের প্রাবল্যে ওর অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যায়। সে তাই মহেন্দ্রকে আলাদা করে দিতে চায় না।

তবু একসময় আলাদা হতে হয়। বিদায়বেলায় মহেন্দ্রর চেহারাও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ লোকটা ওকে দীর্ঘচুম্বনে সে রাতের মতন শেষ আদর জানিয়ে আবার গিয়ে উটের পিঠে চাপে। তারপর হাত নাড়তে নাড়তে উটের পিঠে বসে দুলতে দুলতে যত দূর এগিয়ে যায় মুমলের কেন জানি মনে হয় সমুদ্রের ঢেউ-এ ভেসে ভেসে কোন্ দূরদ্বীপে চলে যাচ্ছে -- আর কী দেখা হবে ওর সঙ্গে? নাজানি কেন এক অজানা আশংকায় ওর বুক দুরুদুরু করে। বছর দশেক আগে বাবার সঙ্গে মীরপুর মাথেলা থেকে উটের পিঠে দ্বারকার সমুদ্রবন্দরে গিয়েছিল ওরা দ্বারকারাজেরই আমন্ত্রণে। সে এক দীর্ঘ যাত্রা। মনে পড়ে মীরপুর মাথেলার বণিকরা দ্বারকার বণিকদের সঙ্গে নানা রপ্তানী দ্রব্য নিয়ে বিশাল এক সমুদ্রতরীতে চেপে বসে মিশর দেশের উদ্দেশ্যে। মুমলের পিতৃব্য আশৈশব অভিযানপ্রিয় বাসুদেব সেই বণিকদলের সঙ্গে যায়। মুমল কাকাকে ভীষণ ভালবাসতো। তাই দ্বারকাবন্দরে ওদের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে সমুদ্রপোতে উঠে গেলে মুমলের চোখে জল চলে আসে। তারপর একসময় ঢেউয়ের বুকে দুলতে দুলতে এতবড় নৌকাটা ছোট হতে হতে আরো দূরে, অনেক দূরে ভেসে ভেসে ক্রমে একটা ছোট বিন্দুর মত হয়ে একসময় অদৃশ্য হয়ে যায়। মুমলকে কাঁদতে দেখে ওর বাবা ওকে কোলে তুলে

নিয়ে সান্ত্বনা দেয়,—কেউ দূরে গেলে তার জন্যে কাঁদতে হয় না, দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে যাবে, এক বছরের মধ্যেই তোর কাকা আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু শুধু একবছর কেন, বছরের পর বছর পেরিয়ে যায় কাকা আর ফিরে আসেনি। কেউ বলে তিনি নাকি সেখানেই ধর্মান্তরিত হয়ে কোন সুলতানের মেয়েকে বিয়ে করেছেন —কোন্ মুখে ফিরবে? আবার কেউ বলে, এক সামুদ্রিক ঝড়ের পর নৌকা কোন এক দ্বীপের চরে গিয়ে আটকে পড়েছিল, সেখান থেকে ফেরার সময় থেকেই নাকি কুমার বাসুদেবকে আর দেখা যায় নি। কাকার কথা মনে পড়লেই ছোটবেলার অনেক কথা মনে পড়ে, সেই বিদায়দৃশ্য মনে পড়ে আর এক অব্যক্ত কষ্ট মুমলকে ব্যথাতুর করে তোলে। শেষরাতে রাণা মহেন্দ্র আকাশ ভরা তারা আর প্রায় অর্ধচন্দ্রের আলোয় কাকনদীর তীর ঘেষে অরণ্যপথে যাওয়ার সময় হাত নাড়তে নাড়তে উটের পিঠে দুলতে দুলতে যত দূর এগিয়ে যায় কেন জানি কাকার সমুদ্রযাত্রার কথা মনে পড়ে, মনে হয় সমুদ্রের ঢেউএ ভেসে ভেসে কোন্ দূরদ্বীপে চলে যাচ্ছে মহেন্দ্র - না জানি কেন এক অজানা আশংকায় ওর বুক দুরুদুরু করে। ওর ভাগ্যটাই যে খারাপ। নাহলে মীরপুর মাথেলার রাজা নন্দ সিংহের বড় মেয়েকে এই অরণ্যে নির্বাসিতার জীবন-যাপন করতে হয়!

নাসিম বলে,—বাহ! শুনতে বেশ ভাল লাগছে! তবে মুমলকে নিয়ে সরাসরি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায় না। মুমল সম্পর্কে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে! কেউ বলে, মুমল সিন্ধ রাজবংশের রাজকুমারী, কেউ বা বলে সে গুজরাটের কন্যা। সেক্ষেত্রে ওর কাকা কুমার বাসুদেব এর সমুদ্র যাত্রার গল্প বাস্তব সম্মত লাগতেও পারে!

যুগলজী বলে,—তবে নাসিমসাহেব সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবোট, সিন্ধী কবি শাহ আব্দুল লতীফ, সচল 'সরমস্ত' আর হাফীজের লেখা অনুযায়ী মীরপুর মাথেলার রাজা নন্দই ছিল মুমলের বাবা! মহারাজা নন্দসিংহের কোন ছেলে ছিল না। রাণীরা ওকে পরপর নয়টি কন্যাসন্তান উপহার দেয়। মুমল সবার বড়। রাজা তাই ওকে রাজনীতিতে দক্ষ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু মুমল ভালবাসতো ছবি আঁকতে, গান গাইতে আর নাচতে। মুমলের ছোটবোন সুমল অবশ্য রাজকাজে বেশ দক্ষ হয়ে ওঠে। মুমলের মত পরমাসুন্দরী না হলেও সুমল যুদ্ধবিদ্যা ও অশ্বচালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। এমনকি বেশীরভাগ সময় সুমল পুরুষের বেশেই থাকতো। দুই বোনের মধ্যে ছিল দারুণ বোঝাপড়া। সেটা যেন পরিতোষের স্ক্রিপ্টে প্রতিফলিত হয়!

শ্রীমতী পরিহার জিজ্ঞেস করে,—মীরপুর মাথেলা আবার কোথায়?

যুগলজী বলে,—এখন পাকিস্তানে, সক্খর এর কাছাকাছি। নাও পরিতোষ, তুমি পড়ো, তারপর আমরা রুটি খাবো! ক্ষিদে ক্ষিদে পাচ্ছে!

পরিতোষ পড়তে শুরু করে,—মহারাজ নন্দ একটি বিশাল বন্য বরাহ শিকার করেছিলেন। একটা ছোটখাট হাতীর আকারের সেই দাঁতালকে মেরে রাজা ওর বিশাল দাঁতটা রাজবাড়ীতে এনে রাখে। তারপর থেকেই নাকি মীরপুর মাথেলার বাড়বাড়ন্ত। মিশর দেশ থেকে এক কুমার বাসুদেব ছাড়া সমস্ত বণিকেরা প্রভূত বাণিজ্য করে দেশে ফিরে

বিপুল রাজকর দিয়ে রাজকোষকে ভরিয়ে তোলে। তখন এই দাঁতের গুণেই নাকি রাজা তাঁর রাজকোষ নদীগর্ভে স্থাপন করে। সেখানে শুধু রাজাই যেতে পারতো। আর কেউ এ ব্যাপারে কিছু জানতো না। শুধু জানতো এক রাজমিস্ত্রী। সে ছিল আসলে এক ডাকাত। এসব কথা মুমল অনেক পরে জেনেছে।

মুমলের মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। ওর কাছে রাজকোষের চাবি রেখে বাবা জয়শলমীর রাজসভায় গিয়েছিলেন যুবরাজের অভিষেক সমারোহে। পুরুষবেশে সুমলও সঙ্গে গিয়েছিল। বাবা বলেও যায়নি ওটা কিসের চাবি। মুমল না জেনে চাবির গোছাটা একটা খুঁটিতে টাঙিয়ে রেখে সঙ্গীতচর্চায় ব্যস্ত থাকে। সেই সুযোগে সেই ডাকাত রাজমিস্ত্রী ফকিরের বেশে ভিক্ষা করতে এসে সম্ভবত মুমলকে অন্যমনস্ক দেখে চুপিচুপি ঐ চাবি হাতিয়ে পালায়। পরে রাতের আঁধারে সে একা অথবা সঙ্গীসাথী নিয়ে এসে সেই মহাপয়া বরাহদন্ত আর সমৃদ্ধ রাজকোষ খালি করে যায়। আর সেই সঙ্গেই ঘুরে যায় মুমলের ভাগ্যের চাকা।

পরদিন বিকেলেই বাবা ও সুমল ফিরে আসে। সেই বিকেলে বাবা ওর কাছে চাবি ফেরৎ চাইলে সে গিয়ে দেখে সেই খুঁটি ফাঁকা। সে আতিপাতি খুঁজে খুঁজে হয়রান। কিন্তু কোথায় পাবে চাবি? মুমলের মা মহারাণীও ওর সঙ্গে খুঁজে খুঁজে হয়রান। অগত্যা তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে বাবা দেখে রাজকোষ ফাঁকা। বাবার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে তলোয়ার বের করে মুমলকে কেটে ফেলতে যায়। আজো বাবার ঐ রুদ্রমূর্তি মনে পড়লে মুমলের রক্ত হিম হয়ে যায়। সে ঢোঁক গেলে। মুমল ভাবে, নিশ্চয়ই ঐ ফকিরের কাজ; আর কেউ তো সেসময় রাজবাড়িতে আসেনি। মুমল ফকিরের কথা বললে বাবা আরো ক্ষেপে যায়। উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে ওর দিকে তেড়ে আসে। ভাগ্যিস সেদিন সুমল কাছে ছিল! সে-ই অনেক কষ্টে বাবাকে সামলায়। তার আগে মহারাণী ওকে আটকাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তখনই সুমল ছুটে বাবার কাছে যায়।

—একী করছেন, না, না, কী করছেন আপনি? সুমল বাবার হাত ধরে ফেলে।

রাজা বলে,—তুই সরে যা, এই দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্বোধটাকে শেষ করে ফেলবো, আজ ওর একদিন কি আমার একদিন!

সুমল বলে,—না বাবা, তাহলে ভীষণ বোকামি হবে, দিদিই শুধু ঐ ডাকাতটাকে চেনে, ছদ্মবেশে এলেও চোখের দৃষ্টি আর নাক দেখে উচ্চতা ও শরীরের গড়ন দেখে শুধু ঐ-ই আমাদেরকে ডাকাত অব্দি পৌঁছুতে সাহায্য করবে!

রাজা বলে,—আগে একে দুই টুকরো করবো সরে যা!

সুমল বলে,—না বাবা, দিদিকে মারলে আপনার লুণ্ঠিত ধনসম্পদ কোনদিনই ফিরে আসবে না, আপনি তলোয়ারটা খাপে ঢোকান, কথা দিচ্ছি আমি আর দিদি মিলে বুদ্ধির জোরে বছর খানেকের মধ্যেই আপনার রাজকোষ ভরিয়ে দেব! সুমলের আত্মপ্রত্যয় সমৃদ্ধ কথা আর ফেলতে পারলো না রাজা। তবু এক কোপে ঘরময় ঘুরঘুর করতে থাকা একটা বিড়ালকে কেটে বিস্ফারিত চোখে মুমলকে কাঁচা খেয়ে ফেলার মতো দৃষ্টিতে দেখে বলে,

—ঠিক আছে ওকে আমি নির্বাসন দিলাম!

এক সেবককে ডেকে তার রক্তাক্ত তলোয়ারটি পরিষ্কার করতে বলে আমোদ খানায় সুরাপান করতে চলে যায়। ওরা মা-বেটি তিনজন পরস্পরের দিকে তাকায়। মুমলের চোখে তখনো আতঙ্ক। সে তখনো মৃত্যুভয়ে থরথর করে কাঁপছে। মা ওর কাছে বসে ওর মাথাটা বুকে তুলে নিয়ে চুলে বিলি কাঁটতে থাকে। মায়ের দুগাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে, - না জানি কোন্ বিদেশ বিভুঁয়ে নির্বাসনে যেতে হবে মেয়েটিকে! সুমলও গালে হাত দিয়ে বসে চিন্তা করতে থাকে। মহারাজ ওকে মাত্র তিনদিনের মধ্যে কিছু করার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। সুমল ঘরময় পায়চারী করে। মুমল ও তার মা বসে বসে সুমলের অস্থিরতা কিভাবে কমানো যায় সে চিন্তা করে। সুমল ভাবতে থাকে, আর ভাবতে ভাবতেই জয়শলমীরের রাজা রাওল কেহ্রের কথা মনে পড়ে। অভিষেকের সময় তাকে জয়শলমীরের পাশাপাশি লোদ্রভার রাজাও বলা হয়েছিল। ওর মাথায় বুদ্ধি খেলে। দেখা যাক প্রয়োগ করে। তখনই সে মা ও মুমলকে একদিনের মধ্যেই মুমলের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে বলে। ওদের মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,—তুই কোথায় যাচ্ছিস বাবা?

সুমল রহস্যঘন হেসে বলে,—জয়শলমীরের রাজার কাছে, সেখানে কাজ না হলে অন্যকোথাও—উপায় তো আর নেই!

সুমল দলবল সহ জয়শলমীরের পথে রওনা দেয়। মহারাণী ভাবে, ভাগ্যিস্ সুমল কাছে ছিল, নাহলে তো আজ মুমলের টুকরো টুকরো হয়ে যেত। মহারাজের চন্ডরাগ সবাই জানে। এমনিতে তিনি মাটির মানুষ, কিন্তু ভীষণ একগুঁয়ে আর জেদী। একবার যা মনস্থ করে সেই সিদ্ধান্ত থেকে আর সরে আসে না। দাসীদের ডেকে রক্তাক্ত বিড়ালটির মৃতদেহ সরাতে বলে। কিন্তু তখন অবাক হয়ে দেখে আর একটি বিড়াল নির্ভয়ে ওর শরীর থেকে রক্ত চাটছে। মহারাণী ভাবে, মানুষও কি পারবে এমনি মৃত আরেকজনের রক্ত খেতে? অবশ্য মহাভারতের গল্পে শোনা যায় ভীমসেন দুঃশাসনের বুক চিরে অঞ্জলি ভরে রক্ত পান করেছিল তারপর সেই রক্ত নিয়ে গিয়ে দ্রৌপদীর চুলে মাখিয়ে ওর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। রাজাও কি আজ মুমলের মাথা কেটে তার রক্ত পান করতেন?

মহারাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুমলকে নিয়ে ওর ঘরে ঢুকে প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্র গোছাতে শুরু করে। এবং একরাত দেড়দিন ধরে গোছাতে থাকে।

দুদিন পরই সুমল ওকে এই পরিত্যক্ত মহলে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, এটা একটা পোড়ো রাজবাড়িই তো ছিল! প্রায় ছশো বছর আগে এই লোদ্রভাতে রাজধানী স্থাপন করে দেবরাজ। এই বাড়িরই একটা ফলকে লেখা আছে ৬০৬ বিক্রম সন। সে কতদিনের জন্য রাজা হয়েছিল, তারপর আর কে কে এখানে রাজত্ব করেছে কিছুই জানতে পারেনি মুমল। বোনও জানে না। শুধু এটুকু জানে যে ১২০৪ বিক্রম সনে এখানকার তরুণ রাজা রাওল ভোজদেবের সঙ্গে দিল্লীর সুলতান শাহবুদ্দীন ঘোরীর এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সুলতানের ১২ হাজার সৈন্য আর ভোজদেবের পাঁচ হাজার সৈন্য মারা যায়। ২২ জন রাণী

এই মহলের দেবীমন্দিরের সামনে তৈরি অগ্নিকুণ্ডে জহরব্রত করে। ভোজদেব নিজেও এই যুদ্ধে মারা যায়। কতিপয় সৈন্য, অমাত্যবর্গ ও কয়েকটি শিশুকে নিয়ে ভোজদেবের জ্যাঠামশাই রাজা জওশল রাওল দীর্ঘদিন এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। অবশেষে ১২১২ বিক্রম সনের শ্রাবণ মাসের ২২ তারিখ তিনি এই লোদ্রভার থেকে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে একটা বিশাল মরুদ্যানে নিজের রাজধানী স্থাপন করে শহরের নামকরণ করে জয়শলমীর। সেই থেকে এই মহল পরিত্যক্ত।

গতবছর বাবা ওকে নির্বাসন দিলে সুমল চানক্যসম কূটনৈতিক মারপ্যাচের মাধ্যমে বর্তমান রাজাকে পটিয়ে পাটিয়ে মুমলের নামে এই মহলের দানপত্র লিখিয়ে নিয়েছে। তারপর দুই বোনে মাথা খাটিয়ে এই মহল ও তার চারপাশকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছে নানারকম জাদুজাল বিছিয়ে!

—হ্যাঁ জাদুজাল জাদুজাল! হঠাৎ পরিতোষকে থামিয়ে দিয়ে নাসিম যুগলজীকে জিজ্ঞেস করে,—এই জাদুজালের ব্যাপারটা কি সত্যি?

যুগলজী বলে,—হতে পারে! দিল্লী, আগ্রা ও জয়পুরে 'যন্তর মন্তর' তৈরি করা জাদুঘর শিল্পীরা যে ঘরানার, সুমলের কারিগরী বিদ্যাও সেই একই ঘরানার। আর তার বিচক্ষণতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার দুই নবরত্নের আত্মীয়া, একের পূত্রবধূ, অন্যের ভার্যা বিদূষী খনার মতন। শুধু সময়ের ব্যাপারটা এখনও পুরোপুরি মিলছে না। একটু সন্দেহ থেকে যাচ্ছে বটে। আপাততঃ কল্পনা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

পরিতোষ ঘড়ি দেখে। এখন দেড়টা বাজে। তাড়াতাড়ি গল্পটা শেষ করতে হবে। সে এদের আলোচনায় অংশ না নিয়ে পড়তে শুরু করে,—

মুমল তার বোনকে যত দেখে ততই অবাক হয়। বোন এতকিছু জানে! ইতিমধ্যে সুমল ঢাক পিটিয়ে দিকে দিকে প্রচার করে দিয়েছে—প্রথম যে পুরুষ এইসব জাদুজাল ছিন্নভিন্ন করে মুমলের কাছে পৌঁছুবে, মুমল তাকেই বিয়ে করবে। কিছুদিনের মধ্যেই দূরদূরান্ত থেকে রাজকুমাররা আসতে থাকে। কিন্তু কেউই মুমল অব্দি পৌঁছুতে পারে না। নানা জাদুজালে আটকে পড়া রাজকুমারদের কাছ থেকে প্রচুর ধনরাশি ও অলংকার নিয়ে তবেই সুমল ওদেরকে মুক্তি দিয়েছে। ঐ অর্থের অর্ধেক দিয়ে সুমল পিতার রাজকোষ ভরপাই করে আর বাকি অর্ধেক জাদুজাল সংরক্ষণে, কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা আর দাসীদের সুখসুবিধার জন্যে খরচ করে। দূরদূরান্ত থেকে সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞা, বাদ্যযন্ত্র পারদর্শিনীদের জোগাড় করে এনেছে সে।

কিন্তু মহেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ের পর সুমল আর আসেনি। মুমল ভাবে, আদরের বোনটি হয়তো জানেই না রাজপুত বীর রাণা মহেন্দ্র সুমলের তৈরি তিলিস্মকে ছত্রখান করে মুমলকে বিয়ে করেছে। নিশ্চয়ই জানে না। মীরপুর মাথেলা তো আর কম দূর নয়। খবর পেলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে সেই মুহূর্তেই ছুটতে ছুটতে চলে আসবে সে! আজই রাণা মহেন্দ্রকে বলতে হবে তাদের বিয়ের খবর মীরপুর মাথেলায় জানানোর জন্যে দূত পাঠাতে।

সন্ধ্যা হতেই মহলের ছাদে উঠে দূর আকাশে একা দোকা নক্ষত্রের জেগে ওঠা দেখতে দেখতে ক্রমশঃ সমস্ত আকাশ তারায় ভরে ওঠে। মুমল ছাদে লাগানো নক্ষত্রবীক্ষণ যন্ত্রটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা একটা করে তারা দেখতে থাকে। সুমল ওকে অনেক তারা চিনিয়েছে,—ধ্রুব, অরুন্ধতী, আদ্রা, পুলস্ত .....। স্থির আলো সম্বলিত তারাগুলি যে গ্রহ আর মিটিমিটি তারাগুলি যে নক্ষত্র তাও সুমলের কাছ থেকে জানা। এই যন্ত্র সুমল নিজে বানিয়েছে। বণিকদের হাতে নানা দেশ থেকে নানাহ্ সরঞ্জাম জোগাড় করে এনে নিজের মতন করে বানিয়েছে। আকাশের তারাগুলিকে সামান্য বড় আর সামান্য কাছের লাগে বলেই এত পরিশ্রম আর অর্থব্যয়। মুমলের মনে হয় মানুষের মতন আকাশভরা সূর্যতারারাও ভীষণরকম একা। তাই ওরা দাউদাউ জ্বলছে অনবরত। এরকম আবোলতাবোল কতকিছু ভাবে মুমল। ভাবতেই থাকে। একা সময়ে ভাবনা ছাড়া বিরহিনীর আর কি-ই বা করার থাকে!

তখনই দূর থেকে ঘোড়ার শব্দ শুনে চমকে ওঠে সে। কান পেতে একনিষ্ঠ হয়ে শোনে। রাণা মহেন্দ্র কি আজ সেই প্রথম ও দ্বিতীয়বারের মতন ঘোড়ায় চড়ে আসছেন? আনন্দে উথলে ওঠে মন। নক্ষত্রবীক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোন্‌টা গ্রহ আর কোন্‌টা নক্ষত্র আলাদা করার খেলা থামিয়ে যন্ত্রটাকে পশমী ঢাকনা দিয়ে আবৃত করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সোজা স্নানঘরে ঢুকে পড়ে। ছিঃ ছিঃ - অতীতের সাতকাহন ভাবতে ভাবতেই রাতের এক প্রহর পেরিয়ে গেছে—অন্যদিন এতক্ষণে তার গা-ধোয়া ও প্রসাধন হয়ে যায়। আজ তাই দাসীরা তাড়াতাড়ি হলুদ চন্দনের লেপ লাগাতে শুরু করে মুমলের সারা শরীরে। অন্যদিন এই প্রক্রিয়াই চলে অনেকক্ষণ। মুমল কখনো ওদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে আবার কখনো চোখ বন্ধ করে লেপপ্রক্রিয়াকে উপভোগ করে। কিন্তু আজ মুমল তাড়া দেয় তাই তাড়াতাড়িই ওরা ওকে স্নান ঘরে নিয়ে গিয়ে ভালমতন গা ধুইয়ে দেয়। সন্ধ্যায় মাথা ভেজায় না মুমল। তাহলে আজানুলম্বিত কেশরাশি আর শুকাতে চায় না। সেজন্যে কেশ পরিচর্যা ও মাথা ধোয়ার ব্যাপারটা ওর দাসীরা সকালেই স্নানের আগে পরে করে নেয়।

—'তাড়াতাড়ি কর তোরা—!'

প্রৌঢ়া দাসী যশোবাঈ বলে,—'এত ছটফট করো না বাছা, তাহলে মোছাতে গিয়ে সোনার অঙ্গের ছড় উঠে যেতে পারে!

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই 'দিদি, দিদি' চীৎকার করে স্নানঘরে ঢুকে পড়ে সুমল। দাসীরা চমকে ওঠে। মুমলকে তখন সবে অন্তর্বাস পরানো হয়েছে। সুমল জিজ্ঞেস করে, —'এসব কী শুনছি দিদি, কোথায় সেই বীরপুরুষ?'

মুমল অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে,—কোথায় শুনলি তুই?

সুমল চোখ পিটপিট করে মজা করে বলে,—শুনেছি, বল তো কে বলতে পারে আমাকে? ইশ, কী দারুণ দেখতে লাগছে তোকে, তিনি কোথায়?'

মুমল বড় বড় চোখে ওর একবার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে,—কে, কার কথা

বলছিস্?

সুমল বলে,—আবার কে? সেই অসাধারণ বীর!

মুমল হা হয়ে যায়,—তুই কি করে জানলি সে অসাধারণ বীর?

—বারে, আমার তৈরি সমস্ত তিলিস্ম যিনি ভেদ করেছেন তাকে তো অসাধারণ বলতেই হবে? আমাকে নাতির বলেছে।

মুমল লজ্জায় চোখ নামায়। আবার চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলে। ওর দুই গালে রক্তসঞ্চার হলে চেহারাটা টকটকে কাশ্মিরী সেবের মতন হয়ে পড়ে আবার পরমুহূর্তেই ফ্যাকাশে। ওকে লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে দেখে যশোবাঈ বলে, ঠিকই শুনেছো বেটি, রাণা মহেন্দ্র এই এলো বলে!

একথা শুনে আনন্দে আত্মহারা সুমল গিয়ে দিদিকে জড়িয়ে ধরে দুই গালে চুমু খায়। আর তারপর ভালমতন হাত মুখ ধুয়ে এসে মুমলের পাশে বসে খুটিয়ে সব কথা শুনতে থাকে।

মুমলও বোনকে পেয়ে দারুণ খুশী। দাসীদের পরিচর্যায় রূপসজ্জা একরকম আর সুমলের হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে তিলোত্তমা হয়ে ওঠা অন্যরকম। সাজগোজের আগেই অবশ্য ওরা হাল্কা ফলমূল খেয়ে নিয়েছে। সাজগোজ হয়ে যেতেই বিছানায় বসে সুমল ওকে কত কথা জিজ্ঞেস করে, মুমল ওকে জবাব দেয়। কিন্তু ওর প্রশ্নের যথাযথ উত্তরগুলি বলতে পারে না। মুমলের এ যাবৎ ধারণা ছিল যে এই জগৎ ও জীবনের এমন কোন গোপন কথা, এমন কোন রহস্য নেই যা বোনের কাছে বলা যাবে না। কিন্তু আজ অনুভব করে,—না, সুমল ওর যত প্রিয়ই হোক না কেন, রাণা মহেন্দ্রর সঙ্গে একান্ত গোপন মুহূর্তগুলিকে সে বলে উঠতে পারছে না, বলতে মনও চাইছে না, একটা আজব কুণ্ঠার সঙ্গে নিজের অজান্তেই কিছুটা রহস্যময়তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

সুমলও বোধহয় এই ব্যবধান অনুভব করছিলো। এই ছুঁয়েও না ছুঁতে পারার রহস্যময়তা ওকে আরো আগ্রহী এবং অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। দিদি এত লুকাচ্ছে কেন? রাণা এত রাতে কোথা থেকে আসবে? রাণা ভোরের আগেই আবার কোথায় চলে যায়? কেন যায়? এ ধরণের স্থূল প্রশ্নাবলীরও সঠিক জবাব না পেয়ে সুমল মনে মনে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। সে ভাবে, আমার কর্তব্য শেষ! কাল সকালে এখান থেকে চলে গিয়ে আর ফিরব না! সুমলকে অন্যমনস্ক হতে দেখে মুমলও বারবার আনমনা হয়ে ভাবে—আজ রাণার আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

মুমলের উৎকণ্ঠা একসময় সুমলের চোখেও ধরা পড়ে। সে বলে,—না দিদি, এমনি দুশ্চিন্তা করলে শরীর খারাপ হবে। রাণা হয়তো এখুনি চলে আসবে!

দশ

আমাদের সাজসজ্জা শিথিল হয়ে আসছে/আমাদের সুগন্ধের সঙ্গে মিশছে অবক্ষয়।/অথচ বাসর কোথাও আছে/সেখানে কাজল চোখ কাঁপছে আমাদেরই প্রতীক্ষায় —নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পরিতোষ এই ফিল্মের অফিসিয়াল স্ক্রিপ্ট রাইটার নয়। কিন্তু ওরই উৎসাহে নাসিমসাহেব ও যুগলজী ওকে এই সুযোগ দিয়েছে। এজন্যে সে ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। সর্বাণীর কাছেও কৃতজ্ঞ। নিজের ডাক্তারী পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে যুগলজীর নানা গবেষণা তথ্য থেকে তৈরি করা খসড়া স্ক্রিপ্ট এর ভুল শুধরাতে সে ওকে সাহায্য করেছে. আর 'অপারেশন বসন্তকুমার' এর সফল রূপায়নে ওর ভূমিকা ছিল যুগপৎ অভিনেত্রী ও দলনেত্রীর। এই সুদূর প্রবাসে পরিতোষকে এমনভাবে সাহায্য করে সারাজীবনের জন্য ঋণী করে ফেলেছে সর্বাণী।

সেদিন সকালেই পরিতোষ জানতে পারে রাতের ট্রেনে বসন্ত কুমারের বাড়ি যাওয়ার কথা। বসন্ত কুমার সাহারানপুর প্রবাসী বাঙালি। নিজের নামের উচ্চারণ করে 'বসনৎকুমার বিশ্বাস'। ফর্সা সুন্দর চেহারায় চোখদুটি কেমন কুতকুতে বেমানান। এমনিতে লম্বা চওড়া, এয়ারফোর্সে ভাল চাকরি করে—কিন্তু ফুটানিও প্রচুর। ওভারস্মার্ট বাতেলাবাজ মানুষ! তার শ্বশুরবাড়িও সাহারানপুরে। সেদিন রাত এগারোটার ট্রেনে তার রিজার্ভেশান। পরিতোষ সুব্রত নন্দীর কাছে খবরটা জেনেছে। অমৃতের চায়ের দোকানে বসে সুব্রত পরিতোষকে বসন্ত কুমারের মায়ের অসুস্থতা এবং ছুটি যাওয়ার কথা জানায়। মাসের শেষ বলে সে নাকি সুব্রতর কাছ থেকে দুহাজার টাকা ধার করেছে। শুনেই আঁতকে ওঠে পরিতোষ, --আরে জিজ্ঞেস করে ধার দেবেন তো মশাই! ছ'মাস আগে বৌদির ডেলিভারির দোহাই দিয়ে আমার কাছ থেকে এগারোশো টাকা নিয়েছিল, এখনো দেয়নি!

—কই জানি না তো! সুব্রত ভ্রূ কুঁচকায়,—একথা জানলে—

পরিতোষ বলে,—সবাই জানে! আমি আপনাদের কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছেও রিপোর্ট করেছিলাম, কিন্তু কোন প্রমাণ না থাকায় তিনি কোনরকম সাহায্য করতে পারবেন না বলেছেন, বসন্তকুমার এখন সবার কাছে কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছে! আমি নাকি লেডি কিলার!'

হঠাৎ দমকা বাতাসে চোখেমুখে বালির ঝাপটা লাগে। সুব্রত হেসে বলে,—'আমাকে বলেছে, আপনি নাকি ওর স্ত্রীকেও প্রোপোজ করেছিলেন? আসামের মানুষজনই 'নাকি এরকম?' পরিতোষ তাড়াতাড়ি জগ থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ঝাপটা দেয়। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে,—'ছিঃ! ভদ্রমহিলা সবার সঙ্গে হেসে কথা বলেন, স্পষ্ট কথা বলেন, বিশ্বাসের জুয়া খেলা আর মদখাওয়া নিয়ে অতিষ্ঠ, আমি ওর বাড়িতে টাকা ফেরৎ চাইতে গেলে তিনি উল্টো আমাকেই ধার দেওয়ার জন্য বকেন! কাল আপনিও যখন টাকা চাইতে যাবেন ; আপনাকেও বকবে! আর ঐ যাওয়ার সূত্র ধরে

লোকটা তখন আপনার নামেও কুৎসা রটাবে, বলবে কলকাতার লোকেরা এরকমই। বউকে তো অবিশ্বাস করেই, তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতন একটা চাল চালে ও, শয়তানের তো আর ছলের অভাব হয় না!'

পরিতোষ রুমালের খুঁট দিয়ে চোখের কোণা থেকে বালি পরিষ্কার করে। সুব্রত ভ্রূ নাচিয়ে বলে,—কিন্তু দাদা, আমিও সেদিন সোজাতী গেটের পথে আপনাকে একটি মেয়ের সঙ্গে স্কুটারে দেখেছি, মেয়েটি নীল জিন্‌স আর গোলাপী টি শার্ট পরে বসেছিল ; প্রথমে ভাবলাম চোখের ভুল, পরিতোষদার তো আর স্কুটার নেই! কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে স্টেডিয়ামের কাছে পৌঁছুতেই দেখি আপনারা মন্ডোর গার্ডেনের দিক থেকে ফিরছেন! তখন মেয়েটি চালাচ্ছিল আর আপনি পেছনে বসে!

—অ! আপনি ঠিকই দেখেছেন, মেয়েটি মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী—সর্বাণী—ও-ই আমাকে স্কুটার চালানো শিখিয়েছে!

—তাই নাকি! আপনি ভাগ্যবান—দারুণ বান্ধবী পেয়েছেন—আমাদের কি আর এমন জুটবে!

পরিতোষ হেসে বলে,—জোটালেই জুটবে! বাট ফর ইওর কাইন্ড ইন্‌ফরমেশান আমি কিন্তু ওকে জোটাতে যাইনি, সেদিন কাকতালীয়ভাবেই 'জ্বলতে দীপ'এর অফিসে পরিচয় হয়েছিল! আমি সেখানে 'পার্ট টাইম' করি। কাউকে বলবেন না যেন। সেদিন সেখানে মেয়েটি অফসেটে কলেজ ম্যাগাজিন ছাপাতে এসেছিল। যুগলজী আমার উপরেই ওদের ম্যাগাজিনের ইলাস্ট্রেশান ও পেজ মেকিং এর দায়িত্ব দেয়। তখনই কথায় কথায় জানতে পারে যে আমি বাঙালি। সর্বাণীর বাবাও বাঙালি আর মা পাঞ্জাবী। বাবা সার্জিক্যাল স্পেশালিস্ট আর মা গাইনোকলজিস্ট, দুজনেই মেডিক্যাল কলেজে পড়ান। ওরা সবাই ভীষণ মিশুকে।

ওদের অ্যানুয়াল ফাংশানের দিন ঐ ম্যাগাজিন প্রকাশ উপলক্ষে নিতে এসেছিল সর্বাণী। তখনই ও আমার হাতে চাবি দিয়ে স্কুটার চালাতে বলে। আমি বিনীতভাবে নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে বলি, 'আমার বাইসাইকেল রয়েছে, তোমরা যাও, আমি পেছন পেছন আসছি!' কিন্তু সর্বাণী নাছোড়বান্দা—সে দেরী হওয়ার দোহাই দিয়ে আমাকে পেছনে বসতে বলে। সেদিনই ফেরার সময় সে আমাকে স্কুটার শেখানোর প্রস্তাব রাখে। প্রথমে ইতস্তত করলেও না জানি কীভাবে পরে রাজি হয়ে যাই—আর দুদিনে শিখেও যাই—সুব্রত জিহ্বা নাচিয়ে চচ চচ শব্দ করে বলে,—আপনি একটু বোকাও বটে, এরকম ট্রেনার পেলে দাদা—আমি তো একমাস লাগিয়ে শিখতাম!

পরিতোষের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। খবরটা জানার পর থেকেই একটা তাড়া অনুভব করছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে সাইকেলে চাপতে চাপতে বলে,—সবাই তো আর একরকম হয় না ; আমি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিশ্বাস করি, সর্বাণী আমার বন্ধুমাত্র!

সুব্রতও উঠে দাঁড়িয়ে অর্থপূর্ণ হেসে বলে,—আর কিছু নয়?

পরিতোষ হেসে জবাব দেয়,—এখন অব্দি আর কিছু নয়, —আমি জোর করে কিছু ঘটানোর পক্ষে নেই, প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা পাই তাহাই শুধু গ্রহণ করি!

সুব্রত বলে,—দেখবো!

পরিতোষ প্যাডেল চেপে এগিয়ে যায়। তারপর কী মনে পড়তে আবার অমৃতের দোকানে ঘুরে আসে। ওকে ঘুরতে দেখে সুব্রত আবার এগিয়ে আসে,—কী ব্যাপার?

—আরে ভাই, দু'বোতল রামের দরকার ছিল!

—দু'বোতল? কী ব্যাপার পরিতোষদা, আপনাকে তো কখনো ড্রিংক করতে দেখিনি—

—এখনো করিনা! পরিতোষ ঢোঁক গিলে বলে,—কিন্তু নিশ্চিত থাকুন—আপনার কোটার রাম তুলে আমি ব্যবসা করবো না! বিশেষ প্রয়োজন বলেই—

—ছিঃ ছিঃ সে কী কথা! ডোন্ট মাইন্ড পরিতোষদা, আমি এরকম মীন করিনি, চলুন আমার বোতল দুটি এখনো সীল করাই রয়েছে।

সুব্রতও এসে সাইকেলে চাপে। যোধপুরের পথে তখন ঝড়ো হওয়া বইছে, পথের দুপাশে বাবুল গাছের পাতাগুলি সশব্দে নড়ছে। পরিতোষ আকাশে তাকিয়ে দেখে একখণ্ড বিশাল কিউমুলাস মেঘ। অবশ্য রাজস্থানের আকাশে কোন মেঘকেই ওর কাছে ভয়ংকর লাগে না। সবসময় একই রকম নীল আকাশ অথবা কখনো পথ হারিয়ে ঢুকে পড়া কোন সিরাস কিম্বা সিরোস্ট্যাটাস জাতীয় মেঘকেই ধীরে ধীরে আকারে ছোট হ'তে হ'তে একসময় শূন্যে মিলিয়ে যেতে দেখে সে। এইরকম সম্ভাবনাহীন মেঘেরা ওর মনে বিশেষ কোন অভিঘাত সৃষ্টি করে না।

সুব্রতকে চুয়াল্লিশ টাকা দিয়ে বোতল দুটি খবরের কাগজে মুড়ে আলগোছে সাইডব্যাগে ঢোকায় পরিতোষ। সুব্রত বলে, চার টাকা বেশী দিলেন যে!

পরিতোষ বলে,—ওটা থাক, পরে চা খাওয়াবেন!

সুব্রত বলে,—না, তা হয় না, চারটাকা ফেরৎ নিন, আপনি বরঞ্চ একসময় চা খাইয়ে দেবেন!

এই দৃঢ়তা ওর ভাল লাগে। চারিত্রিক দৃঢ়তা না থাকলে ছেলেরা আবার পুরুষ হয় নাকি! অবশ্য শুধু পুরুষ কেন, নারীপুরুষ নির্বিশেষে চারিত্রিক দৃঢ়তাই মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে বলে ওর বিশ্বাস। পরিতোষের ভেতর থেকে একটা প্রস্তাব বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু কী ভেবে সে আর কিছু বলে না!

সুব্রতও কিছু অনুমান করে জিজ্ঞেস করে,—কিছু বলবেন?

সুব্রত কী ফেস রিডিং করতে পারে, সুব্রত কি জানে পরিতোষ এখন ভাবছে—'বৃক্ষ তোমার নাম কি?—ফলেই পরিচয়!' কিম্বা 'কথা কম কাজ বেশী' জাতীয় চিন্তা। তা একান্ত গোপনে কোন অসামাজিক জিঘাংসাজাত পরিণতির দিকে এগুচ্ছে! না, এতক্ষণে পরিতোষ বুঝতে পারে সুব্রত কখনোই ফেস রিডিং জাতীয় কিছুই জানে না। জানলে কি আর বসন্ত বিশ্বাসের খপ্পরে পড়ে? সুব্রত এবার গলার আওয়াজ একটু উঁচু করে বলে,

—কিছু বলবেন?

পরিতোষ বলে,—না থাক্। আজ আসি, এরপর থেকে কাউকে টাকাপয়সা ধার দিতে সাবধান, নাহলে আমার মতন ঠকবেন!

সুব্রত ঘাড়নেড়ে অস্ফুট স্বরে বলে,—ঠিক আছে!

পরিতোষ আর দেরী করে না। যোধপুরের পথে তখন হাওয়ার দাপট। সে পকেট থেকে সানগ্লাসটা বের করে পরে নেয়। তারপর জোরে প্যাডেল চাপে। এতক্ষণে কিউমুলাস মেঘটা একটা বিশাল ভাসমান স্তম্ভের মতন আকারে বাড়ছে। জোর বাতাসে দুপাশের সারি সারি ইউক্যালিপটাস ও বাবুলের পাতারা ডালপালাসহ বাতাসের গতির দিকে বেঁকে বারবার ঝুঁকে পড়ছে। পরিতোষের গালে বালির ঝাপটা লাগছে। মাঝেমধ্যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। একটা হাম্প পার হতেই সাইড ব্যাগে বোতল দুটি ঠোকাঠুকির শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি পথের কিনারে নেমে পড়ে সে। সাইডব্যাগের চেন খুলে দেখে না বোতল দুটি ঠিক আছে! ও তখন পথের কিনার থেকে কিছু ইউক্যালিপ্‌টাসের শুকনো পাতা আর বালি ভরে নেয়। তার উপর খবরের কাগজ মোড়া বোতল দুটি শুইয়ে উপরে আরো কিছু শুকনো পাতা ভরে ব্যাগটাকে কাঁধে নেয়। ওরেব্বাস, এ যে বিশাল ভারী হয়ে উঠেছে। সে আর কী করে?

পরিতোষ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস পেরিয়ে পালি রোড ধরে এগুতে থাকে। পাশ দিয়ে ইন্দিরা নহর প্রকল্পের পাথর ও সিমেন্ট বোঝাই লরিগুলো রাশি রাশি সোনালি বালির গায়ে গমকে গমকে মিশিয়ে দিচ্ছে কালো ধোঁয়া। পরিতোষ নাকে রুমাল চেপে প্যাডেল ঘোরায়। ভাগ্যিস, বাতাসের গতির বিপরীতে সাইকেল চালাতে হচ্ছে না। নাহলে আরো কষ্ট হতো।

নেহেরু পার্কের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ বাতাস থেমে যায়। পার্ক এখন ফাঁকা। শুধু কয়েকটা পথশিশু ওখানে খেলা করছে! পেখম মেলে প্রেয়সীর দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে একটি ময়ূর। ময়ূরটি ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে! ওদের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি গাধা! চওড়া রাজপথের দুপাশে বাড়িগুলি সূর্যশহরের আকাশে হঠাৎ চলে এসে ফুলে ফেঁপে ওঠা কিউমুলাস মেঘে প্রতিফলিত সূর্যের বিরল প্রাকৃতিক আভায় ঝকঝক করছে। এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় মরু অনুসন্ধানশালা ও যোধপুর নগর নিগমের কল্যাণে প্রচুর গাছগাছালি। বেশিরভাগই অবশ্য বাবুল আর খেঁজুর। এছাড়া এ অঞ্চলে রয়েছে সারি সারি 'কিন্নু' আর 'আপেল বের' এর গাছ। সর্দারপুড়ায় তো প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে গাছদুটি রয়েছে। কেন্দ্রীয় মরু অনুসন্ধানশালার এখানকার গবেষণাগারেই এগুলির জন্ম। কমলালেবু ও মৌসুম্বীর মিশ্রণে তৈরী কিন্নু আর আপেল ও কুলের মিশ্রণে তৈরী 'আপেল বের'। এই হাইব্রিড ফলদুটি এখন রাজস্থানে প্রচুর ফলে।

সর্দারপুড়ায় ঢুকতেই বেলীফুলের গন্ধ পায় পরিতোষ। আর বিদ্যুৎ চমকায়। কিউমুলাস মেঘটি এখন কিউমুলাস নিম্বাসে পরিণত হয়েছে। সে আরো দ্রুত প্যাডেল ঘোরায়। কিন্তু

সর্বাণীদের রাস্তায় ঢোকার আগেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে। আকাশফাটা মেঘের গর্জন মরুশহরে আছড়ে পড়ে। মুষলধারে বৃষ্টি নামলে পরিতোষ সানগ্লাস খুলে পকেটে রাখে। তারপর গেট ঠেলে ঢোকে। সর্বাণীদের শেডের নিচে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রাখে। ঝুল বারান্দায় এসে ওঠে। গেট দিয়ে ঢোকার সময়ই কলিং বেল টিপেছিল পরিতোষ। দরজা খুলে ওকে দেখে এক গাল হেসে বলে সিদ্ধার্থ,—'এতেবারেই ভিদে দেথ দেথথি! দালাও তোয়ালেতা আনি!'

পরিতোষ বলে,—'পাঁচমিনিট দেরি হয়ে গেল!'

সিদ্ধার্থ বলে,—'এতী? তুমি আথড়ে পড়েথিলে নাতি? দামাতা তাঁদায় ভিদে দেথে!'

পরিতোষ তাকিয়ে দেখে ওর সাদা শার্ট ও প্যান্টে সাইডব্যাগ ভিজে ভেতর থেকে বালি ধুয়ে পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে আবার লনে নেমে যায়। তারপর গার্ডেন পাইপের ছিপি খুলে জামা ও প্যান্টে জল দিয়ে উপর থেকে বালি ও নোংরা ধুয়ে নেয়। তারপর সাইডব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া বোতলদুটি ঘাসের উপর রেখে ব্যাগটা একেবারে দেওয়ালের কাছে বালির টালের উপর নিয়ে ফেলে। তারপর ব্যাগটা উল্টে গার্ডেন পাইপের জল দিয়ে সেটাও ধুয়ে নেয়। রামের বোতল দুটি আবার ব্যাগে পুরে গার্ডেন পাইপ বন্ধ করে। ভিজে নেতিয়ে যাওয়া কাগজের মোড়কগুলি খুলে আবার দেওয়ালের কাছে রাখা ডাস্টবিনে ফেলে এসে দেখে সিদ্ধার্থ তখনো একনাগাড়ে হেসে যাচ্ছে আকর্ণ—স্বর্গীয় হাসি। ও কাছে আসতেই বলে,—'তী এনেথ, মদ? মদ তে থাবে দো?'

পরিতোষ বলে—কেউ না, একজনকে দিতে হবে তো তাই এনেছি!'

সিদ্ধার্থ বলে,—'অ, আমাদের এথান থেতে তুমি অন্যথানে দাবে, দাঁলাও তোয়ালেতা আনি!'

সিদ্ধার্থ থপ থপ করে দুলতে দুলতে ঘরে ঢোকে। দুইপায়ে ক্যালিপার শু লাগানোর পর থেকে এখন ক্র্যাচ ছাড়াই শুধু একটা লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে পারে ও। ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থর সেরিব্রাল পালসি। সর্বাণীর জন্মের বছরখানেক পর ওর ঠাকুর্দা মারা যান। তারপরই ঠাকুমা ও কাকীদের সঙ্গে সর্বাণীর মায়ের বিরোধ চরমে ওঠে। শাশুড়ি ও বাঙালি বধূরা এমনি আড়ালে আবডালে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেও এই পাঞ্জাবি ললনার বিরুদ্ধে সবাই একজোট হয়। এমনকি সর্বাণীর বাবাও নাকি না জেনে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছিল। ফলে হতাশা, ক্ষোভ ও অভিমান মিলেমিশে এক অনিবার্য ডিপ্রেশনের সৃষ্টি। গর্ভবতী অবস্থাতেও তাকে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে হয়েছে। একবার তো পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল। তখনই সর্বাণীর বাবা বাড়ি ছেড়ে তাঁর কর্মস্থল যোধপুরেই সেট্‌ল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে চলে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই লোন নিয়ে এই বাড়িটা তৈরী করায়। সিদ্ধার্থর জন্মও এখানেই হয়েছে। কিন্তু জন্মের ছ'মাসের মাথায় ওর সেরিব্রাল পালসি ধরা পড়ে। চোখ ট্যারা হতে শুরু করে, পায়ের পাতা চ্যাপ্টাই থেকে যায়। যত বড় হতে থাকে এ সব লক্ষণগুলি আরো প্রকট

হয়। চিকিৎসক দম্পতি ওকে নিয়ে তখন দিল্লির স্পাশটিক সোসাইটিতে দেখায়। তারপর এই সতের বছর ধরে প্রতিমাসে গিয়ে গিয়ে ওখানকার চিকিৎসক ও প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানেই সিদ্ধার্থ এখন অনেক সুস্থ ও সাবলীল। এখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। সর্বাণীর মতন ইংরেজী বাংলা হিন্দী ও পাঞ্জাবী পড়তে লিখতে ও বলতে পারে। শুধু উচ্চারণে কিছু জড়তা রয়ে গেছে—এই যাঃ।

সিদ্ধার্থর হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে মাথা ও গা মোছে পরিতোষ। সিদ্ধার্থ একটা ধোয়া পায়জামা আর টি শার্ট ও নিয়ে আসে। পরিতোষ দ্রুত পোশাক পাল্টে নেয়। তারপর ঘরে ঢুকে ওদের পেছনের বারান্দায় টাঙানো তারে ভেজা জামাকাপড়গুলি নেড়ে দেয়। তারপর গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে সাদা পায়জামা ও নীল টি শার্ট পরে ওকে ভালই লাগছে। পায়জামাটা নিশ্চয়ই কাকাবাবুর—কিন্তু টি শার্টটা কার? একথা ভাবতেই আশ্চর্য সুবাস ওকে ঘিরে ধরে। এক অজানা অনুভূতি সমস্ত শরীরে খেলা করে।

—বাহ্! আমার টি শার্টটা পরে দারুণ লাগছে তো!

ধোঁয়াওঠা চায়ের কাপ ও নোনতা বিস্কিটের প্লেট সাজানো ট্রে হাতে সর্বাণীকে আয়নায় দেখতে পায়। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলে। সর্বাণী একটা ফুল ফুল ঢোলা পায়জামার উপর লাল রঙের টি শার্ট পরেছে। দুই গালে তিনটি ব্রণ। এই ব্রণগুলি নূতন বেরিয়েছে বুঝি। পরিতোষ আগে দেখেনি। একটা তো বেশ ফুলে উঠেছে। এরকম সময়ে যে কারো চেহারা বিগড়ে যায়। কিন্তু পরিতোষ অবাক হয়ে লক্ষ্য করে এতে সর্বাণীর সৌন্দর্য যেন বেড়ে গেছে। অথবা হলুদের উপর লাল নীল ফুল ফুল পায়জামার সঙ্গে টকটকে লাল টি শার্ট পরেছে বলেই ওর ফর্সা চেহারায় লাল হয়ে ওঠা ব্রণগুলি ওকে একটু অন্যরকম করে তুলেছে।

ট্রেটা টি-টেবিলে রেখে সর্বাণী বলে,—কী খবর? আজ অসময়ে, আমার কলেজ ছুটি জানতে নাকি?

পরিতোষ বলে, হ্যাঁ, পরশু তুমি বললে না, তবে আমি কিন্তু আড্ডা দিতে আসিনি, আজকে বিকেলের শিফ্‌টে ডিউটি আছে!

সর্বাণী কপট গম্ভীর আওয়াজে জিজ্ঞেস করে, তাহলে কেন এসেছো? কোই বাৎ হ্যায়?

পরিতোষ তখন বসন্ত কুমারের ছুটি যাওয়ার খবরটা বলে। সর্বাণী ওর দিকে নোনতা বিস্কিট এগিয়ে দেয়। পরিতোষ প্রথমে একটা বিস্কিট, তারপর এক চুমুক চা খায়। ভীষণ মিষ্টি দুধ-চা বানায় সর্বাণী। ওর মায়ের কাছে শেখা এই পাঞ্জাবী ঘরানার 'দুধ পাত্তি চা'। চা পাতা দুধের মধ্যেই ফুটিয়ে এই চা তৈরী করা হয়। সেজন্যে পরিতোষ এর সঙ্গে নোনতা বিস্কিট ভালোবাসে। সর্বাণী এই ব্যাপারটা খেয়াল রেখেছে দেখে ভাল লাগে পরিতোষের। পৃথিবীতে প্রত্যেকেই সামান্য হলেও গুরুত্ব পেতে ভালবাসে। পরিতোষও এর ব্যতিক্রম নয়। সর্বাণী চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, —রামের বোতল এনেছ?

—হ্যাঁ, দুটো এনেছি!

সর্বানী বলে,—ভাল করেছো, এক বোতলেই হয়ে যাবে আশা করি, দ্বিতীয়টা রিজার্ভে রাখবো!

চায়ের কাপে আরেক চুমুক দিয়ে পরিতোষ লক্ষ্য করে সর্বাণীর চোখমুখে ব্যস্ততা বাড়ে। তার সঙ্গে ওর চেহারায় নতুন সংযোজিত ব্রণ তিনটি একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। পরিতোষ জিজ্ঞেস করে,—ব্রণগুলি কষ্ট দিচ্ছে না?

সর্বাণী বলে,—এমনিতে কোন কষ্ট নেই, ধরলে ব্যথা করে, কিন্তু গালটা কী বিচ্ছিরি ফুলেছে—চেহারাটা কেমন গোবিন্দের মায়ের মতন হয়ে উঠেছে!

পরিতোষ হেসে জিজ্ঞেস করে,—তুমি আবার 'গালফুলো গোবিন্দের মা' কোত্থেকে শিখলে?

সর্বানী বলে,—কেন? একটু আগেই বাবা আমাকে 'গোবিন্দের মা' বলে ক্ষেপিয়ে গেল! আমিও বাবাকে 'গোবিন্দ' বলে ক্ষ্যাপালাম।

পরিতোষ বলে, ব্যথা যন্ত্রণা না হলে গালফোলা নিয়ে চিন্তা করে কী হবে, কিছু ট্রিটমেন্ট করাও—যদিও তোমাকে কিন্তু দারুণ কিউট লাগছে!

সর্বাণী ওর হাতে একটা ঘুষি মারে,—বদমাইশি হচ্ছে না? কিউট লাগছে আমাকে?'

পরিতোষ হেসে বলে,—কিউট বললেও রাগ? যাঃ বাবা, তাহলে ডাঃ সেনের মতন 'গোবিন্দের মা' বলতাম বুঝি?

সর্বাণী আরো ক্ষেপে গিয়ে বলে,—এত ডাঃ সেনের ঝোল টানো কেন তুমি, ডাঃ সেন কি তোমাকে জামাই করবে?

এ প্রশ্নে থতমত খেয়ে যায় পরিতোষ। তারপর সর্বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, —কি জানি বাবা, মনে মনে কে কী গোপন ইচ্ছা রাখে তা কি আমরা জানি। কারো মনের কথা বুঝতে পারার বিদ্যা আমার জানা নেই! তোমার কি মনে হয়?

সর্বাণী হেসে ফেলে। ওর চোখের দৃষ্টি পরিতোষকে অবাক করে। মনে মনে বলে, 'আমি এল ডি সি, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সামান্য বেতনভুক নিম্নপদস্থ কেরানি, তুমি একজন ভাবী চিকিৎসক—প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, আমার কাছে আকাশের চাঁদ!' তখন ঐ ঘরের টি.ভি.তে একটি রাজস্থানী লোকনৃত্য চলছে।

সর্বাণী হঠাৎ তার দুহাতের তালু পরিতোষের সামনে খুলে ধরে বলে,—'কেমন লাগছে বলতো?'

পরিতোষ দেখে মেহেন্দি। দারুণ সুন্দর কলকে আঁকা আর চারপাশে অসংখ্য লতা ও ছোট ছোট ফুল। সর্বাণীর ফর্সা হাতে দারুণ লাগছে। পরিতোষ বলে ওঠে,—এক্সেলেন্ট!

তখন সর্বাণীর চোখ চকচক করে ওঠে; আর সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে। ওর মেহেন্দি আঁকা হাতদুটি টিভির পর্দায় চলতে থাকা ভোপাভোপী নাচের তালে

তালে ওঠানামা করতে থাকে। আর সর্বাণী মন্দিরে আরতি করার মতন নেচে নেচে ওকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। অথচ সর্বাণী নাচ জানে না। সে কোনদিন নাচ শেখেনি। ভোপাভোপী নাচের তালে তালে পা ফেললেও ওদিকে সর্বানীর দৃষ্টি নেই বলে ওদের মত নাচতে পারছে না। সর্বাণী শুধু ওর দিকে তাকিয়ে ভাং খাওয়া প্রতিযোগীদের আরতি করার মতন ওকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

পরিতোষ মনে মনে ভাবে, নাচ শিখলে সর্বাণীকে ভালই লাগত। অথচ ছোটবেলা থেকেই ওর নাকি কবিতা আবৃত্তি আর বিতর্ক প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কোন একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটির প্রতি আগ্রহ ছিল না! কিন্তু সর্বাণী নাচ শিখলেও ভালোই নাচতো। ফিগারটাতো খুবই সুন্দর!

ভোপাভোপী নাচ ততক্ষণে বেশ জমে উঠেছে। সর্বাণী পরিতোষকেও নাচার জন্য টানে। পরিতোষ সামান্য আপত্তি জানালেও সর্বাণীর টানাটানিতে বাধ্য হয়ে সে-ও নাচতে শুরু করে। সে-ও কখনো নাচ শেখেনি। নাচ শেখার কোন সুযোগই ছিল না শৈশব ও কৈশোরে। দুর্গাপুজো কালীপুজো আর মহরমের নাচ ছাড়া স্কুলের মঞ্চে, পাড়ার ক্লাবের মঞ্চে মেয়েদেরকে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নাচতে দেখেছে। কিন্তু নিজে কোনদিনই নাচেনি। হ্যাঁ, একবার দূরের গ্রাম থেকে ফুটবল ম্যাচ জিতে শিল্ড মাথায় নিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত সারি সারি চা বাগানের মধ্যে দিয়ে ইলশেগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে নাচতে নাচতে নাগাঝাংকা ফিরেছিল কুড়িবাইশজন সমবয়সী কিশোর। সেই জয়োল্লাসের নাচ সে এখন ভুলে গেছে। ভোপাভোপীর ছন্দে নাচতে গিয়ে তাই পরিতোষ সর্বাণীকে ফলো করে। নাকি অজান্তেই ফলো করে কোন হিন্দী সিনেমার নায়ককে। কেননা নাচতে নাচতে ওর একটা হাত বারবার উপরে উঠে যাচ্ছিল। ও শূন্যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচছিল। নাচতে নাচতে সর্বাণী তখন ওকেই ফলো করে ওর সঙ্গে স্টেপ মেলায়। আর তখুনি পরিতোষ সিদ্ধার্থকে দেখতে পায়। সিদ্ধার্থ বৈঠকখানার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে। ভাবতেই টি. ভির নাচটি শেষ হয়ে যায়। আর সর্বাণী ওর গলা জড়িয়ে ধরে চকাস করে একটা চুমু খায়। তারপর এক অদ্ভুত চাহনিতে ওকে দেখে লাজুক হেসে ছুটে অন্যঘরে চলে যায়। পরিতোষ হতভম্ব।

আর তারপর সর্বাণী আর আসেই না। চলে যাওয়ার পর সিদ্ধার্থ হাসতে হাসতে ওর কাছে এসে বলে,—থুব থুন্দর নাত হয়েথে!

পরিতোষ বলে,—তোমার ভাল লেগেছে? দিদি খুব সুন্দর নাচে তাই না?

সিদ্ধার্থ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, -- হ্যাঁ, তুমিও থুব সুন্দর নাতো। দুদনেই ভাল নাতো!

ওর এই সরল হাসি পরিতোষের খুব ভাল লাগে। ইশ, ছেলেটা সুস্থ থাকলে এতদিনে কলেজে ভর্তি হতো! পরিতোষকে 'রাজস্থান পত্রিকা' এগিয়ে দিয়ে সে বলে,—'তুমি পড়ো, আমি এত্তু হিথি করে আথি?

পরিতোষ জানে ওর ঘনঘন হিসি পায়—সর্বাণী বলেছে, নানা মেডিসিনের সাইডআফেক্ট

হতে পারে—এমনিতে কোন রেনাল ডিজিজ নেই!'

পরিতোষ 'রাজস্থান পত্রিকা' পড়তে থাকে। সিদ্ধার্থও বাথরুম থেকে এসে ওর পাশে বসে কাগজ পড়ে। পড়তে পড়তে আটটা পৃষ্ঠা পুরো পড়ে ফেলে।

পরিতোষ সিদ্ধার্থকে বলে,—'দিদিকে ডেকে আনো তো! জরুরি কথা আছে!'

সিদ্ধার্থ বলে,—ডাতথি, আখা পরিতোছ, তুমি তি দিদিতে বিয়ে তরবে? পরিতোষ ওর কাছ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করেনি। সে কী জবাব দেবে? সিদ্ধার্থ আকর্ণ হেসে ভ্যাবলার মতন দেখছে ওকে। অপ্রস্তুত পরিতোষ ভাবে, ওর পাশে বসে দুলতে দুলতে এতক্ষণ কি সিদ্ধার্থ এই প্রশ্নের প্রস্তুতি নিচ্ছিল? দিদিকে ওর সঙ্গে নাচতে দেখার পর থেকেই কি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য ভাইটার মন উত্তাল হয়ে উঠেছিল? কী আকুল প্রশ্ন! দৃষ্টিতে কী অনাবিল আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা!

পরিতোষ কী জবাব দেবে?

সে গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—সেটাতো ভাবিনি এখনো, তুমি দিদিকে ডেকে দাও! জরুরি কথা আছে!

—আখা! ও ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ওর দিকে তাকিয়ে একবার ভ্যাবলার মতন আকর্ণ হাসে। তারপর খটখট শব্দ করে ঐ ঘরে যায়। টিভিতে তখন ঢোলা মারুনীর লোকগীত শুরু হয়েছে। পরিতোষ ভাবে, সর্বাণীকে ওর সঙ্গে এভাবে নাচতে দেখে সিদ্ধার্থের মনে কি অবচেতন যৌনকামনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে? যা সে পরিতোষের মাধ্যমে দিদির সঙ্গে ঘটিত হতে দেখতে চায়। নাকি চিরন্তন অসুরক্ষার, হীনম্মন্যতার দ্যোতনা? চিরন্তন মানুষের মূল কামনাই তো হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি, শক্তিমান হওয়া ও আগ্রাসী শক্তির সাধনা, আমি নিজেও কি এই হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত? যাতে হয়ত মানবসত্তার এইসব মূলগত আত্মপ্রকাশাঙ্ক্ষা নিহিত রয়েছে? আমি কি সর্বাণীকে আকাঙ্ক্ষা করি? নাহলে হঠাৎ এমন করে ওর সঙ্গে নাচলাম কেন?

সিদ্ধার্থ এরকম ভাবতেই পারে। ইদানীং তার শরীর নবযুবকের মতন হয়ে উঠলেও তার মনে অচেতন এতোটা ছদ্মবেশ ধারণ করেনি। শিশুমন ও উন্মাদের মন আদিম সহজ মনেরই শামিল, তাতেও যৌন-কামনার প্রভাব দেখা যায়। যদিও আমরা সবাই মনের গোপন তলায় এখনো সহজিয়া; সভ্যতার পালিশ এখনো আদিম মানুষকে মেরে ফেলতে পারেনি! কত রাতের আধো ঘুম আধো জাগরণে আমি সর্বাণীকে আদর করেছি, ওর কথা ভেবে হস্তমৈথুন করেছি। কিন্তু সিদ্ধার্থের এহেন অকপট প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সাহস এখনো অর্জন করতে পারিনি। সভ্যতার পালিশে ঢেকে রাখা হা হা করা কামনা বাসনা হীনম্মন্যতার বোতলবন্দী হয়ে আমরা অস্বস্তির কারণ। সেজন্যেই সর্বাণীকে দুষ্প্রাপ্য মনে হলেও ওর থেকে দূরে থাকতে পারি না। সর্বাণীও বোধহয় আমাকে ভাবে, আজ তো ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হলো। কিন্তু তারপরও কি আমি আর এগুতে পারবো? এ কথা ভাবতেই স্মৃতিপটে অদ্ভুতভাবে জেগে ওঠে সারি সারি চা গাছ। সামান্য উঁচু টিলার গায়ে ধাপে ধাপে চা বাগান। হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা মনে আসে। সর্বাণীর মুখের তিনটি

ব্রণকে ওর ভালোবাসার চিহ্ন বলে মনে হয়। আমার সঙ্গে নাচবে বলেই ওর গালে ব্রণ গজিয়েছে। মানুষ কারো সঙ্গে প্রেমে পড়লে তার মুখে ব্রণ বেরোয়। চর্মবিশেষজ্ঞ আর মনোবিদরা একসঙ্গে বসে আমার এই চিন্তাকে উড়িয়ে দিতে পারবেন? আমার মনে হয়, এভাবে কেউ ভাবেই নি, ডক্তাররা বলে কন্‌স্টিপেশান থেকে ব্রণ গজায়। তা গজাতে পারে; তবে প্রেমে পড়লে খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম হলেও কনস্টিপেশান হ'তে পারে, তাহলে প্রেমে পড়লে বেরুনো, অবদমিত যৌন-কামনার বহিঃপ্রকাশ বলে মেনে নিতে কারো আপত্তি থাকবে কি? দিগ্‌গজরা বলেন, মুখ হলো মনের আয়না। সর্বাণীর আয়নায় এই ব্রণগুলি কি ভালবাসার স্বপ্নছাপ?

ঠিক রাত দশটায় যোধপুর রেলস্টেশানের মেন এন্ট্রান্সের মুখে নীল জিন্‌স আর হলুদ টি শার্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকা সর্বাণীর চেহারায় ঐ তিনটি ব্রণের প্রভাবে একটা অন্যতর আবেদন ফুটে ওঠে, সে যে ঠিক কী তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। গত দশ ঘন্টায় পরিতোষ এক অন্য সর্বাণীর পরিচয় পেয়েছে। সে মেডিক্যাল ছাত্র সংসদের জনপ্রিয় ভাইস প্রেসিডেন্ট। বৃষ্টি থেমে গেলে ছাত্র সংসদের অন্য বন্ধুদের ফোন করে ডেকে এনে কয়েকঘন্টার আলোচনায় তৈরি হয়েছে এক অভিনব পরিকল্পনা।

তারপর ওরা সবাই বেরিয়ে পড়েছে ব্যবস্থাপনায়। পরিতোষ নিজের ঘরে ফিরে যায়। ওর বিকেলের ডিউটি ছিল। রাত আটটায় মিউজিয়াম থেকে ফিরে ডিনার সেরে সাড়ে নটায় স্টেশানে এসেছে। সেখানেই দলবল নিয়ে সর্বানী হাজির। সর্বানীকে ওখানে দাঁড় করিয়ে পরিতোষ মোটা নিমগাছটার নিচে দাঁড় করানো একমাত্র টেম্পোটার কাছে গিয়ে দেখে আসে সব ঠিকঠাক আছে কিনা! সর্বাণীর সহপাঠী অজিত কোঠারির মামার টেম্পো এটা। সেখানে অজিত, রাজীব নেহরা, সঞ্জয় জয়াকর, আর রহিম হায়দার দাঁড়িয়ে ওর দিকে বুড়ো আঙ্গুল তুলে দেখায়। ড্রাইভিং সীটে ওদের জি. এস. পীযূষ মিত্তল। পরিতোষ এসে মূল দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর তখুনি লোকটাকে আসতে দেখে হঠাৎ ওর হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। লোকটা আজ নীল প্যান্টের উপর সাদা স্ট্র্যাপ হাফ শার্ট গুঁজে পরেছে। পায়ে চকচকে পালিশ করা জুতো। সর্বাণীকে ইশারা করেই সে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। সর্বাণী এক কদম এগিয়ে বলে,—এক্সিউজ মী!

বসন্ত কুমার মোটা আওয়াজে বলে,—ইয়েস!

সর্বাণী বিনীত কণ্ঠে বলে,—ডু ইউ হ্যাভ কনফার্মড রিজার্ভেশান টু দেলহী?

বসন্তকুমার ভ্রূ কুঁচকে বলে,—ইয়েস, হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো?

সর্বাণী তখন ওকে বিনীত ইংরেজীতে বোঝায় যে ওর দিদি লেডিজ কামরায় দিল্লী যাবে বলে রিজার্ভেশান করেনি, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় একা লেডিজ কামরায় যেতে সাহস পাচ্ছে না। যদি কষ্ট করে নিজের বার্থের এককোণায় ওকে বসিয়ে নেন তাহলে খুব উপকার হয়।

স্বভাবতই বসন্তকুমারের চোখ চকচক করে ওঠে। তবু নিস্পৃহতা বোঝানোর জন্য বলে, —ঠিক আছে, কিন্তু শোয়ার জায়গা দিতে পারবো না! কোথায় তোমার দিদি?

সর্বাণী এবারও ওর সাহায্য চেয়ে বলে, ঐ টেম্পোতে বসে আছে, সঙ্গে লাগেজ রয়েছে। আমি একা পারবো না! আপনি দিদিকে বা লাগেজটা একটু ধরলে—

—ওহ্, সিওর, সিওর! বসন্ত কুমার এহেন উপকারের লোভ সামলাতে পারলো না। পরিতোষের চরিত্র বিশ্লেষণ সঠিক। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। বসন্ত কুমার সর্বাণীর সঙ্গে হেঁটে আসে। টেম্পোর পেছন দিককার অন্ধকারে আসতেই ঘ্যাটঘ্যাট শব্দ করে ইঞ্জিন অন হয়। টেম্পোর আড়ালে বাগানের রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা—রাজীব আর রহিম অতর্কিতে বসন্তকুমারের দুহাত ধরে, সঞ্জয় দ্রুত ওর দাড়িগোঁফ কামানো মসৃণ ঠোঁটে আড়াআড়ি দুটো অ্যাডহেজিভ প্লাস্টার সেঁটে দেয়, আর অজিত তখন প্যান্টের উপর দিয়েই ওর পাছায় লম্বা সুঁই ফুটিয়ে সিরিঞ্জ থেকে কিছু পুশ করে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বসন্তকুমার এলিয়ে পড়ে। ওকে চ্যাংদোলা করে টেম্পোতে তোলা হয়। সর্বাণী গিয়ে সামনের সিটে ওঠে আর পরিতোষ পেছনে অন্য চারজনের সঙ্গে। টেম্পো চলতে শুরু করে।

পনেরো কুড়ি মিনিট চলার পরই ওরা হোস্টেলে পৌঁছে যায়। তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। পুরো হোস্টেল শুনশান। সবাই আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু কয়েকটা করিডোরের আলো জ্বলছে। পরিতোষ ভাবে,—আমাদের ও দিককার কোন হোস্টেলে এরকম ভাবা যায় না! আর এরকম সিট্রানেলার গন্ধে মাতোয়ারা রাতের হস্টেল। আমাদের ওখানে হতো স্যাঁতসেতে ভিজে বাতাসের গন্ধ।

ওরা বসন্তকুমারকে চ্যাংদোলা করে একতলার জিমন্যাসিয়ামে তোলে। ততক্ষণে লোকটির জ্ঞান ফিরেছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। ছটফট করছে। জিমন্যাসিয়ামের বাইরে পীযূষ মিত্তল আগে থেকেই একটা গাধা বেঁধে রেখেছিল; সে গিয়ে এবার দু একবার ওটার লেজ মুচড়ে দেয়। ক্ষুধার্ত গাধাটি তখন বিকট চিৎকারে ডাকতে থাকে। প্রত্যেক ছাত্রের মুখে তখন অপারেশন থিয়েটারের কাপড় বাঁধা, প্রত্যেকের হাতে গ্লাভস্। বসন্তকুমারের গায়ে তখন কম্বল চাপিয়ে ওরা হাঁটু দিয়ে, কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে আর লাথি মেরে মেরে পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যে আধমরা করে তোলে। ওরা নিজেরাও প্রত্যেকে ঘেমে নেয়ে অস্থির। পরিকল্পনা মাফিক কাউকে পিটানোও যে এক কঠিন কাজ তা পরিতোষ এই প্রথম অনুভব করে। সে নিজেও কষে কয়েকখানা থাপ্পড় মেরে মেরে হাতের সুখ পায়। বসন্তকুমার বারবার পরিতোষের পা ধরে গোঙাতে থাকে। তারপর ওর থেকে পরিতোষের টাকা আর আজকের খরচ বাবদ তিনশো টাকা উদ্ধার করা হয়। বাকি টাকা ওকে ফেরৎ দিয়ে হুমকি দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে যদি এ নিয়ে আর কোন ট্যাঁ ফোঁ করে তাহলে আরো কঠিন এবং অকল্পনীয় শাস্তি দেওয়া হবে। এখন ভারতবর্ষে জোর যার মুলুক তাঁর—জিস্‌কা লাঠি উস্‌কা ভৈঁস—বুঝলি শালা, সারমেয়নন্দন, বরাহনন্দন ... ইত্যাদি ইত্যাদি!

তারপর ভদ্রলোককে দুপেগ মদ গিলিয়ে আবার একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে টেম্পোতে তুলে নিয়ে গিয়ে স্টেশানের ৪ নং প্ল্যাটফর্মের শেষমাথায় একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়ে

দেওয়া হয়। পীযূষ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা সেখানে কর্তব্যরত দুই আর.পি.এফ জওয়ানদের আগেই মদ খাইয়ে ফিট করে রেখেছিল। ততক্ষণে বসন্তকুমারেরও হুঁশ চলে আসে। অজিত গিয়ে রেলের অফিস থেকে ওর টিকিট রি-ভ্যালিড করিয়ে আনে ভোরবেলার মন্‌ডোর এক্সপ্রেসের জন্যে। সেই টিকিট, বাকি টাকাপয়সা, ওর ব্যাগ ব্রীফকেস ওকে বুঝিয়ে দিয়ে ওরা সবাই বিদায় নেয়। 'অপারেশন বসন্তকুমার' এর এই শেষ পর্বে অবশ্য সর্বাণী আসেনি। সে বাড়িতে গেছে। আর দেরি করলে ডা. ও মিসেস সেন থানা পুলিশ করতে বেরিয়ে পড়লে আর রক্ষে থাকতো না। সর্বাণী তাই দুবার বাড়িতে ফোন করে সংসদের মিটিং ইত্যাদির খবর দিয়েছিল।

এই অভূতপূর্ব অপরাধগন্ধময় মনোমত অপারেশনের সাফল্যের জন্যে প্রত্যেক বন্ধুকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে সে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসার একাকিত্বে ফেরে। আজ অব্দি এটাই ছিল পরিতোষের জীবনে সবচাইতে ঘটনাবহুল, কখনো কখনো শ্বাসরুদ্ধকর চৌদ্দঘন্টা। রাতে বিছানায় শুয়ে বিখ্যাত দার্শনিক নিৎসের একটা উক্তি মনে পড়ে,—*Live dengerously, erect your cities besides Vesuvious, send out your ships to unexplored seas, live in a state of war!* আর এই বিপজ্জনক যাপনের প্রতীক হিসেবে ভিসুভিয়াসের ধ্বংসস্তূপের পাশে যে শহর জেগে ওঠে তা সর্বাণীময়, পরিতোষ তার অনাবিষ্কৃত সমুদ্রে নিজস্ব জাহাজকে পাঠাতে চায়, আর তা থেকে যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সে যেন দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন। পরিতোষের বিছানা, বালিশ, বিছানার চাদর সব উথালপাতাল করে দেবতা ও অসুররা সমুদ্রগর্ভ থেকে যা সব বের করে আনে পরিতোষ সর্বত্র দেখতে পায় সর্বাণীর আকর্ষক চোখদুটি, তার গালের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত তিনটি ব্রণ। এর মধ্যে একটি পেকে টসটসে। তাই নিয়ে সর্বাণী ভোপাভোপীর ছন্দে ওকে ঘিরে ঘিরে নাচতে থাকে আরতি করার মতন। পরিতোষও তাঁর সঙ্গে নাচতে থাকে, নাচতে থাকে, নাচতে থাকে। এরকম নাচতে নাচতে নাচতে নাচতে ওর নিজস্ব মন্দার ক্রমে ভিসুভিয়াস হয়ে পড়ে। গমকে গমকে লাভা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। একসময় ক্রমাগত মন্থনে শ্রান্ত ক্লান্ত পরিতোষ আর নাচতে পারে না। অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও দেবাদিদেব লিঙ্গেশ্বরের জটায় সাঁটা বাঁকা চাঁদের মতন সিদ্ধার্থের একফালি প্রশ্ন ঝুলে থাকে। সিদ্ধার্থ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আকর্ণ হাসতে থাকে আর নিস্তেজ পুরুষ পরিতোষ ভাবতে থাকে—"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা!" তা যদি লিঙ্গ দেবতা হয়—সমস্ত জল্পনা-কল্পনা, খাওয়াপরা, চলাফেরা, কথাবলা, পড়াশুনা করা বা কোনকিছু করা বা না করা, যাবতীয় মানবীয় প্রয়াসই কি সেই লিঙ্গেশ্বরের প্রকট বা প্রচ্ছন্ন বিলাস?

স্বপ্নে ও জাগরণে এই দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধার্থের একফালি আদিম প্রশ্ন ওকে কখনো আনন্দ দেয়, আবার কখনো বিষণ্ণ করে, কখনো হতাশা দূর করতে সে আত্মরতিতে মগ্ন হয় আবার হতাশা কাটিয়ে সেই সুপ্ত আগ্নেয়গিরির পাশেই শহর পত্তন করতে ইচ্ছে করে! আঁশটে গন্ধে ডুবে থেকে, আদিম গন্ধে ডুবে থেকে গোপন ইচ্ছেরা লালিত হয়। হাজার হাজার প্রদীপের মতন ব্রণগুলি জ্বলতে থাকে মৃতের মুখের পাশে স্তব্ধ হাওয়ার মতন

হাজার হাজার ব্রণ বিগত পনের বছর অথবা পনের হাজার বছর ধরে ঘুমের ওপারে, ঘোলাটে আকাশে নিঃশব্দে প্রশ্বাসে পাড় ভাঙ্গছে আর ভাঙ্গছে। লাভা নদীর আদরে শান্ত পরিতোষ, স্ত্রীর কাছে বারবার প্রত্যাখ্যাত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ পরিতোষ বিষাদ রাত্রির দরজা জানালা ভেঙ্গে আচানক সর্বাণীর চুলের ভেতর ঝাঁপ দেয় আজও।

পাশে শুয়ে থেকে মূর্তিমতী দুর্ভাগ্যের মতন এক নারী সেই পতনের কোন শব্দ টের পায় না। ভোস্ ভোস্ করে নাক ডাকতে থাকে।

এগারো

... নিয়ত খননে বাড়ে দুঃখবোধ, আয়ুধের ধার
... নগরের নর্তকীর স্থির-বিদ্যুৎ-লাগা চোখ
খননে নিয়ত, শব্দের চমৎকারিতা বাড়ে
বাড়ে দুঃখবোধ।

– বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

মুমল জিজ্ঞেস করে,—আপনার কী কষ্‌টো আছে বাবু?

এই প্রশ্ন শুনে পরিতোস কিছুক্ষণ ওর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। কী মায়াবী চোখদুটি। আজ দুইদিন তিনরাত হলো লোকটা ওর অতিথি। এ সময়ে মুমল আর কাউকে নেয়নি। এরকম তৃষ্ণার্ত পুরুষ্ তো আর জীবনে বারবার আসবে না।

ওর চুলে বিলি কেটে মুমল আবার জিজ্ঞেস করে,—আমায় বলুন, আপনার কী কষ্‌টো আছে, তাহলে দিলটা হাল্কা হবে!

পরিতোষ ওর প্রশ্নের কী জবাব দেবে? নিজের কোন ভাষা মাথায় আসে না। সে অজান্তেই কবি বিনয় মজুমদারের এক একটি কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করে,—

প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন।
অগ্নি উদ্‌গমন করে এ-গহ্বর ধীরে ধীরে তাঁর
চারিপাশে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে।
এতো উচ্চে সমাসীন আজ তাঁর আপন শঠতা;
যাতে সমতলবর্তী প্রজাপতি, পাখিদের রঙ
তাঁর কাছে নিরর্থক; এমন সমস্যাকীর্ণ আমি।

মুমল জিজ্ঞেস করে,—আপনি ঘরে লৌটবেন না বাবু? আপনার বিবি-বাচ্চা নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন? আজ আপনি যান! ফির কভি আসবেন, আপনার জইন্যে আমার দরওয়াজা হামেশা খুলা থাকবে।

পরিতোষ ম্লান হেসে বলে,—দূরে যাও মেঘমালা তোমাদের দৌত্যে,

আলিঙ্গনে
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ক্রোড়ে তো যাবো না।

আমি যাবো দেশান্তরে যেখানে ফুলের মুক্তি আছে।
বর্তমানে চারিপাশে পর্বতের প্রাচীর আসীন।
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না!

দুহাত বাড়িয়ে মুমলকে জড়িয়ে ধরে বলে,—আমি তোমার কাছে থাকবো, তোমার কাছে ফুলের মুক্তি আছে, চারিপাশের মায়া ও মোহের পর্বতের প্রাচীর লঙ্ঘন করে এসেছি! তুমি পেশাদার, তবু ভীষণ ঐকান্তিক, সময়কে কখনো অবহেলা মিশিয়ে ফাঁকিতে পরিণত করো না! এই নিষ্ঠাকেই শ্রদ্ধা জানাই। একজনের পোষাকি উচ্চতায় আমার মনের ছোটখাট প্রজাতির মুক্তি নেই, পাখিদের আলাদা কোন রঙ নেই—প্রত্যাখাত প্রেম আজ অসহনীয় ধিক্কারে অপমানে অবহেলায় প্রাচীর বেষ্টিত ও মলিন।

মুমল লোকটার ভারী ভারী কথার মানে বোঝে না। সে বলে,—ঠিক আছে বাবু, আপনি থাকুন, যতদিন মর্জি থাকুন!

পরিতোষ বলে,—এমনি এমনি থাকবো না, আমি রোজগার করতেও বেরুবো! মেহনত করে তোমাকে নিয়ে থাকবো এই লোকালয়ের কোন এক প্রান্তে অথবা অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে!

ওর কথা শুনে মুমল মিটিমিটি হাসে। আজীব পাগল লোকটা! ওকে এখন ভূতে পেয়েছে। ভূত মানেই অতীত। মানুষকে যখন ভূতে পায়, তার মন উড়ে যায় কোন অজানা অচেনা স্বপ্নলোকে, নিমেষে মিটে যায় হাজার হাজার বছরের ব্যবধান; কিন্তু তার পা থেমে থাকে, শরীর পড়ে থাকে বর্তমানে। শুধু মন খারাপ করা সময়েই তাই অতীতে বিচরণ করতে পারে কেউ। চেতনে সে বিচরণ করে এই দেহ ঘিরে ঘটিত কোন অদূর অতীতে। কিন্তু অবচেতনে?

অবচেতনে মন খারাপ হওয়া মানুষের প্রতি অবহেলা বঞ্চনা ও অপ্রেমের ছিদ্রপথে অভাবী মনপবনের নৌকা উড়ে যেতে পারে অগনন কুসুমের দেশে। সেই মনন বুদবুদবাহী সময়নভোচারী বাস্তব বাষ্পের সঙ্গে বাতাসের মতো আর মেশে না। যোধপুর ঘাসমান্ডির হীরাবাঈ বলতো,—সেই মন খারাপ করা কোন প্রত্যাখাত প্রেমিক যদি তোর কাছে সুখ পেয়ে যায়, তবেই তোর তবায়েফ জীবন সফল। মুমল এসব কথার অর্থ বুঝতো না। কিন্তু আজ এই বাবুটি, ওর জীবনে প্রথম মর্দ যে নাকি ভূতে পাওয়া আবেগে বারবার আঁকড়ে ধরছে ওকে। সেই-ই যেন বর্তমান থেকে কয়েকশো বছর আগে যাওয়ার সময়-উট। ওর পিঠে চেপে এই লোকটা রাণা মহেন্দ্র হয়ে পড়ে সমস্ত অস্তিত্বে বারবার ঝাকুনি—এক মুমলকে নিমেষে পরিণত করে রাজকন্যে মুমলে, ভূতে পাওয়া মানুষের সঙ্গে সঙ্গমে মুমল ভিজতে থাকে, ভিজতে থাকে আরো, ভিজে ভিজে একাকার। এই জনমে এমন সওয়ার পায়নি এই উটনী! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে সে আবেশে মানুষটিকেই আরো আদর করে, ঘোড়ার কেশর যেমনে ধরে ওকে আরো গভীরে ...

নেয়— একেবারে অন্তঃস্থলে।

একসময় অবচেতন থেকে চেতনে ফিরে পরিতোষ ভাবে, – এটাই জীবন। এভাবে নারী শরীর পাওয়ার কথা শুধু স্বপ্নে ভাবা যায়। কেউ মন দিয়ে ভাল না বাসলে মানুষের গর্দিশ অন্তহীন।

যে কোন গর্দিশ যেমন মানুষকে ভেঙ্গে খান খান করে, যে কোন গর্দিশ মানুষকে গর্দান দেয়, ঘাড় ঝুকিয়ে দিতে চায় মাটির দিকে, নাক ঘষে দিতে চায় এবড়োখেবড়ো কর্কশ বাস্তবে। হাইপারটেনশান-টেনশানে হায় বর্ধিত রক্তচাপ কিম্বা আততির সেই প্রবল ঝাকুনিময়, এমনকি ভালবাসা ভেবে ছলনার চোরাবালিতে পা ডুবিয়ে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে রূপোলী মায়াময় পূর্ণিমায় ডাকিনীর মতন খুবলে নিতে চাওয়া হৃদপিণ্ডের থরোথরো কাঁপুনিকে যদি তুমি সহ্য করতে পারো, হে পুরুষ—

পরিতোষ ভাবে, এখানে পুরুষ বলা কি ঠিক হবে? এখানে মানুষ বলা যেত না? অথবা মানবতা?

—না! মনের গভীর গহন অন্দর থেকে, প্রায় নাভি থেকে উঠে আসা প্রতিবাদ বলে,

—না! এখানে শুধু একটা, হ্যাঁ, কেবলমাত্র একটাই শব্দ প্রযোজ্য—সে হলো 'পৌরুষ'! আর এই শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করেই মুচকি হাসে সে। হাসি পায়। হাসি তো পাবেই। নিজের উপর যত রাগ, রাগ আর রাগ রয়েছে সব নিমেষে ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। একটা করুণ চেহারা মনে পড়ে। মনে পড়ে এক সহজ সরল শ্যামলা বউ এর কথা। নাম ছিল তর মিতা। মনে পড়ে সেই মিতার একটি প্রশ্ন। আজ থেকে আড়াই বছর আগে যোধপুর শহরের বুকে আলো ঝলমলে এক মায়াবী গলির বাঁকে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামীর সামনেই পরিতোষকে জিজ্ঞেস করেছিল,—কিছু মনে করবেন না স্যার, কথাটা জিজ্ঞেস না করে পারছি না, আপনি কি নপুংসক? বউকে অন্যের সংসার ধ্বংসের জন্যে লেলিয়ে দেন কেন?

সেদিন পরিতোষের ঠোঁট অবলীলায় ফাঁক হয়ে যায়। কী বলছে মিতা? ওর চোখদুটি লাল, উত্তেজনায় চেহারা বেঁকেচুরে যাচ্ছে। শ্যামলা বউটি ওর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, —কী জবাব দিচ্ছেন না যে, কেমন পুরুষ আপনি, আমি কী ক্ষতি করেছি আপনার? অন্যের সংসারে না লেলিয়ে ঘরে রোজ রাতে একটা করে ফৌজী ডেকে আনুন, ঐ ডাইনিও খুশি হবে আর আপনারও উপার্জন হবে!

থুথু ফেলে মিতা। পরিতোষের হা করা মুখে একটা গান্ধী পোকা ঢুকে যায়। সে-ও থু থু করে। কিন্তু গন্ধটা থেকে যায়। সে কী জবাব দেবে? জিভ ও গলা শুকিয়ে কাঠ। পোকার ছোঁয়ায় জন্ম নেওয়া জ্বলুনি আর দুর্গন্ধ। তবু ঢোঁক গিলতে বাধ্য সে। জ্বলুনিটা খাদ্যনালী হয়ে পাকস্থলী আর সেখান থেকে ক্রমে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। সমস্ত অস্তিত্বে দুর্গন্ধ। তলপেট টনটন করে। ওর বর তখন মিউমিউ করে বলে,—এই মিতা, কী যা-তা বলছো স্যারকে, ছাড়ো, ছাড়ো বলছি!

তখনই কোন ঝামেলা সন্দেহে রাজস্থান পুলিশের দুই কনেস্টবল এগিয়ে আসে তাই

দেখে মিতা নিজের চেহারায় একটা হাসি সাজিয়ে ওকে বলে,—চলিয়ে না স্যার, আজ হামারা ঘরমে খানা হি পড়েগা!

মিতার হাতের টানে পরিতোষ ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে জগদ্দল পাথরের মতন ভারী পা দুটি টেনে এগুতে থাকে। একটু এগিয়ে মিতা বলে,—রাজীবদাদের বাড়ি চলুন, আপনার সতীসাধ্বী আছেন, সেখানেই সব শুনবেন। পরিতোষের সমস্ত অস্তিত্বে তখন জ্বলুনি ও দুর্গন্ধ।

সুজিত আর রাজীব সমবয়সী। দুজনেই একাধারে সাংবাদিক ও আলাদা আলাদা খবরের কাগজে ইলাস্ট্রেশান আর্টিস্ট। রাজীবের সূত্রেই সুজিতরা রত্নাডা এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়েছে। বেশ মিলেমিশে হৈ হৈ করে কাটছিলো দিনগুলি। পরিতোষ আর ভাবতে চায় না। মানুষ জলে ডুবে গেলেও হাত-পা নেড়ে ভাসার চেষ্টা করে। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে, চক্রব্যুহে ঢোকার আগে আমি কে ছিলাম, কেমন ছিলাম -- সবকিছু ভুলে যাবো বুঝি! চক্রব্যুহে ঢোকার পর আমার এবং চক্রব্যুহের মাঝে কেবল আত্মহননকারী নৈকট্য ছিল, অথবা জীবন দেওয়ার নিবিড়তা; তা বুঝি কোনদিন জানতেই পারবো না। চক্রব্যুহ না পদ্মব্যুহ? অভিমন্যু জানি কোন্ ব্যুহ ভেদ করে ঢুকেছিল?—এ মুহূর্তে মনে পড়ে না। শুধু মনে থাকে সে ব্যুহের আত্মহননকারী নৈকট্য' চক্রব্যুহ থেকে কোনদিন কোনভাবে বেরিয়ে যেতে পারলেও এই মহান চক্রব্যুহের রচনায় কোন পার্থক্যই আসবে না। এ আর নতুন কী? বিশাল কালো এক উর্ণনাভ নিজস্ব লালারসে ছুটে ছুটে রচনা করে যাবে আরো অসংখ্য জাল, জালে গাঢ় আঠা, জালে মশা-মাছি, হঠাৎ পাখা গজানো পিপীলিকার দল যখন আলোর দিকে অন্ধের মতন উড়ে যাবে আর অভিমন্যু কিম্বা পরিতোষ অথবা যে আদি লগ্নে বিবাহ নামক পদ্ধতির মাধ্যমে মানব সভ্যতার ক্ষুদ্রতম এককটি তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে সেই থেকেই কোথাও না কোথাও এমনি ছলনার জালে আটকে পড়ে ছটফট করেছে অজস্র পরিতোষ, ভবিষ্যতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সে কী অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ছে?

ঘুমিয়ে থাকা মানুষ যেমন নিশির ডাকে বিছানা থেকে উঠে চলতে শুরু করে, অবিকল জেগে থাকা মানুষের মতন দরজা খোলে, সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামে আর নামতে থাকে। নামতে থাকে নিজের অজান্তেই। এ এক অদ্ভুত চলন। এ চলন কেউ নিজে চললেও বিশ্বাস করবে না! এ চলন কাউকে একনিষ্ঠভাবে চলতে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না! পরিতোষ কি নিশির ডাক বিশ্বাস করে? সিনেমায় দেখেছে এসব। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, এমনি ঘুমিয়ে থাকা মানুষ যখন জেগে উঠে পরিচিত পৃথিবীতে হাঁটে, সে কি স্বপ্নের কথা মনে রাখতে পারে?

—না, পারে না! কিছু কিছু স্বপ্ন এবং একটু বেশী করে দুঃস্বপ্নরাই শুধু মানুষের স্মৃতিতে বাসা বাঁধতে পারে। মানুষ কখনোই সম্পূর্ণ স্বপ্নের কথা মনে আনতে পারে না।

ততক্ষণে সুজিত আর রাজীবের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেছে। হাতাহাতি, তুইতোকারী সীমা ছাড়ানোর আগেই দীপা ও মিতা মাঝখানে পড়ে দুজনকে আলাদা করে নেয়। রাজীব সুজিতকে 'গেট আউট' বলে। তখন মিতা হাতজোড় করে বলে,—রাজীবদা প্লীজ,

দীপা প্লীজ ক্ষমা করে দাও! তোমাদেরকে অজস্র ধন্যবাদ, আমার চোখ খুলে দিয়েছ।

দীপা বলে,—শান্ত হও, মিতা, সেরকম এক্সট্রিম কিছু হয়তো ঘটেনি, তবে এরকম চলতে থাকলে হয়তো—

—থাক! আর বলতে হবে না! ওর চোখদুটি এখন ভাটার মতন লাল। এবার পরিতোষের দিকে তাকিয়ে উন্মাদিনীর মতন মাথা ঝাকিয়ে বলে,—তবে স্যার, আপনাদের কোনদিন ক্ষমা করবো না! নিজের দাদা-বৌদির মতন শ্রদ্ধা করতাম, আপনারা যে আমার এতবড় সর্বনাশ—ওরা কিছু করুক বা না করুক - এই ডাকিনী আমার স্বামীর মনকে—

ও আর বলতে পারে না। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কথা জড়িয়ে যায়। ও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে রাজীবদের বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। পেছন পেছন ভেজা বেড়ালের মতন হাঁটে ওর পতিদেব।

ঘটনার আকস্মিকতায় পরিতোষ বিমূঢ়। সে এখন কী করবে? তারও যে বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছে। তার যে তলপেটে চিনচিন করছে। গলা ব্যথা করছে। সেই নোংরা পোকাটা কি এখন তলপেটে পৌঁচেছে? গলা দিয়ে নামার সময় কি আঁচড় কেটে গেছে? তার সারা শরীরের কোষে কোষান্তরে রক্ত ও লসিকা বাহিত হয়ে পোকাটার বিষ ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

ততক্ষণে রাজীব মুখ ও মাথা ধুয়ে এসে পরিতোষের মুখোমুখি বসে। ওর চুলগুলি সজারুর কাটার মতন খাড়া হয়ে আছে। দীপা ওকে চিরুণী এনে দেয়। রাজীব চুল আঁচড়ায়। ওর দু'চোখ পরিতোষের উপর নিবদ্ধ। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। পরিতোষ দীপাকে বলে, —জল! রাজীবের দৃষ্টিতে চিড়িয়াখানার জীব দেখার মতন অনুসন্ধিৎসা। খুব মজা পেয়েছো শালা!

রাজীব কি ওর চোখের ভাষা পড়ছে? সে বলে,—আমি দুঃখিত স্যার, এমনটা চাইনি, আসলে আমি এগুলি সহ্য করতে পারিনা, আমার একমাত্র ছোটবোনকে পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে ইন্টারকোর্স করতে দেখে ওকে ও ছেলেটাকে খুন করতে গিয়েছিলাম; তখন দুই বাড়ির লোকজন মাঝখানে পড়ে ওদের বিয়ে দেয়, নয়-দশ বছর হয়ে গেল, এখনো ওদের সঙ্গে সহজ হতে পারিনি।

দীপা ফ্রিজ থেকে একটা বোতল বের করে তারসঙ্গে নব্বইভাগ সাধারণ জল মিশিয়ে ওকে খেতে দেয়। রাজীব ঠাণ্ডা জলই খায়। পরিতোষ জল খেতে গিয়ে বিষম খায়। সব অনৈচ্ছিক পেশীগুলি কেমন অদ্ভুত ছন্দে কাঁপছে। পরিতোষ ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে। রাজীব বলে, —স্যারকে একটা চাদর দাও! ওদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, বললাম, স্যারকে জানাতে হবে না, ম্যাডাম যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, সেল্‌ফ রিয়েলাইজেশান ইজ দ্য বেস্ট—মিতাটা একটা গাধা, শুধু শুধু একটা নন ইস্যুকে—

পরিতোষ আবার গলায় জল ঢালে। সে বুঝতে পারছে, ওর সামনে রাজীব এখন ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না, তাই আলফাল বকছে। আর ওর দিকে তাকিয়ে ওর প্রতিক্রিয়া

দেখছে। কোন্‌টা ইস্যু এর কোন্‌টা নন ইস্যু মনে মনে সবাই জানে!

ফুলশার্টের উপর পুলওভার পরেও পরিতোষ কাঁপছে। ডিসেম্বর মাস হলেও এবছর তাপমান কখনোই ১১ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে নামেনি। আজ কি তাপমান নেমে গেছে? পরিতোষ জলের গ্লাসটা রেখে দীপার দিকে তাকায়। দীপাও ওকেই দেখছে। চোখাচোখি হতেই শুকনো হেসে বলে,—ম্যাডাম খুবই লজ্জিত, আপনি প্লীজ ওকে কিছু বলবেন না স্যার, আসলে ইনি তো ভীষণ সরল, না বুঝতে পেরে ঐ শয়তানটার ফাঁদে—দীপা ওকে একটা কাশ্মীরি শাল দেয়। কিন্তু শাল গায়ে জড়িয়েও ওর কাঁপুনি থামে না। সে কী বলবে ভাষা পায় না। সবাই আবার চুপচাপ। ওদের টি. ভির নিচে রাখা অ্যালার্ম ঘড়িটার কাঁটার টিকটিক শব্দ সারাঘরে শোনা যায়। নাকি ওটা হৃদস্পন্দনের শব্দ? পরিতোষের গুহ্যদ্বার দপদপ করে। সারা শরীরের জ্বলুনি, দুর্গন্ধ ও কাঁপুনি তেমনি থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তলপেট কামড়ায়। সে কি পায়খানায় যাবে? পায়খানায় গেলে কি দুর্গন্ধযুক্ত পোকাটাবে শরীর থেকে বের করা যাবে? ওফ্‌, আর ভাবতে পারছে না! সুরতি মাথা হেঁট করে ভ্রূ কুঁচকে বসে আছে।

রাজীব এবার ওর হাত ধরে বলে,—স্যার, আমি আর দীপা ম্যাডামকে বুঝিয়েছি, তিনি কি পারবেন আপনাদের ছেড়ে—বিশেষ করে শঙ্খকে ছেড়ে থাকতে? ও বড় হচ্ছে, ওর ভবিষ্যৎ আছে, ম্যাডাম রিয়েলাইজ করেছেন—আপনি প্লীজ ওকে কিছু বলবেন না, বাড়ি গিয়ে মারধোর করবেন না, এখন যান, মাসিমা আর শঙ্খ নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করছে, মিতাটা একটা গাধী, এমন করে কেউ ডেকে আনে?

পরিতোষ একটা কথাও না বলে উঠে দাঁড়ায়। দীপা বলে,—ভাববেন কিছুই হয়নি, সুবাকা ভুলা পুরা দিন ভটক্‌কে সামকো ঘর লৌট আতা হ্যায় তো উসকো ভুলা নেহি কহতে! প্রবাসী বাঙালিরা কথায় কথায় হিন্দি মুহাবরা ব্যবহার করে। এসব আপ্তবাক্য ওর অসহ্য লাগছে। এই দম্পতিকেই অসহ্য লাগছে এখন। পরিতোষ ওদের ঘর থেকে বারান্দায় নামে। ওর পা কাঁপছে। সুরতিও মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসে। ওরা নিঃশব্দে রাজীবদের গেট ঠেলে শানবাঁধানো গলিতে নেমে আসে। নিজেদের বাসার দিকে হাঁটতে থাকে। আলোআঁধারি পথ দুলছে। কোথায় যাচ্ছে ওরা? রাস্তাটা কি পাতালের দিকে নেমে গেছে? মরুশহরের বুকে, যোধপুরের রত্নাডার পথে এত জল থৈ থৈ? এরকম জলে মানুষ ডুবে যেতে পারে, আকস্মিক গভীরতায় স্নায়ুকোষগুলি স্থবির হয়ে পড়ে। মস্তিষ্ক কাজ না করলে মানুষ হাঁসের মত সহজাত প্রচলে ভাসতে পারে না, কিন্তু হাত পা নেড়ে ভাসার চেষ্টা করে, অনেক সময় দুর্বারভাবেই করে। কেউ কেউ পারে, কেউ কেউ পারে না; কেউ ডোবে, কেউ ডোবে না। পরিতোষ কী করবে? ভাড়াবাড়ির গেট ঠেলে ছিটকিনিটা আটকে দিয়েই কষে থাপ্পড় কষাবে একটা? একটা থাপ্পড়ে কি গায়ের জ্বালা মিটবে? মারতে মারতে ওকে অজ্ঞান করে ফেললে অথবা খুন করে ফেললেও তার রাগ কমবে না।

কিন্তু সে কিছুই করে না। নিজের হাত নোংরা করতে ইচ্ছে হয় না। মরুশহরের শুষ্ক

পথে ঘৃণার আকণ্ঠ জল কাটিয়ে নিজেদের গেট দিয়ে ঢুকে ওর সমস্ত অস্তিত্ব এখন থিকথিকে দুর্গন্ধময়। ছিঃ, এই বেশ্যার সঙ্গে বারোবছর ধরে ঘর করছি আমি! ধিক্কারে কুঁকড়ে যায় পরিতোষ। বারান্দার সোফায় জবুথবু বসে পড়ে। গেট দিয়ে ঢুকে সুরতিই ছিটকিনিটা আটকে দেয়। কী বেহায়া মেয়েমানুষ। এত কিছুর পরও ওর পেছন পেছন আসতে পারলো? মাসী শাশুড়ি শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দার সোফায় ওকে দেখে অবাক।—কী ব্যাপার বাবা?

সুরতি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ে। পরিতোষ মাসী শাশুড়ির প্রশ্নের কী জবাব দেবে? আদৌ কি জবাব দেওয়া উচিত। পরিতোষের কিচ্ছু বলার প্রবৃত্তি হয় না। সে বলে,—মাসী এক কাপ গরম চা!

ওকে থরথর কাঁপতে দেখে মাসী কিছু অনুমান করে বলে,—এক্ষুনি দিচ্ছি বাবা, তুমি ভেতরে গিয়ে বসো তো!

পরিতোষ সুবোধ বালকের মতন ঘাড় নেড়ে ঘরে ঢোকে। শঙ্খ হোমওয়ার্কের খাতা থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলে,—কী হয়েছে বাবা?

পরিতোষ মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে বলে,—জ্বর আসছে বোধহয়, শরীর খারাপ লাগছে!

শঙ্খ জিজ্ঞেস করে,—মা কোথায় বাবা, মিতা কাকীমা তোমাকে কী বলছিলো? পরিতোষ কী জবাব দেবে? সে হাত তুলে বাথরুমের দিকে ইশারা করে পাশের ঘরে গিয়ে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে। কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলার প্রবৃত্তি হয় না। পুজোর ছুটিতে কোকরাঝার থেকে মাসী শাশুড়িকে সঙ্গে এনেছে ওরা। পরিতোষ ভাবে, ছিঃ মাসীমা নাজানি কী ভাবলেন! চোখ বন্ধ করলে গোল গোল নানা রঙের বুদবুদ, রাশি রাশি ভাসমান বুদবুদ ওকে ঘিরে ধরে। এমনি একটা বুদবুদে মুহূর্তে সাকার হয়ে ওঠে মেহেন্দি আঁকা দুটি হাত। ভোপাভোপী নাচের তালে তালে ওঠানামা করতে থাকে শব্দহীন, আরতি করার মতন নেচে নেচে ওকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস প্রায় নাভি থেকে উঠে এসে ঘরের বাতাসে মিশে যায়। খচরমচর শব্দে তাকিয়ে দেখে সুরতি মাথা নিচু করে পোশাক ছাড়ছে। ওর এই নগ্নতার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করে না পরিতোষ। নিজের রিক্ততাকে প্রবলভাবে অনুভব করে।

অথচ সে এখনো তুর্কী ঘোড়ার মতন জঙ্গম হতে পারে। ইদানীং সুরতির বাছবিচার, সময় অসময়, ভরাপেট, হাসফাঁস, ওজর আপত্তি গাইগুঁই ওকে প্রায়ই অসহিষ্ণু করে তুলতো। সে ভাবতো, সুরতি কি পুরনো পতিতে আর অভিসারিকা সাজতে পারছে না? পরিতোষ পুরনো হয়ে গেছে? এরকম মুহূর্তে ওর মনে পড়তো বছর দশেক আগের একটি বিস্মৃতি। আর কষ্ট পেত। অজান্তেই ভাবতো, নিশ্চয় কিছু আছে। কেউ আছে। কিন্তু পরিতোষ ভীষণ কামুক। স্ত্রী বিষয়ে ভীষণ অব্যবস্থিতচিত্ত। নিষ্ঠুরা বউ ভাবতেই পারে না। প্রশ্রয় পেলেই মন বদলে যায়—একদম ঘুরে যায়। সবল সফল সঙ্গমের পর নগ্ন স্তনে মুখ রেখে হাঁফাতে হাঁফাতে আর কোন দোষ দেখে না বৌয়ের। ওর শালী বলে,—পুরুষ

টোঁড়া। ঠিকই বলে। যাকে ভালোবাসে সেই ফুলের কুঞ্জকে যত্নভরে, তৃপ্ত সুখে রাখা পরিতোষের সহজাত কীর্তি। সুরতি কি এই দুর্বলতারই সুযোগ নেয় গোপন স্বেচ্ছাচারে ... বেলেল্লাপনায়? এই রিক্ত মুহূর্তে পরিতোষ ভাবে,—বিছানায় সুন্দর কিছু ফুল তোলা নিয়ে এত ক্লেশ?

আফশোষ হয়। এরকম স্ট্যাটাসজনিত হীনমন্যতায় ভুগে সে সর্বানীর মতন বন্ধু হারিয়েছে! ছিঃ সুরতি! এই তার পরিণাম! তোমার প্রতি ঐকান্তিকতার এই মূল্য দিলে!

সেদিন বিকেলে সর্বানীকে পেছনে বসিয়ে মন্ডোর উদ্যানে গিয়েছিল পরিতোষ। সেখানে পৌঁছেই সর্বানী ওকে একটা আঠা লাগানো খাম দেয়। পরিতোষ অবাক চোখে তাকালে সর্বানী বলে,—তুমি এখন পাকা ড্রাইভার, - আমি সার্টিফিকেট দিলাম!

পরিতোষ হেসে জিজ্ঞেস করে,—এতে ট্রেনারের সিগনেচার আছে?

উত্তরে সর্বানীর চোখ চকচক করে ওঠে,—অফকোর্স আছে! বাং-লা-য় সাইন করেছি!

পরিতোষের হাসি ওঠে।

সর্বানী বাংলা লিখতে পারার আনন্দে এক বাঙালি যুবকের কোন কিছু শিখে ওঠার সার্টিফিকেটে বাংলায় সই করে শ্লাঘা অনুভব করে। সে জানে না, খোদ বাংলার মানুষ এমনকি বাংলার মাস্টারমশাই—অধ্যাপকরাও ইংরেজীতে সই করতেই অভ্যস্থ। ইংরেজীতে সই করাতেই যেন ওদের অহং টনটনে থাকে। পরিতোষ খামটা খুলতে গেলে সর্বানী বাঁধা দেয়. উঁহু, ঘরে গিয়ে দেখো ; আগে ট্রেনারকে পার্টিটা দাও তো!

—অবশ্যই! পরিতোষের চোখ উজ্জ্বল হয়। সে মিরচিবড়া আর কোক এর অর্ডার দেয়! তারপর কাফেটেরিয়ার রঙিন ছাতার নিচে সাজিয়ে রাখা লাল চেয়ারে বসে খামটা খুলতে গেলে সর্বানী আবার বাধা দেয়। এবার সে কেড়ে নিয়ে আবার নিজের সাইডব্যাগ-এ রাখে। এ আবার কী?

সর্বানীর কোন আচরণে এর আগে জড়তা দেখেনি পরিতোষ. সঙ্কোচ, দ্বিধা, সংশয় ও লজ্জা যেন ওর অভিধানে নেই। অথচ এ মুহূর্তে ওর থেকে খামটা ছিনিয়ে নিয়ে ওর দিকে চোখ তুলেই তাকাচ্ছে না আর। হঠাৎ যেন চৈতন্যে ঘুমিয়ে থাকা লজ্জা- সংকোচ-দ্বিধা-সংশয় ও জড়তা একসঙ্গে জেগে উঠেছে। ঐ খামের মধ্যে কি ওর প্রেমপত্র রয়েছে? সর্বানী কি ওকে বিয়ে করতে চায়? সর্বানী যে ওকে ভালবাসে তার প্রমাণ তো 'অপারেশান বসন্তকুমার' এর দিনই পেয়েছে। কিন্তু বিয়ে? সর্বানী একজন ভাবী ডাক্তার আর পরিতোষ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নগণ্য কেরানী মাত্র। কী তার ভবিষ্যৎ? এটা যদি প্রেমপত্র হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সর্বানী ওকে বলবে, আমি চাকরি পেলেই তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুধু কবিতা লিখবে, শুধু উপন্যাস লিখবে! কেননা সেই যে বৃষ্টির দিনে সে সর্বানীর টি-শার্ট পরেছিল, সেদিন দুপুরে সমস্ত পরিকল্পনা শেষে ডিউটি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে পড়লে কী মনে করে সর্বানী হঠাৎ বলে ওঠে,—তুমি একটা ভোদুরাম! এসব চাকরিবাকরি করা তোমার পোষায় না. সেখানে নিজের মুডের কোন মূল্য থাকে না,

তোমার একটা ভালো বউ পাওয়া উচিত, চাকুরে বউ, যে শুধু তোমাকে ভালবাসবে, আর তুমি গল্প কবিতা লিখবে! তোমার বউ চাকরি করবে!

পরিতোষ হেসে জিজ্ঞেস করে ;—আর রান্নাবান্না-বাচ্চা মানুষ করা?

—রান্নার লোক রেখে দেবে, তোমার বউও অবশ্য মাঝেমধ্যে রাঁধবে, তুমিও মাঝেমধ্যে রাঁধবে আর বাচ্চা মানুষ তো দুয়েরই কাজ, ছোটবেলায় বউ ব্রেষ্ট ফিডিং করাবে আর একটু বড় হলে তুমি গল্প শুনিয়ে খাওয়াবে, ছোটবেলায় তুমি যেমন খেতে!

পরিতোষ ভাবে,—আমার ছোটবেলার গল্প শুনে খাওয়ার গল্প ওকে কে বলেছে? আমি তো বলিনি! তাহলে সে কি আমার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে? অথবা নিছকই তুক্কা। আজকাল তো সবাই তুক্কা মারে। তুক্কা মেরে স্মার্টলি আন্দাজে কথা বলাটাও যেন একটা আর্ট। পরিতোষ ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হুড়মুড় করে ছাত্র সংসদের বন্ধুরা সব চলে আসে। তারপর সেই অভিনব পরিকল্পনা। সেদিন বিকেলে ডিউটি যাওয়ার পথে পরিতোষের মনে ক্রমশ একটা প্রত্যয় জন্মাতে থাকে যে, সর্বানী নিশ্চয়ই ওকে চায়—এবং সে এ ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। নাহলে ওর জন্যে, সামান্য এক এল. ডি. সি বন্ধুর জন্যে এহেন ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? কোনমতে ব্যাপারটা ফাঁস হলেই থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি এমন কি জেল হাজত অব্দি গড়াতে পারতো!

সর্বানী নিশ্চয়ই ওকে চায়, অথবা একটা মোহ জমাট বাঁধছে। বন্ধুদের কাছে শুনেছে পরিতোষ, ইয়ে তো দিল্লী কা লাড্ডু হ্যায়, জো নেহী খায়া ও পস্তায়া, জো খায়া ও পস্তায়া! বিয়ের পর কিছুদিন পাশাপাশি থাকলেই নাকি অধিকাংশের সমস্ত মোহ কেটে যায়। আর তারপরই চোখ খুলে যায়। স্ট্যাটাসের পার্থক্য দেখতে পায়। তখনই ভাল লাগা বা না লাগা ব্যাপারটা প্রকট হয়। সেজন্যে কোন ডাক্তার কবি হতে পারে, ডাক্তারের স্ত্রীও কবি হতে বাধা নেই, কিন্তু ডাক্তারের স্বামী একজন কর্মহীন কবি—এমন পরিস্থিতি পরিতোষ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। ছেলেদের পৃথিবীকে স্ট্যাটাস যত তাড়াতাড়ি পাল্টায় —মেয়েদের পৃথিবীকে তার থেকে অনেক বৃহৎভাবে দ্রুত পাল্টে দিতে পারে। তাই মোহভঙ্গ হলে কয়েকবছর পর হয়তো আর পরিতোষকে ভাল লাগবে না! আর তারপরই তৈরি হতে পারে অপ্রেমের দূরত্ব, কোন বড় ডাক্তার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত সুপুরুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক বন্ধুত্বও অসম্ভাবিত নয়। তাছাড়া, উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েটি ওদের নিম্নমধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে একেবারেই মানাবে না। বাবা-মাকে সবসময় একটা হীনমন্যতা নিয়ে বাঁচতে হবে। অথবা সর্বানীর বাবার মতন নিজের বাবা মা, পরিবারকে ভুলে বাইরে সেট্‌ল হতে হবে। সর্বানীর বাবা তো একাধারে ডাক্তার ও অধ্যাপক ; ওর মা থেকে অনেক বেশী রোজগার করে! কিন্তু পরিতোষ কী? সর্বানীর উচিত ওর স্ট্যাটাসের কোন পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়া! এই সব সাতপাঁচ ভেবেই সে মনে মনে দৃঢ় হয়। নিজের আবেগকে সংযত করে। প্রবল ইচ্ছার গলা টিপে ধরে। নিজেদের স্ট্যাটাসের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধে সম্মতি জানায়। অথচ মনের মধ্যে একটা গোপন ইচ্ছা থেকেই যায়।

পরিতোষ বলে,—আজ আমিও তোমাকে একটা কার্ড দেব!

মিরচিবড়া শেষ করে ঝালে সর্বানীর ঠোঁট ও চোখ লাল। ঝাল কমাতে তখুনি বরফশীতল কোকের বোতলে চুমুক দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, কিসের কার্ড?

পরিতোষ মিটিমিটি হেসে বলে,—আছে, আগে বলো কী সার্টিফিকেট দিয়েছো? এটা দেখিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যাবে কি?

সর্বানী মৃচকি হেসে বলে,—অবশ্যই পাবে. তবে স্কুটার নয়, অন্যকিছু ড্রাইভ করার লাইসেন্স!

পরিতোষ এবার ভয় পেয়ে যায়। সর্বানী যদি অমোঘ কিছু উচ্চারণ করে বসে তাহলে ওকে অস্বীকার করা পরিতোষের পক্ষে কষ্টকর হবে। সে তাই তড়িঘড়ি সাইড ব্যাগ থেকে নিমন্ত্রণপত্রটি বের করে ওকে দেয়। সর্বানী হাসিমুখে সেটি খোলে। পড়তে শুরু করে। তারপর দেখতে না দেখতে আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। ঝড়ো হাওয়া ওঠে। ওর জামা ও সর্বানীর চুল উড়তে থাকে। সর্বানীর মুখে বেশ কিছু অদ্ভুত রেখা জেগে ওঠে। সেগুলি ভেঙ্গেচুরে একেবেঁকে যেতে থাকে। সর্বানী ঐ কার্ডটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, নিজের কাছে রাখা আগের খামটিও ছিঁড়ে ফেলে। পরিতোষ জানতেও পারে না ওটাতে কী লেখা ছিল. বাধা দিতে পারে না; সর্বানীর এহেন অকল্পনীয় ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে সে থতমত।

সর্বানী দ্রুত উঠে গিয়ে রেস্টুরেন্টের বাইরে বেরিয়ে একরকম ছুটতে ছুটতে মন্ডোর উদ্যানের চৌহদ্দি পেরিয়ে যায়। পরিতোষও পেছন পেছন ছুটতে থাকে.- 'সর্বানী, এই সর্বানী শোন, শোন বলছি!'

ততক্ষণে সর্বানী স্কুটারে কিক দিয়ে স্টার্ট করে চলতে শুরু করেছে। নিমন্ত্রণ পত্র ও অন্যখামের ভেতরকার কাগজটির ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরোগুলি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। ঘূর্ণি বাতাসে সেগুলি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ওর স্কুটারের পেছন পেছন কিছুটা উড়ে পথে ও পথের দুপাশে দু এক টুকরো ফেলে রেখে, বাবুল গাছে কয়েক টুকরো লাগিয়ে দিয়ে দূরের পাথর ও বালি আর কাকটাসভরা দিগন্তবিস্তৃত বানজারভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই আকাশ চিরে এক জোড়া মিগ- ২১ ফৌজি বিমান উড়ে যায়। ওরা হয়তো যুদ্ধের মহড়ায় ব্যস্ত। এই গগনভেদী শব্দে কানে তালা লেগে যায়। পরিতোষ সোজাতি গেটগামী টেম্পোতে চেপে বসে। পথে মন্ডোর পাহাড়ের উপর বিমানবাহিনীর অস্থায়ী রেডারের অ্যানটেনা ঘুরতে দেখা যায়। ঝড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়তে থাকে, কিন্তু আকাশভেদী বোমারু বিমানগুলি, যুদ্ধবিমানগুলি ওদের মহড়ায় ব্যস্ত থাকে। পরিতোষের কানে তালা লেগে থাকে। সোজাতি গেট থেকে আরেকটা টেম্পোতে চড়ে রেলওয়ে ওভারব্রিজ পার হয়ে রত্নাডা শিবমন্দির পৌঁছে যায়। সেখানেই নতুন দুই কামরার বাড়িভাড়া নিয়েছে পরিতোষ। সুরতিকে বিয়ে করে এনে এখানেই প্রথম সংসার পাতবে।

সেই রাতেই রেলযাত্রা। কত আশা কত স্বপ্ন। অথচ সর্বানীর এই গগনভেদী বোমারু আচরণ ওকে বিমূঢ় করে দেয়। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। সে ভাবে, সর্বানীদের বাড়ি গিয়ে ওর অভিমান ভাঙ্গাবে। ওকে বোঝাবে! কী বোঝাবে সে? আদৌ কিছু বোঝার মতন

মানসিক স্থিতি কি ওর আছে? ততক্ষণে বাইরে প্রবল আঁধি তুফান শুরু হয়েছে। এই দুর্যোগে সর্দারপুরা গিয়ে আবার ফিরে আসা মুশকিল। অবশ্য ফিরতেই যে হবে সেরকম কোন কথা নেই—এখন যদি সিদ্ধান্ত পাল্টাই, যদি সর্বানীকেই গ্রহণ করি! এইসব আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে বাইরে শো শো হাওয়ার দাপটে মনে পড়ে হঠাৎ সজল হয়ে ওঠা রক্তিম চোখদুটি, অভিমানে আহত ফুলে ওঠা নাকের পাটা আর কাঁপা কাঁপা পুরু ঠোঁটের কম্পন।

মনে পড়ে সেই বর্ষণস্নাত দুপুরে সে সর্বানীর টি শার্ট পরেছিল, চা খাওয়ার পর দুহাত মেলে মেহেন্দী আঁকা হাতদুটি ওর সামনে মেলে ধরেছিল। ওর উজ্জ্বল চোখের তারায় তাকিয়ে পরিতোষ বলেছিল—এক্সেলেন্ট! আর তারপর সেই ভোপাভোপীর তালে তালে নাচ, ঘুরে ঘুরে নাচ আর নাচ। অথচ সর্বানী নাচ জানে না, পরিতোষ নাচ জানে না, ওরা কেউ কোনদিন নাচ শেখেনি। ওরা মন্দিরে আরতি করার মতন পরস্পরকে ঘিরে নাচতে থাকে। নাচতে নাচতে নাচতে নাচতে এত বছর পর একজন পুরুষ অনুভব করে প্রথম প্রেম। হ্যাঁ, সেই মেয়েটিই ওকে সবচাইতে বেশী ভালবেসেছিল। সমস্ত বৈষয়িক চিন্তা ও স্ট্যাটাসজাত হীনমন্যতা ওকে আফশোষের নরকে ঠেলে দিয়েছে। আজ শুধু মাপাহাসি মাপাকথা কৃত্রিম চলন ও গমনসর্বস্ব এক অপ্রেমময় জীবনই ওর বাস্তব। হায় পরিতোষ! হায়! লাভা নদীর আদরে শান্ত পরিতোষ, স্ত্রীর কাছে বারবার প্রত্যাখাত মশারি দড়ির ফাঁদে ঝুলতে থাকা ঘোলাটে আকাশের নীচে উদ্‌ভ্রান্ত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে পাড় ভাঙ্গতে থাকা পরিতোষের আদিম শরীরের পাশে হাজার হাজার প্রদীপের মতন স্মৃতির ব্রণগুলি জ্বলতে থাকে জ্বলতে থাকে জ্বলতে থাকে অনির্বাণ।

পরিতোষ মুমলের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় নেমে দেখে বেশ রোদ। ঘড়িতে বেলা এগারোটা। অবিনাশ কবিরাজ লেন থেকে বেরিয়ে সে মেট্রো স্টেশানের পথে হাঁটে।

মনে মনে বলে,—নট্‌ এনাফ! আবার আসবো সুন্দরী!

বারো

... দুটো একটা বাচ্চা আছে চমৎকার অভিনয় করে
এত আন্তরিক তারা, সত্যি সত্যি আগুনের পিণ্ড চেপে ধরে।

—নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শঙ্খকে এরকম চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ক্লাসের সবাই অবাক। শঙ্খ চোখ মোছে। ওর কিছু ভাল লাগে না। এখন পুকুরের পারে ঘাসে রুমাল বিছিয়ে বসেছিল। যদিও এখানে বসার জন্য সে স্কুল থেকে বেরোয়নি। আজ টিফিন পিরিয়ডে বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়ার ইচ্ছে করেনি বলে টিফিন বক্স নিয়ে এদিকে চলে এসেছে। আর পুকুরের পাশে নিচু জমিতে জমা জলে গাঢ় সবুজ রঙের পাঁচটা ব্যাঙকে অদ্ভুতভাবে ডাকতে দেখে

দাঁড়িয়ে পড়ে। ওরা যখন ডাকছে ওদের গলার কাছে ফুটকামতন কিছু একটা ফুলে ফুলে উঠছে। এরকম সবুজ ব্যাঙ জীবনে প্রথম দেখল—কীরকম ধাতব শব্দে ডাকছে ওগুলি। ওগুলি তো সোনা ব্যাঙ নয়—কিন্তু ঐরকমই বড় বলে শঙ্খ ভাবে, এগুলি নিশ্চয়ই সোনা ব্যাঙ পরিবারেরই সবুজ প্রজাতি, অথবা একই প্রজাতির এই ব্যাঙগুলি চারপাশের সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের মধ্যেই অভিযোজন ঘটিয়েছে। বাবা সঙ্গে থাকলে শঙ্খ এগুলি নিয়ে নানা প্রশ্ন করত। ব্যাঙেদের পাঠশালা আর হাটবাজার নিয়ে অনেক ছড়া বানাত। যেমন — ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ—ট্রা ট্যারা টরর্ ট্যাঙ - ঘ্যাও ঘ্যাও ঘ্যাঙর ঘাও —ক্রমাগত বৃষ্টি থামাও—

রাস্তার পাশেও জল। সারাদিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি। আড়াই মাস ধরেই প্রায় রোজ থেমে থেমে আকাশ কাঁদছে। এই সময় ব্যাঙেদের খুব কষ্ট। আর এই ইছাপুর শ্যামনগর এলাকায় অনেক অনেক পুকুর। লোকে অনেক নীচু জমি ভরাট করে বাড়ি করেছে। কিন্তু বর্ষায় এই সব পুকুর ও নীচু জমি গুলিতে দস্তুরমতন স্রোত বইতে থাকে। জলের তোড়ে ব্যাঙেরা ঠিকমতন খাবার পায় না। সবসময় পেটে খিদে। তাই কিছুক্ষণ নামতা পড়ার মতন প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা—ঘ্যাও ঘ্যাও ঘ্যাঙর ঘাও—ক্রমাগত বৃষ্টি থামাও—চাই না স্রোত চাইনা ঢল—আমরা চাই অল্প মেঘ— আমরা চাই অল্প জল—যখন তখন বৃষ্টি কমাও—ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর ঘাও—

একেকজনের শব্দ শুনে, এমনকি এক আঙুলে পুঁচকে কুনো ব্যাঙের ডাক শুনে মনে হবে না জানি কত বড় সব জীব! ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর ঘাও— বাবা কোথায় এনে দাও—

শঙ্খ চমকে ওঠে। ওরা কি করে জানল শঙ্খর বাবা এখন এখানে নেই! কোথায় গেছে বাবা? ওর চোখে জল ভরে আসে! এ দৃশ্য থেকে ব্যাঙেদের বোধহয় কষ্ট হয় ওরা তাই পড়া থামিয়ে বলতে শুরু করে, - ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ কী যে খাই? লালপিঁপড়ের ঠ্যাং চাই। ঠ্যাং না পেলে গোটা পিঁপড়ে বিষপিঁপড়ের মাথা খাই—মশার মূককীট কোথায় পাই? উঁহু এরা সব ঘাসে লুকায়—দেখতে পেলে ধরে খাই!

ওদের ছড়া শুনতে শুনতে শঙ্খ কিছু পাউরুটির গুঁড়ো ব্যাঙেদের উদ্দেশে জলে ফেলে। তারপরই বোঝে ঠিক এভাবে ওদেরকে খাওয়ানো যাবে না। সে এবার ঘাসের উপর রুমাল পেতে বসে নিজের টিফিন খেতে শুরু করে। বেশ খিদে পেয়েছে যে!

আকাশ মেঘে ঢাকা। পুকুরে অনেক শাপলা ফুল। আর রয়েছে কচুরিপানা। কচুরিপানার ফুল দেখে বিরখাঙ মামার শেখানো বোড়ো লোকগীত মনে পড়ে। বিরখাঙ মামা ঐ গানটি গেয়ে বিদাংশ্রীমাসীর মেয়ে দৈমুকে দিয়ে শঙ্খকে খ্যাপাত। দৈমুর বাবা অখরাঙ মামাও ওর সঙ্গে গলা মেলাত—খানায় ফে থথৌমৌলানানৈ / মেথখা বিবার খানায়া / সৌর জাথৌ দালায় বিননাওয়া ... মানে হলো, ... মাথার উপর চুলের ঝুঁটি, কচুরিফুল মুঠি মুঠি, কে সেই মেয়েটি ...! ছোটবেলায় এই বোড়ো গানের তালে তালে ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতো। এখন দৈমু ক্লাস সেভেনে পড়ে। গতবছর পূজা ভ্যাকেশনে কোকরাঝার গিয়ে শঙ্খ সন্তু মামার সঙ্গে হাগ্রাবাড়ি গেছিল। সেখানে দৈমুকে এই গানটি শোনাতে তার মুখ

লাল হয়ে উঠেছিল। সে দৃশ্য শঙ্খের মনে আছে। সে-ও দৈমুর সঙ্গে আর কোন কথা বলতে পারেনি লজ্জায়। জ্যাম লাগানো পাউরুটির শেষ টুকরো মুখে ঢুকিয়ে চিবাতে চিবাতে শঙ্খ দেখে এক কাছাকাছি কচুরিপানা পরিবারের ভেতর থেকে একটা হলুদ সাপ বেরিয়ে আসছে। সাপটা জলের মধ্যে মাথা উঁচু করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে পুকুরের সীমানা পেরিয়ে জলজমা নীচু জমিতে বসে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করতে থাকা একটা সবুজ ব্যাঙকে সরাসরি আক্রমণ করে। সাপটা বেশ বড়—তিন সাড়ে তিন হাত হবে। সাপের হা-টাও বেশ বড়। এত বড় ব্যাঙটার মাথা ও হাত দুটো হা এর ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। ব্যাঙটার পুরুষ্টু পা দুটি ওর মুখের বাইরে ছটফট করতে থাকে। ছোট আকারের মুরগির ঠ্যাঙের মতন পা দুটির সাইজ। এহেন দৃশ্য শঙ্খ কল্পনা করেনি। ওর বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে? ওর বাবাও এমনি কোন শয়তান সাপের হায়ে ছটফট করছে না তো?

এই ঘটনায় অন্য ব্যাঙেদের ডাকের ছন্দটাও কেমন যেন বেসুরো হয়ে যায়। কোলা ব্যাঙেরা অবশ্য কোন আড়াল থেকে তেমনি ডেকে যাচ্ছে। অন্য সব সবুজ ব্যাঙ দশবারো পা বা এক দুই লাফ এদিক ওদিক সরে গিয়ে আবার ডাকতে শুরু করেছে—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নয়। ওরাও আজকালকার পথের মানুষের মতন অন্যের কষ্ট, হত্যা বা মৃত্যু দেখলে, একটু আহা উঁহু করে ঝামেলার ভয়ে কেটে পড়ছে নাকি? শঙ্খের কষ্ট হয়।

সাপের মুখে ব্যাঙটা যেমন ছটফট করছে, ওটাকে মুখে নিয়ে সাপটাও তেমনি বারবার জায়গা বদলাচ্ছে। মাথা ও লেজ আলাদা আলাদা কোণে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। অথচ অন্য ব্যাঙগুলি সব নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছে। সাপটা তো ওদের কমন শত্রু। ওদেরই ভাই বন্ধু ও পূর্বজদের খেয়ে খেয়ে এত বড় হয়েছে। ভবিষ্যতে ওদের মধ্যে কাউকেও এই সাপটা খাবে, বা সবাইকেই খাবে, অথবা ওরই মতন অন্য কোনো সাপ—অথচ এরা কত অসহায়। শঙ্খের হাতের কাছে কোন ইট বা পাথরের টুকরো নেই যে ছুঁড়ে মারবে। সে শুধু পথের পাশে কিছু ছোট ছোট নুড়ি পেয়ে সেগুলিই ছুঁড়ে মারতে থাকে। কিন্তু একটাও সাপটার কাছাকাছিই পৌঁছয় না। যেখানে পড়ে জলের মধ্যে সামান্য কয়েকটা বৃত্ত তৈরি করে, সেই বৃত্তগুলি বড় হয়ে মিলিয়ে যেতে যেতে তার বৃহত্তর পরিধির সামান্য দোলা হয়তো সাপটার গায়ে লাগে। কিন্তু সে এখন এমন একটি নধর ব্যাঙ খেতে ব্যস্ত বলে পাত্তাই দেয় না। বিজ্ঞানে পড়েছে শঙ্খ, পৃথিবীর নিয়মই এটা—খাদ্য আর খাদকের সম্পর্ক। এই ব্যাঙেরাই যেমন অসংখ্য পোকামাকড় খায়। অবশ্য এবারই গ্রীষ্মের ছুটিতে একটা উল্টো ঘটনাও দেখেছে সে। নাগাঝাংকায় ওদের নিজস্ব পুকুরের পাড়ে একটা বড় কোলা ব্যাঙকে বিপদে পড়তে দেখেছে। ঠাকুমা ও পিসিকে ডেকে দেখিয়েছে। পোকার বদলে ভুল করে ব্যাঙটা ছিনে জোঁক খেতে গেছিল। কিন্তু ছিনে জোঁকেরা এত মারাত্মক যে মানুষ মেরে ফেলে। পিসি বলে, তোর ঠাকুর্দার বাবা, আমাদের ঠাকুর্দা এই পুকুরে স্নান করতে নামলে মোক্ষম জায়গায় ছিনে জোঁক ধরেছিল, ঠাকুর্দা টের পাননি। কিন্তু খানিক পরই শরীর খারাপ লাগলে জল থেকে ওঠার সময় দেখেন গামছার বাইরে লাল লাউএর মতন ঝুলছে কয়েকটা ছিনে জোঁক। তিনি হতভম্ব হয়ে সবার নাম ভুলে যান। এদিকে জোঁকগুলি আরো রক্ত শুষে নিচ্ছিল। শুধু 'আয়

তোরা দেখে যা, তোরা বাঁচা' বলে ডাকতে থাকেন। বাবা শুনতে পেয়ে ছুটে গিয়ে লবণ দিয়ে ছাড়ায়। সেগুলি পুকুরের পারে এক এক তাল গোবরের মতন পড়ে লবণের প্রভাবে গলে যায়। চারপাশ লাল হয়ে যায়। ঠাকুর্দা ততক্ষণে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। চা-বাগানের হেলথ্ সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি মারা যান। এই হেলথ্ সেন্টার ঠাকুর্দার নিজের হাতে তৈরি। সামান্য কম্পাউন্ডার হয়েও তিনি তিল তিল করে একটা ডিসপেনসারিকে ত্রিশ বেড সম্পন্ন হেলথ সেন্টারে পরিণত করেন। শহরের সরকারি হাসপাতাল থেকে রিটায়ার করার পর অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তিনিই এই হেলথ সেন্টারে একজন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসেন। সেই ডাক্তারবাবু সেদিন ওকে মৃত ঘোষণা করে কেঁদে ফেলেন। এই লোকটাই যে ওকে এত সুন্দর পরিবেশে সহজ সরল গরীব মানুষগুলির সেবার জন্যে ডেকে এনেছিল—তা ডাক্তারবাবু ভুলবেন কেমন করে! বলতে বলতে পিসির চোখেও জল চলে আসে।

এহেন ছিনে জোঁককে জিহ্বায় নিয়ে সামান্য কোলা ব্যাঙকে তো বিপদে পড়তে হবেই। উল্টো জিহ্বা দিয়ে জোঁকটাকে অন্য পোকার মতন জড়িয়ে গলাধঃকরণ করতে না করতে ব্যাঙটা আবার যন্ত্রণায় ঐ জিহ্বা বাইরে বের করতে বাধ্য হয়। তারপর সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। ওর জিহ্বা থেকে রক্ত চুষে জোঁকটা একটা বলের মতন ওর মুখে আটকে যায়। ব্যাঙটা মুখ বন্ধ করতে পারে না। শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে ওর তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। কিন্তু জোঁকটা ছাড়ে না। ধীরে ধীরে ব্যাঙটার সমস্ত রস শুষে নিয়ে চিমসে করে ছেড়ে দেয়। ব্যাঙটা দুর্বল লাফে এক দুই পা এগিয়ে গেলেও, ঝিম মেরে পড়ে থাকতে থাকতে একসময় মরে যায়। এবং সেদিন বিকেলেই দেখেছে শঙ্খ মরা ব্যাঙটাকে একঝাঁক পিঁপড়ে কাঁধে নিয়ে কোন অজানা গন্তব্যের দিকে চলেছে।

অজানা গন্তব্য কথাটা শঙ্খ ঠাকুর্দার কাছে শিখেছে। ঠাকুমা কিম্বা পিসির গল্পে এরকম ভারী ভারী কথা থাকে না। মা-মাসি-দিদিমা ও মামাবাড়ির সবাই মোটামুটি সহজ ভাষায় কথা বলে। ঠাকুর্দার বাবা মরিয়ানী হাইস্কুলে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বাংলাও ছিল তৎসম এবং তদ্ভব শব্দভরা। বাবাও অবশ্য মাঝেমধ্যে এরকম ভারী শব্দে কথা বলে। এভাবে কথা বলতে শঙ্খেরও ভাল লাগে। এরকম বাংলার সঙ্গে শুদ্ধ হিন্দীরও অনেক মিল রয়েছে। দুটো ভাষাই বহু বছর আগে নাকি সংস্কৃত থেকে জন্ম নিয়েছিল। শঙ্খর বিশ্বাস সেজন্যেই সে রঙ্গাডা সেন্ট্রাল স্কুলে পড়ার সময় বরাবর হিন্দী ও সংস্কৃতে ভাল নম্বর পেত। শ্যামনগর সেন্ট্রাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরও এই দুই বিষয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার পাচ্ছে।

শঙ্খ বড় হয়ে একজন অধ্যাপক হতে চায়। একজন জ্ঞানী অধ্যাপক। যার দিকে সবাই শ্রদ্ধায় মাথা উঁচু করে তাকাবে। যার কাছে সবাই অনেক কিছু জানার জন্যে, শেখার জন্যে আসবে। দেশ বিদেশে ওর নাম ছড়িয়ে পড়বে। দূর-দূরান্ত থেকে ভাল ছাত্ররা ওর কাছে পড়তে আসবে। একথা মাকে বলায় মা খুব খুশি হয়েছিল। বাবার চোখ চকচক করে উঠেছিল। শঙ্খের মা-বাবা শঙ্খের সঙ্গে বেশ বন্ধুর মতন মেশে। শঙ্খও স্কুলের গল্প, মাস্টারমশাইদের গল্প, বন্ধু বান্ধবীদের কথা বাবা-মায়ের কাছে বলে। দুজনেই শঙ্খর খুব

প্রিয়।

কিন্তু ওর খারাপ লাগে বাবা-মায়ের ঝগড়া। ছোটবেলা থেকেই দেখেছে কথায় কথায় ওরা ঝগড়ায় লেগে যায়। অবশ্য কেউ বাজে কথা বলে না, স্কুলের বাচ্চাদের মতন মারামারি করে না। কিন্তু খালি পরস্পরের খুঁত ধরতে থাকে। আর এই ঝগড়াটা ওর অগোচরেই বেশি হয় অথবা ও যখন ঘুমিয়ে থাকে। শঙ্খ অনেকবারই জেগে উঠে অবাক হয়েছে, বিরক্তিতে ভরে গেছে চারপাশ, দুজনের কথাবার্তা শুনে যার বেশি দোষ মনে হয়েছে—বলে দিয়েছে। সে বেশ স্পষ্ট বক্তা। আর ঝকঝক করে বলে দিয়ে সে অবাক হয়েছে, এত বড় বাবাটা এত বড় মা-টা ওর বকা খেয়ে কেমন চুপ মেরে গেছে। কিন্তু সবসময় বড়দের বিচার করতে কার ভাল লাগে!

তোমরা আমার বাবা-মা, তোমরা পাশাপাশি থাক, কারো কোন কাজ বোকামি মনে হলে বা অন্যায় মনে হলে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারো, আদর করতে করতে বলতে পার, এত বড় হয়েছ, এখনও এই সামান্য জিনিষটা বোঝ না? তোমরা ঝগড়া করতে থাকলে, সবসময় হুলো বেড়ালের সঙ্গে মেনি বেড়ালের মতো পরস্পরকে ঘাড় ফুলিয়ে বকতে থাকলে বা রাগ করে কথা বন্ধ করে দিলে আমি কোথায় যাই।

আবার একে অন্যকে ছেড়েও থাকতে পারো না—রাগ করে কথা বন্ধ করে দিলেও—শঙ্খ তোর বাবাকে এটা বল—শঙ্খ তোর মাকে ওটা বল্—করে কথা চালিয়ে যাও। এটা কি জীবন? তোমরা আলাদা আলাদা করে এত ভাল—অথচ দুজনে মিলে এতো মুখকালো কেন? তোমরা কী জানো, সেরকম সময়ে যখন তোমাদেরকে সামলাই, তোমাদের ঝগড়াকে ম্যানেজ করি, আমার কিন্তু এক মুহূর্তও ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না, সেজন্যেই তো ক্রিকেট মাঠে ইচ্ছে করে লোকের কাচের জানালা দেখে ছক্কা মারি, ফুটবল মেরে লোকের সাইকেলের স্পোক ভেঙে দিই, মাডগার্ড চ্যাকাবোকা করে দিই—কেউ কেউ তোমাদের কাছে কমপ্ল্যান করে, ক্ষতিপূরণ নিয়ে যায়।

কোনদিন কালেভদ্রে রাতে বাথরুম যাওয়ার সময় বিছানায় তোমাদেরকে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখলে আমি কি যে খুশি হই তা তোমাদেরকে বোঝানো যাবে না। সেদিন আনন্দে আমার দারুণ ঘুম হয়। স্বপ্ন দেখি, তোমাদের মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। দুজনে আমাকে নিয়ে 'অ্যাকোয়াটিকা গেছো, কিংবা পুরীর সমুদ্রে। সেখানে জলের মধ্যে আমরা খুব খেলা করি, জল ছিটাই। আমরা কোল্ড ড্রিংকস কিম্বা আইসক্রিম শেয়ার করে খাই, মায়ের ঠোঁট ও বাবার গোঁফ আইসক্রীমে ল্যাটাপ্যাটা হয়। আমি স্বপ্ন দেখি তোমরা একে অন্যকে ভালবাসছ।

বাবা ঘরে খুব অগোছালো, এই নিয়েও মায়ের সঙ্গে কত ঝগড়া হয়। অথচ বাইরে বাবা ভীষণ পরিপাটি। বাবার অফিসে গিয়ে দেখেছে শঙ্খ—কিরকম টিপটপ, ছিমছাম সাজানো, মিউজিয়াম তো আরো সুন্দর এবং দেখার মতন। মা বলে,—ওগুলি থুড়ি তোর বাবা সাজায়, ওগুলো স্টাফরা সাজিয়ে রাখে, তোর বাবা শুধু খবরদারি করে!

শঙ্খ বলে,—না মা, বাবা না চাইলে সবকিছু এরকম সিস্টেমেটিক হত না, অফিসের

ব্যাপারে বাবা কিন্তু ভীষণরকম মেটিক্যুলাস। সেটা তোমাকে মানতেই হবে। যেমন ঘরের ক্ষেত্রে তুমি। তেমনি বাইরে বেরিয়ে তুমি হিসেবের বাইরে খরচ করে ফেলো।

মা গাল ফুলিয়ে অভিমান করে বলে,—বল্, বল্, বাপের ব্যাটাই তো! শঙ্খ তখন মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে,—আরে খরচটাতো আমাদের জন্যই করো! সেজন্যে এ নিয়ে বাবা গজরগজর করলে আমার ভাল লাগে না!

বাবা বলে,—হিসেব করে চললে সবার জন্য আরো বেশী করা যায়, আমার যা আয়, তার মধ্যে ব্যয় করেই সবার জন্যে করতে হবে আবার ভবিষ্যতের জন্যও জমাতে হবে!

একথা শুনে মায়েব চোয়াল শক্ত হয়। আগুনে দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকায়। শঙ্খ প্রমাদ গোনে। শঙ্খ জানে এসব ঝগড়ার কোন শেষ নেই। তাই সে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দুজনকেই চুপ করিয়ে দেয় কিংবা অন্য কোন গল্প বলে, অন্য কোন প্রসঙ্গ তুলে তেতো কথাবার্তা থেকে দুজনকে সরাতে চায়। ওদের ঝগড়া এখন সবাই জেনে গেছে। মরিয়ানী থেকে কোকরাঝার ওদের নিজের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির সবাই জানে কী এক অজানা কারণে দুজন দুজনকে ভালবাসে না, আর খালি ঝগড়া করতে থাকে। এই ব্যাপারটাই শঙ্খকে সবচাইতে বেশি কষ্ট দেয়।

আচ্ছা, এবারও কি বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, ওর ওপর রাগ করেই ঘর ছেড়েছে? বাবা কি কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানে সাধু হয়ে কিংবা সেবাইত হয়ে চলে গেছে? বাবার কি একবারও শঙ্খের কথা মনে পড়ে না। এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাবা একটিবারও ওর কথা ভাবল না? শঙ্খর কপালের দুপাশে দপদপ করে। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

শঙ্খ যে দুজনকেই চায়। শঙ্খ যে সবসময় ওদেরকে হাসিখুশি দেখতে চায়। রাগ করে চলে গেলেও শঙ্খের কথা ভেবেও কি বাবা ফিরে আসতে পারছে না? এসব ভাবতে ভাবতে শঙ্খর চোয়াল শক্ত হয়। সে নিশ্চিত যে আর যাই হোক বাবা শুধু রাগ করে ওদের থেকে দূরে থাকবে না! তাহলে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। সাপটা এখনো আগের থেকে বেশি গিলতে পারেনি। বা সামান্য গিলেছে। ওর মুখে সবুজ ব্যাঙটার ঠ্যাং দুটো এখনো থরথর করে কাঁপছে। পা দুটোর রঙ শুকিয়ে এখন কালচে, ফ্যাকাশে কালচে হয়ে পড়েছে। শঙ্খ উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে কিছু খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে একসময় সে এক ফালি মরা গাছের ডাল পায়। তখুনি ঢং ঢং করে রিসেস শেষ হওয়ার ঘন্টা শোনা যায়। শঙ্খ ডালটা তুলে ও ব্যাঙধরা সাপটার দিকে ছুঁড়ে মারে। ডালটা গিয়ে সাপটার লেজে পড়ে। সাপটা এরকম অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবু সে ব্যাঙটাকে মুখে নিয়েই দূরে চলে যায়। কচুরিপানার ভিড়ে ঢুকে পড়ে।

তবু সাপটার লেজে ওর ছোঁড়া ডালটা আঘাত করায় শঙ্খ খুব খুশিমনে স্কুলের দিকে ছোটে। কিন্তু গেটের কাছে যেতেই দেখে সব ছাত্ররা হুড়হুড় করে বেরুচ্ছে। সে কী আজ তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিলো নাকি? শঙ্খ ক্লাসে ঢুকে ব্যাগটা তুলে বেরুনোর সময় দেখে দপ্তরি কৃষ্ণ আংকেল তালা লাগাতে চলে এসেছে। সে বলে, আংকেল তাড়াতাড়ি ছুটি

হলো কেন?

কৃষ্ণ আংকেল অবাক চোখে তাকিয়ে বলে,—তাড়াতাড়ি কোথায়? এখন তো প্রায় দুটো বাজে! টিফিনের পর ক্লাস ফাঁকি দিয়েছো বুঝি? কোথায় গেছিলে?

শঙ্খ অপরাধীর মতন বলে,—আমি বুঝতেই পারিনি, ওদিকের পুকুরের পাড়ে বসে টিফিন করছিলাম।

কৃষ্ণ আংকেল বলে, ভেরি ব্যাড, টিফিন করতে এত সময় লাগে? ভেরী ব্যাড! ঠিক কী করছিলে বলতো?

শঙ্খ বলে,—টিফিনই করছিলাম, আসলে একটা সাপ ইয়া বড় তিন সাড়ে তিন হাত লম্বা—

—কী সাপ?

—হয়তো ঢোঁড়া, সে সাপটা একটা অ্যাত বড় সবুজ ব্যাঙকে মুখে পুরে নিয়েছিল!

কৃষ্ণ আংকেল হেসে বলে, ব্যাঙ তো সাপের খাদ্য, সে আর এমন কী আশ্চর্য কথা, কিছু সবুজ ব্যাঙ--টপ দিচ্ছ না তো?

—না আংকেল, আসি আজকে, গুড ডে! বলেই শঙ্খ ছুটতে শুরু করে।

কৃষ্ণ আংকেল বলে,—গুড ডে! কিন্তু তুমি এটা ভাল করনি। বাড়িতে রি-পো-র্ট যে-তে পা-রে!

শঙ্খর হাসি পেয়ে যায়। সে তো চায়—যে বাড়িতে তার নামে অনেক অনেক অভিযোগ যাক। তাহলে যদি বাবা মায়ের চৈতন্য হয়। অভিযোগকে সে ভয় পায় না। কিন্তু ক্লাস মিস্ হয়েছে বলে সত্যি সত্যি কষ্ট পায়। সে ক্লাস পালানো একদমই পছন্দ করে না। তাকে যে অনেক বড় হতে হবে—জ্ঞানী অধ্যাপক!

স্যার ও ম্যাডামদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কৃষ্ণ আংকেলও কেমন স্যারদের ভাষায় কথা বলে। সাইকেল চালাতে চালাতে শঙ্খ ভাবে, আসলে তিনিও তো একজন বাবা! একথা ভাবতেই নিজের বাবার মুখ মনে পড়ে। মুহূর্তেই সে কৃষ্ণ আংকেলের প্রতি সমস্ত বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে। আর মনে মনে কল্পনা করে, আজ হয়তো বাড়ি ফিরে দেখবে বাবা ফিরেছে। মা আর বাবা ডাইনিং টেবিলে বসে গল্প করছে; ওকে দেখেই বলবে, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে আয়—ভীষণ খিদে পেয়েছে—তোর জন্যেই অপেক্ষা...! শঙ্খ ব্যাগটাকে টাংকের উপর রেখে রুমাল দিয়ে মুখ মুছবে। জুতো মোজা খুলবে তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে স্মাইল করে দাঁড়াবে। বাবা হেসে বলবে,—আই হীরো, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে আগে, তারপর অনেক গল্প আছে!

শঙ্খ তখন তাড়াতাড়ি বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে লিকুইড সোপ দিয়ে হাত ধোবে, মুখে জলের ঝাপটা দেবে, বাথরুমে ঢুকে হিসু করে পা ধোবে। বাবা একদমই খিদে সহ্য করতে পারে না যে।

এরকম সুন্দর চিন্তায় ওর সাইকেলের গতি বেড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও কয়েকজন সাইকেল আরোহী ছাত্রকে পাশ কাটিয়ে, দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনার খাঁচাগাড়ি পেরিয়ে ব্যারাকপুর নৈহাটি রোডে এসে পড়ে। বাস ট্যাক্সি লরি অটোরিক্সা আর সারি সারি স্কুলের খাঁচাগাড়ি। খাঁচার ভেতরে বসে বাচ্চারা হৈ চৈ করে আর ধোঁয়ার জ্বালায় চোখ কচলায়। শঙ্খেরও চোখ জ্বালা করে।

কিন্তু আজ ওর পা দুটি যেন যন্ত্রের মতন চলছে। সাইকেলটা যেন হাওয়ায় উড়ছে। অবশ্য ওকে কিছুটা সতর্কও থাকতে হয়। প্রয়োজনে গতি কম বেশি করতে হয়। ইছাপুর-মানিকতলা পেরিয়ে গতি আরো কমাতে হয়। দুটো ছেলে একদল ভেড়া নিয়ে যাচ্ছে। একজন মাদারি তিনটি নানা আকারের বাঁদর নিয়ে যাচ্ছে। শঙ্খ এই মাদারি ও বাঁদর তিনটিকে চেনে। একটা মা বাঁদর একটা বাবা বাঁদর ও একট বাচ্চা বাঁদর ; রানী, রাজা ও প্রিন্স মাদারি ওদেরকে এই নামেই ডাকে। কিন্তু শঙ্খ মাদারি লোকটাকে মোটেই পছন্দ করে না। সে বাঁদরগুলিকে খুব মারে। বিশেষ করে রাজাটা দুষ্টু ও গোঁয়ার বলে ও বেশি মার খায়। মারের চোটে ওর পিঠে ঘা হয়ে গেছে। মাদারি সেখানে লাল ওষুধ লাগিয়েছে। কিন্তু তবু ঘাটা বেশ দগদগে। শঙ্খ দূর থেকে দেখে ওদের গেটের সামনে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে একজন—হাসি হাসি মুখ। ডুগডুগ ডুগডুগ ডুগডুগ ডুগডুগ— মাদারি ডুগডুগি বাজায়। শঙ্খের মাথা ঝনঝন করে। হয়তো রক্ত ছলকে ওঠে। ডুগডুগ ডুগডুগ! মা এর সঙ্গে কথা বলছে কেন? বাবা এই লোকটাকে দু-চোখে দেখতে পারে না। শঙ্খ ভাবে লোকটার গায়ে সাইকেল চড়িয়ে দেবে, লোকটার সাদা প্যান্টে টায়ারের কাদা লাগিয়ে দেবে!

কিন্তু ভেড়াগুলির জন্যে ও গতি বাড়াতে পারছে না। সারি সারি অটোরিক্সা ও মারুতি ভ্যান ওকে ডানদিকে যেতে দিচ্ছে না। ও যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে চলে। তখুনি কেউ একজন ওর জামা খামচে ধরে বলে -- অ্যাই শঙ্খ!

শঙ্খ চমকে উঠে ডানদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। আনন্দে ওর চোখদুটি চকচক করে ওঠে।

তেরো

...এখন আমি ঠোঁট দিয়ে দেখি, চোখের মধ্যে
জিভ কিলবিল করে
কলঘরের আয়নায় আমি শরীর দেখছি
সর্বাঙ্গে দাঁত আর নখ।—**মন্দাক্রান্তা সেন**

সকাল থেকেই আকাশটা মেঘে ঢেকে আছে। বাতাস স্তব্ধ। জানালা খুলে দিলেও ঘরে বাতাস ঢোকে না। পূর্ণগতিতে ফ্যান চালিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে সুরতি। প্রতিটি খবর মনোযোগ দিয়ে পড়েছে। প্রত্যেক পাতার প্রত্যেক লাইন পড়েছে। নিখোঁজ বার্তা, হারানো প্রাপ্তি সংবাদ অংশটা বারবার পড়েছে। আগে কোনোদিন এগুলি পড়ত না। কিন্তু আজ অজান্তেই ওদিকে চোখ চলে যায়।

পরিতোষ আজও ফেরেনি। শঙ্খ স্কুল থেকে ফিরলে সত্যি সত্যি পুলিশে খবর দিতে যাবে সুরতি। গতকাল দুপুরেই শঙ্খ যেতে চেয়েছিল। অনেক চিন্তা করে সুরতি যায়নি। পুলিশে ছোঁয়া মানেই তো আঠারো ঘা! ওরা যে কী কী জেরা করবে কে জানে? প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার হওয়ার ভয়েই গতকাল যায়নি। কী জবাব দেবে সে ওদের প্রশ্নের? লোকটা ঝামেলায় ফেললো বটে!

পরিতোষের এহেন ব্যবহারে সুরতি অবাক। ওদের দাম্পত্য কলহের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। কিন্তু খাওয়া আর ঘরে ফেরার ব্যাপারে পরিতোষ কখনো নড়চড় হয়নি। ওর এই বিশ্বস্ততা এবং পাশাপাশি বুকে আগুন নিয়ে বেঁচে থাকার কথা ভেবে সুরতি মাঝেমধ্যেই বিহ্বল হয়ে ওঠে, দুই চোখ জলে ভরে আসে। কখনো আত্মীয় স্বজনদের কথার মধ্যে, এমনকি বাপের বাড়ির লোকজনদের কথায়ও একটা বিদ্রূপ, একটা তীব্র শ্লেষ টের পায়, সে নাকি সবসময় শাক দিয়ে মাছ ঢাকে, জীবনযাপন সবই নাটক!—'সত্যি বল তো?' প্রশ্নটা নানাজনের কাছে শুনে শুনে ওর মনে হয় যাই জবাব দিক না কেন সবাই আসলে ওকে জিজ্ঞেস করে—তুই এত মিথ্যাচারী, কেন? তোর এই বাজারপ্রিয়তা, সাজগোজ আর যত কোম্পানির যত ধরণের আভরণ বাজারে এসেছে, যেন জ্যোৎস্নায় দেমাকধারী আঁচল খুলবি, এখনও? তুই এত অবুঝ, স্বামী-সংসার বুঝলি না? পরিতোষকে বুঝে চলবি না তুই?

সুরতি মনে মনে জবাব দেয়,—আমি যে সহজ হয়ে বাঁচতে চাইনি, আমি যে পুরুষ জাতটাকেই ঘৃণা করি, ওদের অতিরিক্ত নিরাপত্তাবোধ অসহ্য লাগে—ওর কাব্য তৃষ্ণাও আমার কাছে পাগলামি! সেইসব মোহ অনেক আগেই কেটে গেছে। তবে ওর প্রতি একটা সিমপ্যাথি আছে বটে, সেটা অস্বীকার করতে পারব না! সুরতি ভাবে, সেই যে রত্নাডার ঘরে সিলিঙ ফ্যানে শাড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম! ঘুমের ট্যাবলেট, কেরোসিন, ইঁদুর-ছারপোকার ওষুধ, গ্যাসস্টোভ অন করে দুঃসাহস কিম্বা জলে ডুবে মরতে 'গেলে পরিকল্পনার জন্য সময় লাগে। আমার পক্ষে পরিকল্পনা করে কোনকিছু করা

মুশকিল, আমি ছোটবেলা থেকেই পরিকল্পনা করে কিছু করতে পারিনি। মনটা ভীষণ চঞ্চল। তাই আমাকে কেউ বোঝে না, ভুল বোঝে এটাই আমার কষ্ট!

ভেবেছিলাম কোনদিন প্রেম করব না, আর করলেও শুধু ভালোলাগা ভালোবাসা অবধিই! কিন্তু বাস্তবে সব অন্যরকম হয়ে গেল! ভেবেছিলাম, বিয়ে করব না, প্রাইভেট স্কুল হলেও ওখানে সারাজীবনই মাস্টারি করে যেতে পারতাম। কোকরাঝারে সেটাই একমাত্র বাংলা প্রাইভেট স্কুল আর বাংলা মিডিয়াম সরকারি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল রয়েছে একটা, যেখানে আমরা সবাই পড়াশুনা করেছি। একদিকে আসাম সরকারের বাঙালি বিদ্বেষী নীতি, অন্যদিকে বোড়ো আন্দোলন। বাঙালির অস্তিত্বই যেখানে বিপন্ন সেখানে বাঙালিরা জোটবদ্ধ। তাই সেই স্কুলটা উঠে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, আর আমার চাকরিও থাকত! বেতন যতই সামান্য হোক তা দিয়ে আমার আর মায়ের ঠিক চলে যেত। কিন্তু সেই মা আর বৌদিই আমাকে বোঝাল, ছেলেটা পরিশ্রমী, কেরানির চাকরি করলেও ইতিমধ্যেই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছে প্রাইভেটে পড়াশুনা করে। মনটাও খুব ভালো। বয়সকালে মানুষের সঙ্গীর দরকার হয়। ওরা আরো অনেক কিছু বলে বোঝাল আর আমি বোঝলাম। এবং বিয়ে করলাম এত দূরে যে বছরে একবারের বেশি মাকে দেখতে যাওয়া যায় না। সামর্থ্যে কুলোয় না। মাঝেমধ্যে তো একবার যেতেই হাওয়া বেরিয়ে যায়। অবশ্য এদিক থেকে মরিয়ানি থেকে কাছে, তাই মরিয়ানির তুলনায় কোকরাঝারই বেশি যাওয়া হয়। সেজন্যে অবশ্য আমার তেমন ক্ষোভ নেই। আমার কষ্ট কেউ আমাকে বুঝল না বলে!

ভেবেছিলাম, পরিতোষ আমার মনের মতন হয়েছে—সে অন্তত আমাকে বুঝবে। কিন্তু সে যা দেখেছে, চোখে দেখা সবকিছুই যে সবসময় বাস্তবে ঠিক হয় না তা আমি কাকে বোঝাবো! সেজনাই সিলিঙ ফ্যানে ফাঁস দিয়ে ঝুলতে গেছিলাম। কিন্তু জানালা দিয়ে পরিতোষ তা দেখতে পেয়ে ছোট ছোট নুড়ি ও ইটের টুকরো তুলে ঢিল মারতে লাগলো। বিছানার উপর রাখা টুলের পায়ে, আমার পায়ে ঢিল পড়ে। ঐ ঢিলকে আমি পরোয়া করতাম না। কিন্তু একটা ঢিল ছিটকে গিয়ে দোলনায় ঘুমিয়ে থাকা দশমাসের শিশু শঙ্খের দোলনায় ওর পায়ের কাছে পড়ে।

আমি বলি,—খবরদার ছুঁড়বে না, শঙ্খর লাগবে!

ও তবু ছুঁড়তে থাকে। পাগলের মতন চোখমুখ ওর। একটা বেশ বড় নুড়ি শঙ্খর দোলনায় ঠং করে লাগলে শঙ্খ জেগে ওঠে কাঁদতে শুরু করে। আমি আত্মহত্যা ভুলে যাই। দরজা খুলে দিতেই ও ঘরে ঢুকে আমাকে চড় কষায় দুটো। আঃ কী পুরুষালি, এখনো ভাবলে চোখে জল চলে আসে -- দুগালেই লাল দাগ পড়ে গেছিল। আমিও তখন ওর উপর ঝাঁপিয়ে কিল চড় ঘুষি চালাই। ছোটবেলা থেকেই কেউ আমাকে মারলে আমি উল্টো না মেরে পারি না। কিন্তু আমার উল্টো মারে পরিতোষের কিছুই হয় না। আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বাথরুমের বড় জলভরা গামলায় চুবিয়ে দেয়। তারপর মাথায় জল ঢালতে থাকে। আমি শান্ত হয়ে যাই এবং ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকি। তখন সে আমাকে ঘরে এনে জামাকাপড় ছাড়িয়ে হালকা যোধপুরি লেপের নিচে ঢুকিয়ে নেয়। তারপর ফিসফিস করে বলে, — কথা দাও মৃত্যুর আগে মরবে না! কত শব্দ কত গন্ধ কত রঙ এই পৃথিবীর

—দেখতে হবে না? শুঁকতে ও শুনতে হবে না? তোমার রক্তমাংস দিয়ে তৈরি সন্তানকে এসব কিছু চেনাতে হবে না? অবিশ্বাস হলে, তুমি ওকে ছুঁয়ে দেখো, মনে হবে নিজেকেই ছুঁলে ; অবিকল তোমারই মতন! এইজন্যই, একে বড় করার জন্যই বেঁচে থাকা! নাহলে আমি কেন বেঁচে আছি বলতে পারো?

সুরতির তখন কোকড়াঝারে ছোড়দির শ্বশুরবাড়ির দুর্গাপূজার মোষবলির দৃশ্য মনে পড়ে। মোষটার ঘাড়ে ঘষে ঘষে মাখন লাগিয়ে নরম করা হয়। পরিতোষের কথার ধরনও এমনি লাগে। এতটা মাখন প্রলেপ লাগানোর পর শেষ লাইনে মনে হয় খাঁড়ার ঘা। জানি বাবা, এতবছর ধরে বারবার অহং-এ আঘাত লাগলে অনেক পুরুষই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না, তুমি রেখেছ, তোমার আর কিছু করার এলেম নেই – তাই করনি। তাই ঘ্যানরঘ্যানর, তুমি তাই সেদিন শিল্পীদের আত্মহত্যার প্রবণতার কথা শোনাও—অরলিন্‌স, ভ্যান গগ, সক্রেটিস, আর্নেষ্টি হেমিংওয়ে, মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান!

আমার করুণা হয়। এটাই কি 'মৃত্যুচেতনা' বা 'মৃত্যুবোধ'? হাস্যকর ঠেকে। তুমি নিজেকে এত ভালবাস, আঙুল কাটলে আফটার শেভিং লোশন লাগিয়ে হাত উপরে তুলে রাখো, তুমি করবে আত্মহত্যা? কিন্তু মনের হাসি মনেই চেপে রাখি। চোখমুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলি। কিন্তু বারবার একই ধরনের ভ্যানরভ্যানর শুনে শুনে মনে মনে রাগ বাড়তে থাকে, বুঝতে পারি, কোনদিন আর পরিতোষের মন পাওয়া মুসকিল! নিজের উপর ঘেন্না ধরে যায়। কে যেন কানের কাছে বলতে থাকে—'তুই মর, তুই মর'! মরেই যেতাম শালা! তুই বলতে থাকিস ভ্যানর ভ্যানর, আমি করে দেখাতাম, আমি করেই দেখাতাম, কে জানতো যে তুই এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি! যাই হোক, আপাতত যা করেছি—তোর ডায়ালগ শুনে মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন এমনকি সারাজীবনও কাবু থাকতে পারিস। সন্তান না ছাই, হত্যা কিংবা আত্মহত্যাকে ভয় পাস তুই। তোর বসন্তকুমারকে শায়েস্তা করার গল্প বিশ্বাস হয় না। ঢপ! লেখক মাত্রই ঢপবাজ। তুই তো ঢপেশ্বর! কিন্তু আমার অভিনয় ধরার ক্ষমতা তোর নেই, তুই ডালে ডালে চললে আমি পাতায় পাতায় —

আসলে তোর কোন দোষ নেই, আমি মনে মনেও তোকে কোনভাবে কোনকিছুর জন্যে দায়ী করি না। আসলে তুই একটা ভোদাই। বিয়ের রাতেই তোকে এই কথাটা বলেছিলাম। তুই তখন মজা ভেবে হেসেছিস্। তুই তখন জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা পাওয়ার আবেগে থরথর। তোর চুমু ও আদরে আমিও উত্তেজিত হচ্ছিলাম। কিন্তু সে রাতে রাজি হইনি। বিয়ের একদিন আগেই সেবার হঠাৎ অসময়ে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেছিল। সেকথাই তোকে জানালাম, আর তুই-ও ভিজে বেড়ালটির মতন গুটিয়ে গেলি। উশ্‌খুশ করলি।

ফুলশয্যার রাতে আমি প্রথম তোর হাতে নিজেকে সঁপে দিই। সেটাই ছিল শেষ স্রাবের দিন। ছোটবৌদি বলেছিল, 'শরীর খারাপে' অন্য মজা, তোমার দাদা তো .... পাশাপাশি আমিও অন্য কিছু ভাবলাম আর তোকে 'অল ক্লিয়ার সিগন্যাল' দিলাম। হাদারাম বর্তে গেলি। অন্ধকারে প্যাড আঁটা প্যান্টি সরিয়ে করার পর স্রাবের রক্তে হাত ভিজিয়ে ভাবলি কী না ফাটিয়ে ফেলেছিস্। হতভাগা!

আমার কিন্তু তোর জন্যে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি অসহায়। এছাড়া কি-ই বা করতে পারতাম। দুবছর আগেই পাগলদিয়া নদীর তীরে বসানো অস্থায়ী তাঁবুতে এক বিহু উৎসবের বিকেলে একা পেয়ে একটা অসুর আমার সর্বনাশ করেছিল। আমিও কামড়ে তার বাজুর অংশ কেটে নিয়েছি। এর আগে আমার কিল চড় আঁচড় সব ব্যর্থ হয়েছে। ওই ধুমসো লোকটার সঙ্গে জোরে পারিনি। আমি তখন পলকা এক লিকলিকে মেয়ে। আমার চিৎকার ঢাকা পড়েছিল অনেক অনেক খামের বোলে। এছাড়াও বাইরে বাজছিলো চেরজা—জথা-থরফা। খামের বোলে বাগুরুম্বা নাচছিলো শিশুরা। অবশেষে লোকটা আমার গায়ে এলিয়ে পড়লে মরণ কামড় দিয়েছিলাম ওর বাজুতে। লোকটা আমাকে বিরাশি সিক্কার দুই চড় মেরে অজ্ঞান করে দেয়। আমি ঐ ঘরে নিস্তেজ পড়ে থাকি। তারপর যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখি আমার পেট ও উরু, খাটিয়ায় বিছানো জড়োসরো বিছানার চাদর আমার রক্ত আর লোকটার নোংরা দুর্গন্ধময় চটচটে ন্যালপা ন্যালপা বীর্যে ভরে আছে। ঘেন্নায় আমার পেট মোচড়াতে থাকে। কোনমতে উঠে মেখলা ইত্যাদি ঠিক করে বিদাংশ্রীদের বাড়ি ফিরে ওদের কলতলায় বসে বমি করতে থাকি, নাড়িভুড়ি উল্টে সব যেন বেরিয়ে আসবে আমার। বিদাংশ্রী ও তার মা ছুটে এসে আমার মাথায় জল ঢালতে থাকে। ওদের বাড়িতেই অতিথি আমি। বিহু নাচের আসরে থাকতেই হঠাৎ ওর দাদা বিরখাঙের বাড়ি আসার খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল সে। এখুনি আবার ফিরত। এই সামনেই তো পাগলদিয়ার তীরে মেলা বসেছে। সে ভাবতেও পারেনি, এই অল্প সময়ে আমার উপরে আক্রমণ হবে।

বিদাংশ্রী বলে,—তোর কী দোষ বোন, আমার উচিত ছিল তোকে নিয়ে আসা। আসলে তুই তখন নাচের মধ্যে ছিলিস, আমার নাচ ছিল পরের গ্রুপে। দুজনের একসঙ্গে নাচ তো সেই সন্ধ্যেবেলায়। হিতেন সরগিয়ারি যে নজর রেখেছিল বুঝতে পারিনি!

আমি বমি করতে থাকি। বিরখাঙের বন্ধু অখরাঙ বলে, সুরতিকে আগে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে, তারপর থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখাবো!

আমি কুলকুচি করে জল ফেলে বলি—ঠিক বলেছো, আমাকে নিয়ে চলো তোমরা, ওকে ছাড়বো না!

বিদাংশ্রীর মা বলে, আগে ওর বাড়িতে তো খবর দাও! ওর গার্জেনের মতামত নিতে হবে!

অখরাঙ বলে,—ঠিক আছে, আমি খবর দিতে যাচ্ছি। তোমরা ওকে হাসপাতাল নিয়ে যাও!

বিরখাঙ বলে,—দাঁড়া! সে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। ওর ভ্রূ শিবের ত্রিশূলের মতন কোঁচকানো। সে বলে,—থানা পুলিশ কোর্ট কাছাড়ি করে কিচ্ছু হবে না; ও প্রভাবশালী বোড়ো নেতা কিন্তু আমাদের মতন উগ্রপন্থী নয়। থানাপুলিশ ও সরকার পক্ষের সঙ্গে ওর দহরম মহরম। ওদের সাধ্য নেই হিতেন সরগিয়ারির গায়ে হাত দেয়। ফালতু বোনটার বদনাম হয়ে যাবে। তখন বিয়ে দিতে কষ্ট হবে! আমরাই কিছু করব!

হাগ্রাবাড়ির ছেলেরা কাপুরুষ নয়! কেন জানি সেইদিন মনে হয় এহেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই বোধহয় লোকে উগ্রপন্থী হয়। দীর্ঘ বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচারের ফল এই উগ্রপন্থা। আমাদের সমাজব্যবস্থাও এখন আমারই মতন ধর্ষিতা। হাগ্রাবাড়ি এখন তাই রণক্ষেত্র।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী পাগলদিয়া। ভুটান পাহাড় থেকে বেরিয়ে এই খরস্রোতা উত্তরকুশী থেকে প্রায় একশো কি.মি. দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। উত্তরকুশী থেকে দশ কি.মি. দক্ষিণে পাগলদিয়ার একপারে আমার বোড়ো বান্ধবী বিদাংশ্রীদের বর্ধিষ্ণু গ্রাম বালাবাড়ি। নদীর উপর কাঠের সেতু। সেতু পেরিয়ে অরণ্যে ঘেরা হাগ্রাবাড়ি। হাগ্রাবাড়িতে বিদাংশ্রীরা বছরে ছয়মাস থাকে। এখানেই ওদের খামারবাড়ি। এই অরণ্যের বিস্তার ভুটান পাহাড়ের পাদদেশ অব্দি। বিদাংশ্রী আমার প্রাণের বান্ধবী। সে অখরাঙকে ভালবাসে। আর অখরাঙ ছিল বিরখাঙের চেলা।

বালাবাড়ির দক্ষিণে নদীর পার ঘেঁসে খৌলামাখা অব্দি দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেতে যখন হাওয়া খেলত—ঢেউ উঠতো সবুজে তখনই চিকুঙের সুর অখরাঙকে টানত, পুলকিত হতো সোনালি সম্ভাবনায়। সবুজ ধানের ছড়াগুলি ধীরে হলদে, ক্রমে সোনালি হয়ে উঠলে আকাশ বাতাসে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত। কাঁপা কাঁপা সুর শুনে নাকি কাঠফাটা রোদ্দুরে ছুটতে শুরু করতো সে। পাগলদিয়ার কাঠের সেতু পার হয়ে হাগ্রাবাড়িতে পা রাখত কী এক অমোঘ আকর্ষণে। বিহু উৎসবের সকালে নিজের মুখে অখরাঙ আমাকে এসব বলেছে।

শালবাগানে ঢুকতেই গতি শ্লথ হত। পায়ের তলায় শুকনো পাতা গুড়ো হয়ে যাওয়ার শব্দে নিজেই মাঝেমধ্যে চমকে উঠত। কিন্তু বিরখাঙ চোখ বন্ধ করে নির্বিকার বাজাতো —বোড়ো লোকগীতির কাঁপা কাঁপা সুর। অখরাঙ পাশে গিয়ে বসত। বসলেই চিকুঙ থেমে যেত। যেন মন্ত্রবলে টের পেত বিরখাঙ। মন্ত্রমুগ্ধ অরখাঙ কোমরে গোঁজা নিজস্ব চিকুঙ বের করতো। বিরখাঙ মুচকি হেসে পরবর্তী সুর বাজিয়ে দেখাত। সঙ্গে বাজাত অখরাঙ। সুরের ঘোরে ওরা ভুলে যেত দিগবিদিক, ভুলে যেত সবকিছু। সুরের ভেলায় ভাসতে ভাসতে অজান্তেই বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যায় পৌঁছে যেত ওরা।

ওদের খবর জানত বিদাংশ্রী। এখানেই বিহুর আগে সখীদের নিয়ে চিকুঙের সুরে ঘুরে ঘুরে নাচের অভ্যাস করতো। শুধু শেষ কদিন খামের বোলে অভ্যাস করে নিলেই হতো। অন্য সময় সন্ধ্যা হলে ও-ই এসে ডাকত, -- আদা বাড়ি চলো। সেই অখরাঙ কিন্তু বিরখাঙের উগ্রপন্থাকে সমর্থন করতো না। সেজন্যেই সে পুলিশ-আইন-আদালতের পক্ষে ছিল। হরেন নার্জারী হত্যার পর তো সে বিরখাঙ-বিদাংশ্রীদের ঘেন্নাই করতো।

হরেনস্যার উগ্রবাদি আর প্রশাসনের মধ্যস্থতা করছিলেন। উনি দারুণ কবিতা লিখতেন, গান গাইতেন, দরাজ গলায় আবৃত্তি করতেন। যা পড়াতেন বাড়ি এসে আর পড়তে হত না। পরীক্ষার আগের রাতে একবার পাঠ্য বই চোখ বুলিয়ে নিলেই হত। পরীক্ষার খাতায় লিখতে বসে প্রশ্নের উত্তরে হরেনস্যারের আওয়াজ কানে ভাসত আর ছাত্রছাত্রীদের কলম

ছুটে চলত হরিণের মতন।

সেদিন খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল অখরাঙ। শুকনো প্রায় নদীর বুকে বালাবাড়ি ভেঙে পড়েছিল। বড় একটা পাথরের বুকে রক্তের দাগ। পাগলদিয়ার স্রোতের ছলকে রক্ত ধুয়ে, জল লাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো পরবর্তী পাথরে। সূর্যাস্তের পর লালিমা মিশে মনে হচ্ছিলো হরেনস্যারের রক্তে পাগলদিয়া লাল হয়ে গেছে। অখরাঙ ও অন্য ছাত্ররা তখুনি তৈরি হচ্ছিল নদী পেরিয়ে হাগ্রাবাড়ি আক্রমণের জন্যে। কিন্তু সমবেত মহিলা ও বয়স্ক পুরুষরা ওদের মানা করে—পুলিশ হতাশ হয়ে ফিরেছে, ওরা জঙ্গলে লুকিয়েছে, অহেতুক আত্মীয় পরিজনরা হেনস্থা হচ্ছে। বাজারের দোকানদার—বড়মাথার লাউডুম বোড়ো, একটা চিরকূট দেখাল। সুন্দর হস্তাক্ষরে বড়ো ভাষায় লেখা—'বেইমান'।

অখরাঙ ভেবে পেত না হরেন স্যারের মতন বড়মনের মানুষ কি বেইমানি করতে পারে! আমিও তাই ভাবতাম বেইমান হলে কী প্রয়োজন ছিল মধ্যস্থতা করার। ওদের প্রতি অসীম ভালবাসা থেকেই তিনি এই বিপজ্জনক দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। বিরখাঙ, বিদাংশ্রীদের প্রতি গভীর স্নেহই মানুষটাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেই থেকে উগ্রবাদীদের উপর রাগ অখরাঙের মনে ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। আর আমি ছিলাম সংশয়ে দোদুল্যমান। কোন্‌টা ঠিক বুঝতে পারতাম না।

হরেনস্যার ওদের তামুলপুর স্কুলের প্রথম বোড়ো ভাষার শিক্ষক। বোড়ো ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় পর্যায়ে বোড়োমাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যে আন্দোলনের হোতাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন। যুবসমাজকে দিনভর মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার পরম্পরা ত্যাগ করতে বললেন। নিজে নাটক লিখে ছেলেমেয়েদের দিয়ে অভিনয় করাতেন। সমস্ত কুসংস্কারের মূলে কুড়ুল চালিয়েছিলেন। শিবপূজার প্রচলিত লোকগীতি খেরাই গানের সুরে ওঁর বানানো জাতীয়তাবাদী গানগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল। আজ বুঝতে পারি নিজের অজান্তেই হরেনস্যারকে দারুণ ভালবাসত অখরাঙ।

তারপর একদিন বাসে করে তামুলপুর যাওয়ার পথে দুপাশের ধানক্ষেতে দলবাঁধা পাখিদের ডানায় রোদের ঝিলিক দেখতে দেখতে তন্ময় অখরাঙ হঠাৎ দেখে বিপরীত দিকে ছুটে যাওয়া আট দশটা মিলিটারি ট্রাকের একটা কনভয়। খবরের কাগজ অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে উগ্রবাদিদের আলোচনা চলছে দিল্লিতে। এই অসময়ে মিলিটারি কেন?

স্কুলে পৌঁছে ঐ সব চিন্তা আর রইল না। বৃষ্টির ফলে আগাছা বেড়েছে। ফুটবল মাঠে ঘাস বেড়েছে। তারমধ্যে চোরকাটার আন্দোলন। অনেকদিন পর সহপাঠীদের পেয়ে সবাই একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে। প্রার্থনাসভায় জাতীয় সংগীতের পর সবাই হরেন স্যারের আত্মার শান্তিকামনায় দুমিনিট নিরবতা পালন করে। স্কুলবাড়ির পোড়া অংশগুলি সাফ করে ওরা। গ্রন্থাগারে একটা বইও অক্ষত নেই। এত মূল্যবান সব বই পুড়ে যাওয়ায় খুব কষ্ট হয় অখরাঙের। এই স্কুলবাড়ি পুড়িয়ে উগ্রপন্থীদের কী লাভ হয়েছে অখরাঙ ভেবে পায় না। সেদিন কোন ক্লাস হয়নি। শিক্ষক ও বড় ক্লাশের ছাত্ররা একসঙ্গে বসে স্কুলবাড়ি

গ্রন্থাগার ইত্যাদি পুনর্নির্মাণ ও পরবর্তী দিনগুলির জন্যে রুটিন তৈরি করে। তারপর ছুটি।

নতুন আশায় বুক ভরে বাড়ি ফিরছিলো অখরাঙ। কুমারীকাটা স্ট্যান্ডেই শোনে সকাল দশটায় বালাবাড়ি বাজারে মিলিটারি তাঁবুতে বোমা ফেটেছে। ফলস্বরূপ সৈনিকরা ওদের গ্রামে ঢুকে লোকজনকে কচুকাটা করেছে। ত্রাসে সাইকেল চালিয়ে গ্রামে ঢুকতেই অখরাঙ আগুন দেখে। আরো দ্রুত চালিয়ে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেখে সব ভস্ম হয়ে গেছে। ধানের গোলা থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছে। একটা হলুদ কালো ডোরাকাটা পোড়া ঢোঁড়া সাপ অতিকষ্টে বুকে হেঁটে গোলা থেকে আগাছার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। মা কাঁদছে; তৈমু সংজ্ঞাহীন। গ্রামের ডাক্তারদিদি ওর শুশ্রূষা করছেন। বাবা মৃত।

বর্বর সৈনিকরা মা-বাবার সামনেই তৈমুকে ধর্ষণ করেছে। এ-সব দেখে মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। বাবা বাধা দিতে গেলে ওরা বেয়নেটের খোঁচায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছে বাবাকে। গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষই মারাত্মক ভাবে আহত বা মৃত। সৈনিকরা এরকম কেন করল? ওরা কি মানুষ না পিশাচ? এরা দেশের ন্যায়নীতি, স্বাধীনতা ও সংবিধানের রক্ষক না ভক্ষক? এদের ঘরে কি মা-বোন নেই?

অখরাঙের হাতের মুঠি শক্ত হয়। মস্তিষ্কে শুরু হয় খামের বোল। পেশিগুলির সংকোচন প্রসারণে তাণ্ডব বাগুরুম্বা। পোড়া খাটের তল থেকে বিশাল দা বের করে ও হাতে নিয়ে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে দা'টার দিকে তাকিয়ে দেখে ওতে জঙ ধরেছে। তাই পাগলদিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে জেগে থাকা পাথরে শান দিতে থাকে সে। ঘষায় ঘষায় জঙ সরে গিয়ে ঝকঝকে ইস্পাত ঝিলিক মারে অস্তগামী সূর্যের আলোয়। অখরাঙের কপাল বেয়ে ঘাম ঝরে। ভিজে যায় সারা শরীর। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে এবার পাগলদিয়া পার হয়ে হাগ্রাবাড়ির শালবাগানে ঢোকে। ঝপ্ করে অন্ধকার হয়ে পড়ে চারপাশ। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই এরকম, হঠাৎ করে আলোর ঝরনা নিয়ে সূর্য উদিত হয় —তেমনি অরণ্যে লুকিয়ে পড়ার মতন ঝপ্ করে সন্ধ্যা নামে।

ছনবাঁশের চারচালা বাড়িটার সামনে পৌঁছেই চিৎকার করে ডাকে,—বিরখাঙ, বিরখাঙ, বাইরে আয়—। ঘর থেকে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসে বিদাংশ্রী। অখরাঙ জিজ্ঞেস করে, —'বিরখাঙ কই?'

—'কেন কী হয়েছে? তোমার হাতে দা কেন?' বিদাংশ্রী উঠোনে আসে। ওর প্রশ্ন শুনে অখরাঙ ভেঙে পড়ে। এতক্ষণ ধরে আটকে রাখা আবেগ ফেটে বেরিয়ে আসে। অখরাঙ মাচায় বসে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। বিদাংশ্রী ওর কাঁধে হাত রেখে বলে,—'আমি জানি কী হয়েছে, দুপুর থেকেই জানি, আদারা এই একটু আগেই ছাউনীর দিকে রওনা হয়েছে—বদলা নেবে!'

অখরাঙ লাফিয়ে ওঠে,—আমিও যাব!

সেই শুরু। অখরাঙের জীবন এভাবেই পাল্টে যায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা অঞ্চলের নানা উপজাতির যুবকরা এভাবেই হঠাৎ পাল্টে যায়। এমনকি দিকভ্রান্ত বাঙালি যুবকরাও এই পথ নেয়। বিদাংশ্রীর উপর অত্যাচারের বদলা নিতে বিরখাঙ যেমন অনেক আগেই

উগ্রবাদীদের দলে নাম লিখিয়েছিল। তৈমুর উপর অত্যাচার ও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে তেমনি অখরাঙ ওদের দলে নাম লিখিয়েছিল। আমার উপর অত্যাচারের বদলা নিতেই একই ধারায় ওদের দলে নাম লেখায় সন্তু। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

আর আমার বদলা? নিজেকে অনাঘ্রাতা ফুলের মতন নিজস্ব পুরুষের বাহুডোরে সঁপে না দিতে পারার যন্ত্রণা কিভাবে প্রশমিত হবে? পরিতোষ সেটা বোঝে না। বোঝে না বলেই আমাকে সন্দেহ করে। আমি যে পৌরুষহীন পুরুষদের ঘেন্না করি, ওদের লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ছেলেখেলা করি, ওদের ক্লীবতায় থুতু ছেটানোর জন্য ওদের সমস্ত আত্মবিশ্বাসকে তছনছ করে দেওয়ার জন্য বিছানায় ডেকে নিয়ে ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে কচুকাটা করি। হিতেন সরগিয়ারির লম্পট বীর্য আমার পেট ও উরু ভরিয়ে দিয়েছিল। সেই ঘৃণা, সেই থিকথিকে চটচটে ঘৃণা আমি আজও লালন করি অজান্তেই। সেই থেকে কোন শালাকে আমার শরীরে বীর্যক্ষরণ করতে দিই না। শুধু পরিতোষ, হ্যাঁ পরিতোষকে দিয়েছি অবশ্য বারকয়েক। নাহলে শঙ্খ এল কেমন করে?

এ ব্যাপারে আমি একশোভাগ সৎ। আমি তার বিয়ে করা বউ। আমি নেমকহারাম নই। পরিতোষের খাই-পরি, তেমনি ওর অনেক ইলিবিশিও সহ্য করি। পরিতোষও অবশ্য আমার জন্যে করে। এতকিছুর পরও করে। হয়তো মানবতার খাতিরে, হয়তো শঙ্খের দিকে তাকিয়ে করে। কিন্তু ও যে আমার জন্যে করে একথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে। যতবার অসুস্থ হয়েছি, সেই-ই তো আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করেছে। স্বামী হিসেবে পরিতোষ আদর্শ। যে কেউ ওর মতন স্বামী পেলে বর্তে যেত। আমিও মাঝেমধ্যে আবেগের বশে বাংলা সিনেমার ডায়লগ বলে ফেলি,—জন্মজন্মান্তরেও তোমাকে ভুলবো না, তোমার মতন স্বামীই যেন প্রত্যেক জন্মে পাই! এবং কথা দিচ্ছি, এ জন্মের ঋণ জন্ম জন্মান্তরের শুচিতা দিয়ে পুষিয়ে দেব।

কিন্তু এই জন্মে? এই জন্মে আমি ঘোর পুরুষবিরোধী। যে কোন নাকউঁচু পুরুষের দর্প চূর্ণ করে মজা পাই। ভালবাসাহীন শরীরসর্বস্ব মানুষগুলিকে ঘৃণা করি, ওদেরকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে মজা লাগে। এসব গোপনে পরিতোষের অগোচরেই করি যাতে ও কষ্ট না পায়। এরা সবাই পরিতোষের সূত্রেই আমার সংস্পর্শে এসেছে; একেকজন দেমাকি ফান্টুস। এরকম লোক দেখলেই আমার রক্তে আগুন লেগে যায়। চোখের দৃষ্টিও পাল্টে যায়। পরিতোষের অগোচরে রচিত হয় ঐসব দেমাকি ফান্টুসকে চুপসে দেওয়ার গোপন খেলা। সে যে কী নেশা তা আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না। প্রত্যেক পুরুষের কাছ থেকে ডজনকয়েক শাড়ি. খসাই। এছাড়াও খসাই আরো অনেক উপহার। পরিতোষ এতো সহজ সরল যে এসব টের পায় না। অন্তরঙ্গতা বাড়াতে আমিও কিছুটা খরচ করি অবশ্য — যেমন দুএকটা ভাল তরকারি রান্না করে খাওয়ানো। রান্না আমি ভালই করি। পরিতোষও নতুন নতুন ডিশ খেতে ভালবাসে। পরিতোষ প্রশংসিত সেসব ডিশ আমি আমার প্রেমিকদেরও খাওয়াই। আর দুএকবার গাল টিপে দিই, কান টেনে দিই, বাসে উঠে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়াই, ঘাড়ের উপর গরম নিশ্বাস ফেলি—আরও কত কী? আর তারপর আমি যা করি

তা আমার মনে মনেই থাক।

বছর সাতেক আগে ছুটিতে একা বাপের বাড়ি গেলে বিদাংশ্রী এসে আমাকে হাগ্রাবাড়ি নিয়ে গেছিল। সে এখন অখরাঙকে বিয়ে করেছে। সেবছর রঙালি বিহুর আগের রাতে সন্ত্র ও বিরখাঙরা হিতেন সরগিয়ারিকে ধরে নিয়ে গিয়ে বালাবাড়ি শ্মশানে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। অখরাঙ আমাকে ও বিদাংশ্রীকে ঐ ভয়াবহ দৃশ্য দেখাতে নিয়ে গেছিল। অখরাঙের হাতে বন্দুক ছিল। পুরো শ্মশানঘাটটাই বন্দুকধারীরা ঘিরে রেখেছিল। আমরা দুজনই শুধু অস্ত্রহীন ছিলাম। আমরা দুজন খাম বাজাচ্ছিলাম। এই খামের বোলে একদিন আমার আর্ত চিৎকার কেউ শুনতে পায়নি। সেদিনও তেমনি এই খামের বোলেই হিতেন সরগিয়ারির আর্তচিৎকার ঢেকে দিলাম আমরা।

সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে যে আমার শরীর জুড়িয়েছে তা নয়। এরকম যত লম্পট রয়েছে আমাদের সমাজে, ওদের সবাইকে এরকম পুড়িয়ে মারতে পারলে আমার শান্তি হতো! নিজের অজান্তেই আমি সেই পুড়িয়ে মারার কথা ভেবে একেকজনকে ফাঁসাই। প্রেরণা থইথই করে নতুন প্রেমিকের দৌলতে, পোড়োবাড়িতে জাগে ত্রয়োদশীর চাঁদ। আজকাল অজান্তেই এই থইথই প্রেরণাকে যত্ন করি। পরিতোষ তো আমাকে ঘৃণা করে ; শুধু শঙ্খের খাতিরে আমার সঙ্গে ঘর করে। আমার বর্তমান প্রেমিক তাই একটু আলাদা ভাবে এসেছে জীবনে। এ যেন জোড়াতালি জীবনে আবার বাঁচার আধার—একান্ত গোপন আধার।

সকালে বেলা অবদি শুয়ে থেকে থেকে উঠে পড়ে স্নান করব, স্নান করতে করতে ভাবব আজ দেখা হবে শ্যামের সঙ্গে শ্যামনগর স্টেশানে আবার, চায়ের ভাড় চলকে যাবে শাড়িতে, আমি বেপরোয়া তাকিয়ে থাকব তার লম্পট চোখের মণিতে—কেমন ভ্যাবলা —যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ন্যাকা কোথাকার! এবারই প্রথম অনুভব করেছি বাঘের জিহ্বায় মানুষের রক্তের স্বাদের মতন পরপুরুষ বা পরস্ত্রীগমনও ক্রমে একটা নেশায় পর্যবসিত হয়। এখন আর কোন বদলা নেওয়ার কথা অনুভব করি না আমি।

পরিতোষের ডাইরিতে কোথাও পড়েছি,—বিবাহিত পুরুষের কাছে বেবুশ্যের আকর্ষণ আর বিবাহিতার কাছে লম্পট পুরুষ দুর্নিবার। পরিতোষ এসব কথা কেন লিখেছে? সে-ও এ বিষয়ে খুব ভাবে বুঝি?—বেচারা! তবে ও যা লিখেছে—ঠিকই লিখেছে!

আমার নতুন প্রেমিকও হয়তো ওরকমই ছল্লিবাজ, বিবাহিতাদের সঙ্গেই ওর সমস্ত গোপন অভিসার! অথবা হয়তো আমার ভুল,—আমিই বা কোন্ সতী সাধ্বী—তুলসী-তামা-এ তো আমার অষ্টম পুরুষ-দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের মতন-কৃষ্ণ কানাই। একী ভাবলাম আমি! প্রেমিককে সন্তান ভেবে গা রি রি করে। গতকাল রাতে যেমন শঙ্খ হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছিল—হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ওর বারমুড়া তাঁবুর মতন উত্থিত। দেখে বড় মায়া হয়। ওর দুপায়ের ফাঁকে পাশবালিশ গুঁজে দিই। শঙ্খ তখন পাশবালিশে চড়ে শোয়, যেমন করে পুরুষ শোয় প্রেমিকার বুকে। ছিঃ, এরকম ভাবনাগুলি কেন আসে

মাথায়! আমার কি সত্যি সত্যি মাথা বিগড়ে গেছে? যাকে একদিন পেটে ধরেছি তাকে নিয়ে এরকম চিন্তা আসে কি করে? —ছিঃ নিজেকে ধিক্কার জানিয়ে টি.ভি. অফ করে শুয়েছিলাম। তখন অনেক রাত। ভোরে উঠতে হবে, ছেলের স্কুল। ছেলে তো বুঝবে মায়ের পাগলামি! বুঝবে না টিফিন বাক্স, স্কুল ড্রেস, ছেলের সাইকেল, স্কুলের গেট ও প্রেয়ার ঘন্টা—ছেলের মায়ের কেন ছোকরা-ছোকরা টিভি মেকানিক বাই।

সকালে ছেলে স্কুলে গেলে আমি আবার বিছানায় শুই। শুয়ে শুয়ে আবার বুকের ভেতর আমের বোলের মতন ব্যথা। কত বছর ধরে এই ব্যথা আমায় জ্বালায়। বিশেষ করে যখনই প্রেমে পড়ি, অজান্তেই স্বপ্নের সোনার হরিণের শিং আমার বুকে গুঁতোয়। ব্যথা বাড়তে থাকে। এদিকে ওদিকে কত কথা ফিসফিস ফিসফিস—কখনো তো অর্থহীন আবোল-তাবোল... ... ...শীতের খোলা রোদে পাশাপাশি বসে অথবা চারনম্বর প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে উল্টে পাল্টে ফিসফিসিয়ে শীতল সিমেন্টের বেঞ্চ কেমন গরম হয়ে ওঠে।

তোমাকে বুকের মধ্যে নেব বলে টানটান বিছানা, টানটান শরীর - তোমার গালের নীল আভা থেকে টকঝাল তারুণ্য মেখে চাঙ্গা হবো বেশি বয়েসী মেয়ে - এক কিশোরের মা আমি -হা-হা-হা.....

পরিতোষ কি আজ ফিরে আসবে? সে কি বেঁচে আছে? আমার কেমন জানি বুক দুরুদুরু করে। একথা কী করে বোঝাই, কাকে বোঝাই যে আমি আজও পরিতোষকেই সবচাইতে বেশি ভালবাসি। ওকে ঘিরেই এ যাবৎ সবথেকে বেশি স্বপ্ন দেখেছি। ওকে অবলম্বন করেই তো আমার সংসার! যৌনতার ক্ষেত্রেও পরিতোষই— রত্নাডা শিবমন্দিরের সকালসন্ধ্যার আরতি ও লাগাতার ঘন্টাধ্বনির চাইতে অনেক অনেক দীর্ঘ ও আনন্দঘন সেসব.... ....। খেলতে খেলতে কত যে পদ্ধতি আমরা আবিষ্কার করেছি, তাতে বিফল ও সফল হয়েছি। সেই-ই একমাত্র পুরুষ, যে কখনো জোর করে না। আর সেজন্যেই কিনা জানিনা, ওর জন্যে আমার মনে বিশেষ জায়গা। সে গোবেচারা ছাপোষা মানুষ। সে মেয়েদেরকে মানুষ বলে ভাবে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশকেই বাহবা জানায়। সে আমার কোনরকম স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। সেজন্যেই তো আমি একের পর এক প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। ওরা কেউ আর আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। ওরা জানে, আমার স্বামী অনেক বেশি সম্পদশালী - শরীর ও মন দুই দিকেই সে ধনী। তাই ওরা কেউ আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না —সবার মুরোদ জানা হয়ে গেছে। কিভাবে ওদের সর্বনাশ করেছি আর কেঁচো বানিয়ে দিয়েছি —তা শুধু আমিই জানি। এদের মধ্যে দুজন এখন বিবাহিত, একজন তো বিবাহিতই ছিল। ওদের বউরাও এক একজন ড্যামনি। ওদের বড় বড় কথা শুনে আমি মনে মনে হাসি। আমার কাছে কী বলতে আসবি তোরা? তোদের কার সম্পদ কতটা সব তো আমার জানা! হা-হা-হা.....

পরিতোষকে আমি শ্রদ্ধা করি। ওর পৌরুষের প্রতি সমীহ রয়েছে আমার। সে পাহাড়ের মতন শান্ত ও সম্পদশালী। সেজন্যেই ওর চোখে ছোট হয়ে, ঘৃণা কিংবা দয়ার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে চাইনি। কোন্ মুখে ওর সঙ্গে ঘর করবো আবার? তাই সেদিন

ফ্যানের সঙ্গে ঝুলতে গেছিলাম। কিন্তু সেটাও পরিতোষ দেখে ফেলে আমাকে পরবর্তী যন্ত্রণাময় সংশয়দীর্ণ জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমার প্রেমিকদের নিয়ে পরিতোষ এত বিস্তারিত জানে না। আমি গোপনে এনেছি ও নীরবে কচুকাটা করেছি। ইতিমধ্যে পরিতোষ কিউরেটর হয়েছে।

আমার সপ্তম প্রেমিক সুজিতের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে রাজীবদা ও দীপা জল ঘোলা করলে যোধপুরে মিতা পরিতোষকে যা তা বলে। ঘরে ফিরে পরিতোষ কেমন গুম হয়ে যায়। সেদিন আমরা বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছিলাম দুটি আগুনের গোলার মতন। দুজনেই ছটফট করছিলাম। ওর ভেতরে যে কী চলছে তাই ভেবে আমার ভেতর উথালপাতাল চলছিলো।

পরিতোষ যদি আমাকে কোন দৈহিক শাস্তি দিত তাহলে হয়তো আমার শিক্ষা হতো। আবার অন্যরকমও হতে পারত। কিন্তু পরিতোষ অন্য ধাতুতে গড়া। সে বলে, – কেউ জোর করে কাউকে আটকে রাখতে পারে না। মানুষ যতই বড় বড় বাঁধ তৈরি করে নদীর গতিপথ পাল্টানোর চেষ্টা করুক, কিছুদিন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করুক, কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করতে পারে না। কেননা প্রাকৃতিক ভারসাম্য এখনো মানুষের আয়ত্তের বাইরে। নদী ঠিক এপার ভেঙে ওপার গড়ে একদিন সেই বাঁধ থেকেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবে। শুধু ফরাক্কার কথাই যদি ধরি, গঙ্গা যেভাবে প্রবলগতিতে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে গতিপথ পাল্টাচ্ছে—পঞ্চাশ বছর কি তারও আগে ফরাক্কা থেকেই দূরে সরে যেতে পারে। যেমন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা থেকে সরে গেছিল সিন্ধুনদী, যেমন পিরামিড সভ্যতা থেকে দূরে গেছিল নীলনদ। তারপর বাড়িঘর পিরামিড সব থাকে— প্রাণের স্পর্শ আর থাকে না।

পরিতোষ ইদানীং একটা উপন্যাস লিখছে। এত সন্ত্রাসের মধ্যে বসবাস করেও সে একটা প্রেমের গল্প লিখছে। সে যেন যে কোনো মূল্যে প্রেমকে একটা উপাচার করে নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। একদিন আমি ওর কাছে গিয়ে ওর লেখা শুনতে চাইলে সে অনেকটা পড়ে শোনায়। ......প্রকৃত প্রেম মানুষের জীবনে এক বিশেষ দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। তার আচার ব্যবহার পাল্টে যায়, আর সে হয়ে পড়ে অন্য এক আলোর উৎসারী। নিজেদের আলোতেই যেন দুজন এগিয়ে চলে। নানা বাধা বিপত্তি অনিশ্চিত ভবিষ্যত তার জন্য প্রতীক্ষা করে; কিন্তু সে কিছুই পরোয়া করে না। নীল আকাশের স্বপ্ন-দেখা পাখির মতন একসময় সে রাতের আঁধার পেরিয়ে ফিরে যায় ইপ্সিত সকালে।

প্রতিদিন জীবন রূপ বদলায়। এক রূপ থেকে থেকে অন্য রূপ। হয়তো কোনো কালরাত্রি ওদের দুজনের পথকে দুদিকে ভাগ করে দেয়; ওরা পরিণতি খোঁজে। স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোছায়ায় দাঁড়িয়ে সে জীবনের একটা মানে খুঁজে পায়। মুমল ও মহেন্দ্র সেই পথের যাত্রী। সেজন্যেই কোনো বন্যা কিম্বা আগুনের কুন্ড......শুনতে শুনতে আমার ঘুম পেয়ে যায়। ঘুমের মধ্যেও ওর গল্প চলতে থাকে, ছশো বছর আগের মরুপ্রদেশ থেকে উঠে আসা চরিত্ররা পরিতোষের কলমে যতটা জীবন্ত তার চাইতে অনেক বেশি অলীক, অনেক বেশি স্বপ্নমাখা। নাহলে লোককথার প্রেমগাঁথা শুনে আমার স্বপ্নে একটা গাধা মূর্ত হয় কেন?

চৌদ্দ

'জন্ম মানে ঘুমিয়ে পড়া ; তারপর জীবন জুড়ে যা ঘটে, সব স্বপ্ন।'

—টলস্টয়

বাবার ডাইরিতে লেখা এই উক্তিটি শঙ্খকে ভীষণ ভাবায়। সব যদি স্বপ্ন হয় তাহলে বাস্তব কি শুধু মরে যাওয়া? সবাই একদিন মরে ; এটা অবশ্য ঠিকই। এসব ভাবতে থাকায় প্রিন্সিপাল স্যারের আগের কথাগুলি শোনেনি সে। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে কথা শেষ করে তিনি ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করলে শঙ্খ মনোযোগ দিয়ে শোনে।

—তুমি পারবে, আরেকটু চেষ্টা করলেই সম্ভব, মাই সন! এবার তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছ বলেই ভালো রেজাল্ট হয়েছে! আগামীবার আরো ভালো রেজাল্ট চাই! শঙ্খ ঘাড় নাড়ে। সে নিজেও জানে যে স্যারের কথা ঠিক। কিন্তু গত কয়েকমাসে কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারছিল না। পড়তে বসলেই মাথার মধ্যে নানা চিন্তা জট পাকাত। কখনো অনেকক্ষণ পড়ার পর মনে হত কিছুই পড়েনি। থেকে থেকেই একটা অদ্ভুত কষ্ট গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে বসত। বাবারও নাকি একবার এরকম অবস্থা হয়েছিল পিসিমণির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর। কিন্তু শঙ্খর তো বাড়িতে কোনো দাদা দিদি কিংবা ভাইবোন নেই। শুধু বাবা আর মা। ওরাই শঙ্খর প্রিয় বন্ধু। বিশেষ করে মা। ছোটোবেলায় মায়ের চুমু খেয়ে আদর খেয়ে ঘুম ভাঙত ওর। তারপর ওকে স্কুলের জন্য তৈরি করে হাত ধরে সেই রত্নাডায় এয়ারফোর্স স্টেশানের বাইরে ওদের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের গেট অব্দি নিয়ে যেত মা। তারপর স্কুলের বাইরে বসে থাকত যতক্ষণ না স্কুল ছুটি হয়। স্কুলের গেটের বাইরে দুদিকে সিমেন্ট বাঁধানো বসার জায়গা করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। মায়েরা সেখানে সার দিয়ে বসে খবরের কাগজ ম্যাগাজিন পড়ে, শীতকালে প্রায় সবাই উল বোনে, একে অন্যের থেকে নতুন নতুন উলের ডিজাইন শেখে। এ এক সাম্বাৎসরিক আড্ডার জায়গা।

কিন্তু ক্লাশ ফোরে ওঠার আগেই শঙ্খ নিজে নিজে স্নান করা শুরু করে। ওদের ক্লাশে সবাই নিজে নিজে স্নান করা শুরু করেছে। অনেকেরই মায়েরা তখন আর স্কুলের সামনে অপেক্ষা করে না। যাদের মায়েরা আসে তাদেরকে অন্যরা খ্যাপাত। শঙ্খের কাছে একথা শুনে ওর মাও ওর জন্যে অপেক্ষা করা ছেড়ে দেয়। কিন্তু স্কুল ছুটির সময় আবার ঠিক পৌঁছে যেত। একদিন শঙ্খর ভীষণ রাগ হয়। সে মাকে স্কুল থেকে আনতে যেতে বারণ করে।

মা অবাক,—তুই একা একা অটো করে ফিরতে পারবি?

—কিউ নেহি, সবাই তো ফেরে। দুটো মেয়ের মা আর তুমি ছাড়া ক্লাশের কারোর মা আর ওদেরকে নিতে আসে না!

তবু মা আসত। ক্লাশ ফাইভে ওঠার পরদিনও আসে। ক্লাশের ছেলেমেয়েরা ওকে

'ছোটো চিকু, নান্হা চিকু' বলে খ্যাপায়। রাগে দুঃখে সেদিন ওর মাথায় কোনো পড়া ঢোকে না। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সেজন্যেই, স্কুল ছুটির একটু আগেই সে বাথরুমে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়।

ক্লাশের সবাই বেরিয়ে গেলে এক এক করে প্রাইমারি সেকশনের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও কয়েকজন টিচারকেও বেরিয়ে পড়তে দেখে সেদিন মায়ের নাকি হাত পা পেটে সেঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়। শঙ্খর ক্লাশ টিচার খান্ডেলওয়াল স্যার মাকে চিনতেন। মায়ের মুখে ওর স্কুল থেকে না বেরুনোর কথা শুনে তিনি মাকে ডেকে নিয়ে টিচার্সরুমে বসান। প্রিন্সিপালও খবর শুনে ছুটে আসেন। তারপর সবাই মিলে তন্নতন্ন করে খুঁজে অনেকক্ষণ পর বন্ধ বাথরুমে শঙ্খর অস্তিত্ব টের পায়। স্যারের কথায় শঙ্খ দরজা খোলে। তখন ওর চোখদুটি টকটকে লাল। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। প্রিন্সিপাল ও ক্লাশ টিচার স্যার মাকে ইংরেজিতে কিছু বলেন। শঙ্খর তখনো কান ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সেই রাতেই সব শুনে বাবা বলেন, ঠিকই তো, শঙ্খ এখন বড় হয়েছে।... খবরদার তুমি আর যাবে না! কিন্তু ও যদি স্কুল ছুটির আধাঘন্টার মধ্যে না ফেরে তাহলে তুমি অবশ্যই যাবে!

সেই থেকে মা আর স্কুলে আসেনি। বাবার কথামতন শঙ্খও কোনোদিন দেরি করে বাড়ি ফেরেনি। বাবার মিউজিয়াম উল্টো পথে অনেকটা দূরে। বিশাল আকারের রাজবাড়ির মতন বাড়ি। চারদিকে সুন্দর বাগান। সেই বাড়িতেই বাবা প্রথম সামান্য চাকরি পেয়ে এসেছিল। তারপর প্রায় দশবছর ধরে পড়াশুনা করে বাবা তখন সহকারী কিউরেটর। সারাদিন ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হত।

সিনিয়র কিউরেটর ডক্টর ফণি চক্রবর্তী বাবাকে খুব ভালবাসতেন। বাবার ডক্টরেট গবেষণাপত্রের গাইডও ডক্টর চক্রবর্তী। রিটায়ার করার আগে তিনিই বলে কয়ে বাবাকে কলকাতায় বদলি করিয়ে এনেছেন। শ্যামনগরে ডক্টর চক্রবর্তীর বাড়ির একতলায় ওদেরকে থাকতে দিয়েছেন। ওঁরা প্রথমে কোনো ভাড়া নিতেও রাজি হননি। কিন্তু বাবা তাহলে অন্য বাড়ি দেখে উঠে যাওয়ার কথা বলায় বয়স্ক দম্পতি ঘাবড়ে যান। ওদের একমাত্র ছেলে বিদেশে। বাবাকে ওরা নিজের ছেলের মতোই ভালবাসেন। শঙ্খ যেন ওদের নিজের নাতি।

'চক্রবর্তী নিবাস' থেকে ইছাপুরের ১ নম্বর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ই সবচাইতে কাছে। সেখানে ভর্তি করে বাবা ওকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছে। পুরোনো স্কুলের বন্ধুদের ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত। কিন্তু হাফইয়ার্লি পরীক্ষার পরই ক্লাশটিচার ম্যাডাম ওকে মনিটর করে দেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এই স্কুলটাও ভাল লাগতে শুরু করে। খুব সুন্দর পরিবেশ। চারপাশের সবুজ গাছপালাগুলি সবসময় স্কুলের বাচ্চাদের দিকে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে। সেই দুলুনির ছায়া পড়ে পুকুরগুলির সবুজ জলে। বাতাসে ওদের ফিসফিসানি শোনা যায়। চারপাশে প্রতিমুহূর্তেই নতুন নতুন আলোআঁধারি, আকাশে প্রতিদিন নতুন রঙের মেঘ অথবা মেঘহীন নতুন আকাশ। যোধপুরের স্কুলে দুটো বাবলা গাছ আর সারিবদ্ধ টবে কিছু ফুলগাছ ও অসংখ্য ক্যাকটাস

ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তবু মাঝেমধ্যেই যোধপুর স্কুলটার কথা মনে পড়লে যশবন্ত, কুলদীপদের কথা মনে পড়লে বুকটা কেমন হু হু করে। আচ্ছা, মা ওকে বাবার ডাইরিটা পড়তে দিল না কেন? ওতে কী লেখা রয়েছে?

মা ওকে বোঝায়, বাবার ডক্টরেট হয়ে গেলে প্রোমোশান হবে। বেতন বাড়বে। ওরা কলকাতায় একটা নিজস্ব ফ্ল্যাট নেবে! সে-ও বন্ধুদের বলতে পারবে যে আমার বাবা ডক্টরেট। এসব শুনে শঙ্খ নানা কথা ভাবে। এই দাদু-দিদা তাহলে ওদেরকে ছেড়ে কেমন করে থাকবে? তখন তো ওরা আরো বুড়ো হয়ে যাবে। মরিয়ানিতে গেলে ঠাম্মা কেমন খুশি হয়। অথচ প্রতিবারই ছুটি থেকে ফেরার দিন ঠাম্মার চেহারা এত করুণ হয়ে যায় যে শঙ্খর খুব খারাপ লাগে। ফেরার সময় ঠাম্মার জন্য খুব মনখারাপ লাগে। ইস্, ঠাম্মাকে আর এই দাদু-দিদাকে যদি একসঙ্গে রাখা যেত। শঙ্খর নিজস্ব দাদু-দিদা নেই। মায়ের বিয়ের আগেই দিদা মারা গেছেন। আর শঙ্খের জন্মের বছরই বিগত হয়েছেন দাদু। তাই দাদু-দিদা বলতে শঙ্খ এদেরকেই বোঝে। তবু মা কেন কলকাতায় যাওয়ার কথা বলে? বাবার দৈনিক যাতায়াতের কষ্ট, ওর পড়াশোনার সুবিধে ..... শঙ্খ ভেবে ভেবে ভেবে ভেবে কুলকিনারা পায় না। তবু পড়াশোনা ভালই চলছিল। কিন্তু গত পুজোর সময় আমেরিকা থেকে অপু আঙ্কেল এসে দাদু-দিদাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে শঙ্খর ভীষণ মন খারাপ। বাবা মায়েরও মন খারাপ। অথচ অপু আঙ্কেলের নিজের বাবা-মাকে আঙ্কেল নিয়ে যেতে চাইলে তো কেউ আর বাধা দিতে পারে না। বাধা দিলেই বা আঙ্কেল শুনবে কেন?

কিন্তু সেই থেকে মা ভীষণ একা হয়ে পড়েছে। শঙ্খ টের পায়। বাবা তো সেই সকালের ট্রেনে কলকাতা যায় আর রাতে ফেরে। শঙ্খও দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার একেকদিন একেক টিচারের কাছে টিউশন পড়তে যায়। রবিবারেও তবলার ক্লাশ থাকে। এরমধ্যে আবার টি. ভি.টাও খারাপ হয়ে গেছে। একজন আঙ্কেল এসে বারবার টি. ভি. টা সারিয়ে টাকা নিয়ে যায়, আবার কিছুদিন পরই খারাপ হয়। মা তবু বারবার ঐ আঙ্কেলকেই ডাকে। তা নিয়ে একদিন বাবা-মায়ের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হয়। হয়তো সেজন্যই সেই দুপুরে বাবা রাগ করে কোথায় চলে গেছে। আর ফেরেনি। সেই থেকে আকাশ থমথমে। মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে। তারপরও রোদ উঠছে না।

মা সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও বাবার বন্ধুদের বাড়িতে ফোন করেও কোনো হদিশ পায় না। কোথায় গেছে বাবা? বৃষ্টির পর ব্যাঙেদের পাঠশালা থেকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ টরর্ ট্যাঙ ছড়া শোনা যায়। শঙ্খ মনোযোগ দিয়ে শোনে। আর মনে মনে বলে — ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর ঘাও – বাবা কোথায় এনে দাও —

ওদের উঠোনে একটা আমগাছ রয়েছে। যে সে আম নয়। আমের রাজা ফজলি। ঐ আমগাছে একটা তোতাপাখি অনেকদিন ধরেই আসাযাওয়া করে। এমনিতে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট, পলতা বিমানবন্দর, ইচ্ছাপুর গান ফ্যাক্টরি ও ইছাপুর মেটাল ফ্যাক্টরির আরণ্যক

পরিবেশে প্রচুর তোতাপাখি রয়েছে। ওদের স্কুলের গাছগুলিতেও ঝাকে ঝাকে তোতাপাখি ওড়াওড়ি করতে দেখেছে শঙ্খ। কিন্তু ওদের আমগাছে আশ্রয় নেওয়া তোতাপাখিটা ঐ পাখিগুলির মতন দেখতে অতো সুন্দর নয়। ওর গায়ের সবুজ রঙে একটু শ্যাওলারঙের ছোপ, পালকের ধারগুলি একটু কালচে। চোখদুটি একটু বেশি ড্যাবড্যাবা হলুদ বর্ডার দেওয়া কালো প্যান্টের বোতামের মতন। আর এই পাখিটা শঙ্খকে একদমই ভয় পায় না। বৃষ্টি হলে সে এসে শঙ্খর পড়ার ঘরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কখনোই সে কোনোকিছু ফেলে নষ্ট করে না। একদিন সকালে বাবা ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। তোতাপাখিটা পরদিন থেকে রোজ ওর ঘুম ভাঙায় বাবার আওয়াজ নকল করে,—"ওঠ বাবা, ওঠ বাবা" বলে। শুধু তাই নয়। শঙ্খ ওর সঙ্গে যখন যে কথা বলে সে বলে—"ছুমনটর, ছু ছু ম-ন-ট-র-র!" প্রথম দিন ওর মুখে ছু মন্তর শুনে বাবা তো তাজ্জব বনে যায়। নিশ্চয় কোনো জাদুকরের পোষা তোতা ছিল।

শঙ্খ ভাবে, তাই হবে! অন্ততঃপক্ষে পোষা তোতা তো বটেই। সেজন্যেই হয়তো ওটা অন্য তোতাদের সঙ্গে তেমন মিশতে পারে না। মানুষের আশেপাশে থাকে। দাদু-দিদা বিদেশে যাওয়ার আগে থেকেই এই তোতাটির এই আমগাছে আসাযাওয়া। তারপর ধীরেধীরে শঙ্খর ঘরে ঢোকা। এমনকি সকালবেলা অ্যালার্মের শব্দে শঙ্খ বিরক্ত হলে পাখিটা ওর অ্যালার্মের বোতামে ঠোকর মেরে শব্দ বন্ধ করে দিত।

কিন্তু হঠাৎ একদিন পাখিটা আর এল না। পরপর কয়েকদিন না এলে শঙ্খ পাখিটার জন্য চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। মা ওকে বোঝায়, পাখিটা হয়তো অন্য কোন বন্ধুর কাছে গেছে!

শঙ্খর বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু। শঙ্খর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

আর তারপরই একদিন শঙ্খ পাখিটাকে পাশের বাড়ির বারান্দায় খাঁচায় পোরা অবস্থায় আবিষ্কার করে। পাখিটা খাঁচার লোহায় ঠোকর দিচ্ছিল আর চিৎকার করে বলছিল—"ছু-ছু-ম-ন্-ট-র-র।" কিন্তু ওর মন্ত্রে কোনো কাজ হচ্ছিল না। শঙ্খ তখুনি গিয়ে ঐ বাড়ির ছেলেটাকে অনুরোধ করে যাতে পাখিটাকে ছেড়ে দেয়। ছেলেটা মুখ খারাপ করে গালি দিয়ে ওকে তাড়িয়ে দেয়। ছেলেটার নাম বোধিসত্ত্ব। শঙ্খ ঠিক করে ওর স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে এসে বোধিসত্ত্বকে পিটিয়ে পাখিটাকে উদ্ধার করবে। কিন্তু বাবা শুনতে পেয়ে কালী আংকেলকে ফোন করে। কালী আংকেল বাবার সহকর্মীর দাদা এবং নোয়াপাড়া থানার ও.সি। পরদিনই একজন লম্বা-চওড়া পুলিশ অফিসার এসে পাশের বাড়ির ডোরবেল টেপেন। ভদ্রলোকের একহাতে একটা মোটা ফাইল আর অন্যহাতে ছোট লাঠি। ওঁর পেছনে দুজন বন্দুকধারী সিপাই।

বোধিসত্ত্ব দরজা খুলতেই পুলিশ অফিসার বলেন,—তুমিই কি বোধিসত্ত্ব, যে একটা লুপ্তপ্রায় সিট্রিকেফোরমেস্‌কে আটকে রেখেছ?

বোধিসত্ত্ব হাঁ। সে ভয় পেয়ে ছুটে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। পুলিশও ওদের বাড়িতে

ঢোকে। বোধিসত্ত্বের বাবা মা বাইরে বেরিয়ে আসেন। পুলিশ অফিসার গর্জে ওঠেন, বাঃ ছেলের নাম রেখেছেন বোধিসত্ত্ব আর তৈরি করেছেন একটা পাষণ্ড!

বোধিসত্ত্বের বাবা ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, — কী বলছেন স্যার?

—নয়তো কী, পাষণ্ড না হলে কেউ একটা লুপ্তপ্রায় পাখিকে এভাবে বন্দী করে? এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘন করার দায়ে পরিবারসুদ্ধ সবাইকে শ্রীঘরে যেতে হবে!

ওর মা বলে, — ও তো একটা তোতাপাখি ধরেছে!

পুলিশ অফিসার হেসে বলেন, — এ যে সে তোতাপাখি নয়, সিট্রিকেফোরমেস্, এভাবে মানুষের অত্যাচার চলতে থাকলে আইভরি বিল্ড কাঠঠোকরার মতন এরাও একদিন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

বোধির মা এবার কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলেন, — আমরা না জেনে একটা অন্যায় করে ফেলেছি হুজুর! যা বাবা, এক্ষুণি ওটাকে আকাশে উড়িয়ে দে!

পুলিশ অফিসার একটু কী যেন ভাবেন। তারপর আবার গর্জে উঠে বলেন, — ঠিক আছে এবারের মতন আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে এমন কিছু হলে কিন্তু বাড়িসুদ্ধ সবাইকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো।'

বোধিসত্ত্বর বাবা তখনো ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমকে বলেন, — হাঁ করে দেখ্‌ছিস কি? যা, তাড়াতাড়ি পাখিটাকে ছেড়ে দে!

বোধিসত্ত্ব ছুটে দোতলায় উঠে যায়। তারপর খাঁচার দরজা খুলে দেয়। পাখিটা বেরুনোর রাস্তা দেখতে পেয়েই বলে, — 'ছু মনটর-র-র!' তারপর বাইরে বেরিয়ে ডানা ঝাপটে আকাশে উড়তে শুরু করে। শঙ্খ নিজেদের ছাদে দাঁড়িয়ে রগড় দেখছিল। তোতাপাখিটা আকাশে এক চক্কর দিয়ে একবার আমগাছের পাতা ছুঁয়ে সোজা এসে শঙ্খদের রেলিঙে বসে।

পুলিশ অফিসার তারপর ওদের বাড়িতে এলে শঙ্খর বাবা বলে, — কালীদা যে একজন অর্নিথোলোজিস্টও সেটা তো জানা ছিল না!

কালি আংকেল হো হো করে হেসে ওঠেন।

আজ সকালে পখিটা ওকে 'ওঠ বাবা, ওঠ বাবা' বলে ডেকে তুললে শঙ্খর কান্না পেয়ে যায়। বাবা কোথায়, কোথায় বাবা?

আর তখনই আশংকা হয় বাবাও পাখিটার মতন কোনো বিপদে পড়েনি তো?

পাখিটা একটু থেমে বলে, মা-ং-কি, মা-ং-কি, ওঠ বাবা! পাখিটার আওয়াজে ত্রাস। শঙ্খ ধড়মড়িয়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। তারপর যে দৃশ্য দেখে তা কখনও কল্পনা করেনি। গতকাল দেখা সেই মাদারির বাঁদরটা আমগাছের কাঁচাপাকা আমগুলিকে খেয়ে খেয়ে নিচে আঁটি ফেলছে। এত দ্রুত খাচ্ছে যে দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু তার চাইতেও বেশি অবাক হতে হয় ওটার পোশাক দেখে। মাদারির পরানো লাল জামার

ওপর বাঁদরটা শঙ্খর স্কুলপোশাকের একটা টাই ঝুলিয়েছে। ঐ টাইটা নিশ্চয়ই ব্যালকনি থেকে নিয়ে গেছে ওটা। তোতাপাখিটা বারবার ঘাড় ঘুড়িয়ে ওকে দেখছে আর পরিত্রাহী চেঁচাচ্ছে।

—ভাগ্, মাংকি, ভাগ্, ছংখ - ওঠ বাবা! শঙ্খ ভাবে মাদারিকে খবর দেবে না! এখন কি করা উচিত? শঙ্খ পা টিপে টিপে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে। ব্যালকনিতে পা রাখতেই চমকে ওঠে। দাদুভাই ওকে ইশারায় শব্দ করতে মানা করে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলে, — বনদপ্তরে ফোনে খবর দিয়েছি, ওরা এসে এটাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে, মাদারিকে খবর দিলে ও নিয়ে গিয়ে আবার যন্ত্রণা দেবে। একথা শুনে শঙ্খ খুব খুশি হয়।

গতকাল বিকেলেই দাদুভাই ও দিদা আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। দিদাকে পেয়ে মা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। দিদাও মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এই দিদা বাবাকেও সন্তানের মতন ভালবাসে। দিদার কথায় শঙ্খ বুঝতে পারে যে অপু আঙ্কেলের বউটা ভাল হয়নি। ওখানে কাজের লোক পাওয়া যায় না বলেই নাকি বাচ্চা রাখার জন্যে বুদ্ধি করে দিদাকে ওখানে নিয়ে গেছিল। একদিন দিদা আড়াল থেকে নিজের ছেলে ও ছেলের বউকে এই নিয়ে কথা বলতে শুনেছে। তারপর থেকেই এখানে আসার জন্যে মন ছটফট করছিলো। দাদুভাইএর চিঠিতে এই ঘটনা জেনে বাবা নাকি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে দাদুভাইকে একটা জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিল।

সেই অছিলাতেই ওরা আবার দেশে ফিরেছেন। বাবা কয়েকদিন ধরে ঘরে ফেরেনি শুনে দাদুভাই মনে মনে কী যেন হিসেব করলেন। তারপর বলেন, আগামীকালও যদি না ফেরে তাহলে পুলিশে খবর দিতে হবে। আগামীকাল আমি কলকাতা গিয়ে কয়েকটা জায়গায় খবর নেবো! নাসিমকে ফোন করলাম, পাইনি —

পনেরো

তোমার মতন বলিতে পারি না অমরু
কত সহজেই বলে গেছো প্রেম কথা
আজ নানা ছলে ঘোরাতে হয় যে কথাকে
কী যে ব্যবধান, এই বুকে বাজে ডমরু।

—বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

ঘুমের ঔষধ খেয়েও ঘুম আসে না আমার। বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। কখনো প্রচণ্ড শীত করে। মরিয়ানী কোঅপারেটিভ থেকে কেনা মণিপুরি লাইছাংপা গায়ে চাপিয়ে কুঁকড়ে শুয়েও শীত কমে না। আবার কিছুক্ষণ পরই গরম লাগতে শুরু করে। শরীর অস্থির অস্থির করে। বাধ্য হয়ে আরেকটা ট্যাবলেট খাই। এবং একসময় ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। এটাই এখন প্রতিদিনকার নিয়ম হয়ে উঠেছে। দুটো ট্যাবলেট খেয়েও একেবারে গাঢ় ঘুম হয় না। মাঝেমধ্যেই বাজে স্বপ্ন দেখি। মাঝেমধ্যেই আমার স্বপ্নে ঢুকে

পড়ে একটা গাধা। পরিতোষের এই নির্মম নীরবতা। বিছানার মধ্যে ক্রমাগত পুরু হতে থাকা এক অদৃশ্য দেওয়াল ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু একটা অপরাধবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমি পাগল হয়ে যাব। জানি, ওর কাছে গেলে, ওর বুকে ঝাঁপিয়ে আত্মসমর্পণ করলে ও ফিরিয়ে দেবে না। কিন্তু পারি না।

সেই রাতে ছটফট করতে করতে একসময় সবে দুই চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে এসেছে, একটা খুট্ শব্দে চমকে উঠে দেখি পরিতোষ পাশে নেই। দরজা হাঁ করে খোলা। সুযোগ পেয়ে একটা বিড়াল এসে ঢুকেছিল। আমি ধড়মড় করে উঠে টলতে টলতে দুই ঘর, বাথরুম ও ল্যাট্রিন দেখে সদর দরজায় গিয়ে দেখি সেটাও খোলা। তাড়াতাড়ি পায়ে চপ্পল দুটি গলিয়ে আমিও পথে বেরিয়ে পড়ি। না জানি কেন দুম করে রেললাইনের কথা মনে পড়ে। এই মাইলখানেক দূরেই তো রেললাইন। ঝড়ের বেগে হাঁটতে হাঁটতে দূরে আমি ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পরিতোষকে দেখতে পাই। হ্যাঁ, পরিতোষই তো! নাহলে পথের দুপাশে এতগুলি নানা আকারের কুকুর ভুকছে-ভৌ-ভৌ-ভুক-ভুক-ভৌ—কেউ কেউ ছুটেও আসছে খেঁকিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে। কিন্তু কাউকে পাত্তা না দিয়ে সটান হেঁটে চলেছে লোকটা। পরিতোষ ছাড়া কাউকে আমি এত সহজে এমনি কুকুর শেয়াল সাপকে পরোয়া না করে নির্বিকার হেঁটে যেতে দেখিনি।

আমি হেঁটে ওর সঙ্গে পারি না। দূরত্ব বাড়তে থাকে। হঠাৎ দূর থেকে ট্রেনের শব্দ শুনে আমি ছুটতে শুরু করি। কিন্তু একটু ছোটার পরই পথের দুপাশ থেকে কয়েকটা কুকুর আমার দিকে তেড়ে আসে। আমি স্থির হয়ে যাই। ওরাও স্থির হয়। পরিতোষ বলত, স্থির দাঁড়িয়ে কুকুরের চোখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকাতে হয়। তাহলেই ওরা চিৎকার থামিয়ে লেজ নাড়াতে শুরু করবে। তখন ওদেরকে পাত্তা না দিয়ে নির্বিকার হেঁটে যেতে হবে। সেকথা মনে করে আমি ওদের চকচকে চোখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকাতেই ওদের চিৎকারের প্রাবল্য কমে যায়। কুকুরগুলি লেজ নাড়াতে শুরু করে। আমি আবার জোরে জোরে হাঁটতে থাকি। বুক ও পেটের সন্ধিক্ষণে ব্যথা করে। একথা চিৎকার করে ওকে জানাতে ইচ্ছে করে। একথা জানলে ও নিশ্চয়ই দাঁড়াত। ও আমার কোন কষ্ট সহ্য করতে পারে না। কারো কষ্টই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ও এখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ব্যথা ও বুকের ধড়ফড়ানি থামাতে একটু দাঁড়িয়ে, একটু জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে। অজানা সমুদ্রের ঢেউয়ে একটি প্রিয় জাহাজ বারমুডা ত্রিভূজের মতন কোনোখানে হারিয়ে যেতে পাবে।

আমি আবার ছুটতে শুরু করি। আবারও কুকুরেরা তেড়ে আসে। অন্যপাড়ার কুকুরগুলি খেঁকায়। কেউ কেউ দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসে। কিন্তু পরিতোষের শেখানো কৌশলে ওদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলি, আরো আরো অনেক কুকুর ও একজন শেষরাতের শক্তিহীন মাতালকে অতিক্রম করি। চলতে চলতে শঙ্খের কথা মনে পড়ে। শঙ্খ এখন দিদার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। কালরাতে আমি কিছু খেতে পারিনি। পরিতোষও তেমন কিছু খায়নি। খাওয়ার টেবিলে শঙ্খ ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করে,—তুমি বললে না বাবা

মিতাকাকীমা তোমাকে অমন রাগী রাগী মুখ করে কী বলছিলো?

পরিতোষ বলে,—'নপুংসক!' এরকম জবাব শুনে আমি চমকে উঠি। ছেলেকে কী বলছে পরিতোষ!

—'কী বললে?' মাসী জিজ্ঞেস করে। আমি অতলে তলিয়ে যেতে থাকি।

—না একথা বলেনি, আমাকে ভেলিকোভস্কি বলে খেপাচ্ছিল! পরিতোষ গম্ভীরমুখে বলে।

—'সেটা আবার কী?' পরিতোষের জবাবে হাঁ হয়ে যাই আমরা সবাই। মাসী আবার জিজ্ঞেস করে—'সেটা আবার কী বাবা?'

পরিতোষ বলে,—বিলেতে ইমানুয়েল ভেলিকোভস্কি নামে এক ডাক্তার তিনটে বই লিখেছেন। ঐ বইগুলি তিনি বাইবেলের অদ্ভুত সব কান্ডকারখানার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন, দানব-গ্রহ বৃহস্পতি থেকে একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে ধূমকেতু হয়ে গোটা সৌরজগৎ জুড়ে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। সাময়িকভাবে মঙ্গলগ্রহ ছিটকে সরে আসে পৃথিবীর দিকে। ফলে পৃথিবীর বনবন করে ঘোরা নাকি থেমে যায়—তাতে, লাল সাগরের জল নাকি শুকিয়ে যায়। ইজরায়েলের উদ্বাস্তুরা নাকি তখন হেঁটে পেরিয়ে যায় খটখটে সমুদ্র অঞ্চল।

শঙ্খ চোখ বড় বড় করে বলে,—সেজন্যেই কি সবাই এখন প্যালেস্টাইনের সমর্থক? ইয়াসের আরাফাত সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় নেতা? না বাবা, আমি তো শুনেছি ওদের আসল সমস্যা হলো মাটির নীচের তেলের অধিকার!

—ঠিকই শুনেছিস! পেট্রোলিয়াম পণ্যের সঙ্গে জাতিসত্তার এক জটিল আবর্ত। ভেলিকোভস্কি বলেছেন বৃহস্পতির ধূমকেতু থেকে নাকি পেট্রল বৃষ্টি হয়—সেই পেট্রল দিয়েই আজ গাড়িটারি চলছে মঙ্গল আবার সরে গেলে পৃথিবী আবার ঘুরপাক খেতে শুরু করে লালসাগর আবার জলে ভরে যায়। মিশরীয়রা ডুবে যায়।

মাসী বলে,—ইশ্, কী মারাত্মক সব ব্যাপার, আসলে হয়েছিল, নাকি আজগুবি!

পরিতোষ গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—ভেলিকোভস্কি এরকমই লিখেছে—এরপরেও বারকয়েক ফিরে এসে গোটা পৃথিবীকে লন্ডভন্ড করে সেই বিশাল ধূমকেতুটাই নাকি হয়ে পড়ে শুক্রগ্রহ!

মাসী বলে—কিন্তু আমাদের পুরাণেই তো দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কথা বলা আছে।

শঙ্খ বলে,—কিন্তু মিতা কাকীমা তোমাকে ভেলিপুংসক বলল কেন?

পরিতোষ এবার ওর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে বলে,—হ্যাঁ ভেলিপুংসক না ভেলিকোভস্কি এসব না বলে আমাকে শুক্রাচার্য বলতে পারত অথবা দুষ্টগ্রহ। বলতে বলতে পরিতোষের চোখে জল চলে আসে।

—কেন বাবা?

মাসী বলেন,—খেতে দাও বাবাকে, মজা করছে বুঝতে পারছো না?

শঙ্খ বলে,—কই, বাবা তো একবারও হাসেনি, বাবার চোখে কোন দুষ্টুমি নেই। বাবা তো কাঁদছে। ও বাবা তুমি কাঁদছো কেন?

পরিতোষ ওর পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছে বলে,—ও কিছু না। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বেসিনে হাত ধুতে যায়। মাসী একবার বলে, ওমা, পরিতোষ, কিছুই খেলে না যে বাবা?

মাসী আমার মুখের দিকে তাকান। আর তারপরই চাহনি পাল্টে যায়। নিমেষে সমস্ত মাতৃত্ব উবে গিয়ে একজন বিচারকের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। আপাদমস্তক দেখেন। আমার চেহারা ও নীরবতা থেকে কিছু তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তিনি আমার বিচার করেন। তারপর যা দণ্ড দেন তা শুধু মাসীর চোখের ভাষায় বিদ্ধ হয় — আমার অস্তিত্বে। মাসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,—আমার বাড়ির জন্যে মন টানছে, এই শুকনো জায়গা আর ভাল লাগে না, তোরাও সব কেমন হয়ে যাচ্ছিস, আমাকে বাড়ি রেখে এসো বাবা,—অনেক হয়েছে!

পরিতোষ শোবার ঘরে ঢুকে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে। বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দেয়। শঙ্খ গিয়ে গুটিগুটি দিদার পাশে শোয়। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে—কোনো কারণে বাবার মন খারাপ। কিছুক্ষণ পর আমিও গিয়ে ওদের পাশে শুয়ে পড়ি। আর অনেকক্ষণ ছটফট করতে করতে সামান্য ঘুমিয়ে পড়তেই বৃহস্পতি থেকে একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে পড়ে রত্নাডার পথে। ধূমকেতুর মত ছুটতে থাকে। কোন মহাজাগতিক কুকুরের আস্ফালন ওকে রুখতে পারে না। রুখতে পারে না আমাকেও। আমি যে মনে মনে নিজেকে ঐ মহাজাগতিক উল্কারই অনুবর্তী ভাবি। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? পরিতোষ না নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল? সে কবে ফিরল? রেললাইনের কাছে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি গায়ের শালটাকে একদিকের রেললাইনে বিছিয়ে সেটাকে বালিশ করে একটা পাথরহীন পাটাতনে শুয়ে অন্য রেললাইনের উপর পা রেখেছে পরিতোষ। আমাকে কি দেখতে পেয়েছে সে? নাকি পাশাপাশি চলতে থাকা দুটো রেললাইনের জন্য দুঃখ অনুভব করে ওদেরকে কিছুক্ষণের জন্যে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। রেললাইন বিদ্যুতের সুপরিবাহী। মানুষের শরীরও তাই। তাই পরিতোষ কোন বজ্রপাতের অপেক্ষায় শুয়ে থাকতে পারে নির্বিকার। যে মুহূর্তে বজ্রপাত হবে পাশাপাশি আজীবন চলতে থাকা দুটো লৌহদণ্ডের মধ্যে মিলন ঘটবে একজন মানুষের শরীর বাহিত হয়ে। সংযোগস্থল ঝলসে উঠবে মিলনের উত্তেজনায়। ওর এই ফন্দি বুঝে আমারও লোভ হয়। তাই আরো কাছে গিয়ে ওর পাশেই শুয়ে পড়ি। পরিতোষ আর নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। সে জিজ্ঞেস করে,—তুমি কেন এসেছ? আমি জিজ্ঞেস করি,—তুমি?

পাল্টা প্রশ্ন দিয়েই কারো প্রশ্নের উত্তর দিই আমি। পরিতোষ বলে, — আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।

—আমারও নেই, আমি তো পাপিষ্ঠা কুলটা! নিজের কানেই কথাগুলি যাত্রার

ডায়লগের মতন শোনায়।

এই সেই রেললাইন যার পাশে যোধপুর নগর উন্নয়ন নিগমের তৈরি করা পার্কে বেলে পাথরের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে দুজনে দেখেছিলাম মধুজ্যোৎস্না। ঐ পার্কে একটা নিমগাছ ছিল। আর ছিল কয়েকটা বাবলা গাছ। চারদিকে ক্যাকটাসের ঝোপ দিয়ে তৈরি প্রাকৃতিক আড়াল। কোন মানুষই মধুচন্দ্রিমা ভোলে না। সেজনোই কেউ যায় সুইজারল্যান্ড, কেউ বা কুলু-মানালি কিংবা সিমলা। আমাদের এত এলেম ছিল না। প্রয়োজনও বোধ করিনি। আমরা দুজনেই আসামের মানুষ। সেজন্যে রাজস্থানের সূর্যশহরে এই প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া মধুচন্দ্রিমাই খেজুরের রসের মতন আকণ্ঠ পান করেছি। দূরে কোথায় আরাবল্লীর সিল্যুট আর সামনের আকাশে আলোয় আলোময় মেহরানগড় ফোর্ট।

ট্রেনে দু-রাত কাটিয়ে সেদিন সকালেই পৌঁছেছি যোধপুর। পরিতোষের কাছে শুনেছি প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে রাঠোররাজ রাও যোধার আমলে এই শহর তৈরি হয়েছিল। প্রায় ১০ কিলোমিটার লম্বা দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে শহরটাকে ঘিরে দেওয়া হয়েছিলো। সেই শহরকে এখন সবাই বলে পুরানা যোধপুর। ছোট ছোট গলিপথ, হাভেলি, স্থানীয় মানুষদের সাদা ও নীলরঙের বাড়িঘর আর অসংখ্য ছোট-বড় মন্দির রয়েছে পুরনো এই শহরে। আমরা উঠেছি রত্নাডা শিবমন্দিরের কাছাকাছি একটি ভাড়াবাড়িতে। সেটি নয়া শহরের পশ এলাকা। কাছেই এয়ারপোর্ট।

সেই রাতে মেহরানগড় ফোর্টটাকে যেন আমাদের জন্যেই এত সুন্দর আলোকমালায় সাজানো হয়েছিল। প্রায় দেড়শো মিটার উঁচু মালানি রায়োলাইট আগ্নেয়শিলার টিলার উপর ঐ পঞ্চদশ শতাব্দীর পাঁচ কিলোমিটার লম্বা দুর্গটি প্রায় অর্ধেক আকাশ দখল করে ছিল। দূরে বসে ভাবছিলাম কোথায় প্রবেশদ্বার, কতগুলি মহল, কেমন সব মন্দির, হাভেলি ও বুরুজ। পাহাড় ঘুরে সুন্দর পথ গিয়েছে বিশাল ঐ দুর্গের প্রবেশদ্বারে। তখনো সব কল্পনায় বাস্তবে মাখামাখি। তখনো কাছে গিয়ে দেখিনি। সবে তো সেদিন পৌঁছেছি। ট্রেনে আসার পথে পরিতোষের কাছে গল্প শুনেছি থর মরুভূমির মুখে শুষ্ক আরাবল্লীর বুকে কেমন স্বপ্নের মতো 'যোধাজী কা ফলসা'। আমি জিজ্ঞেস করি 'ফলসা' মানে কি জলপ্রপাত?

পরিতোষ হেসে বলে,—না, না, যোধাজী কা ফলসা মেহরানগড় ফোর্টের স্থানীয় নাম। তুমি সেখানকার মোতিমহল, ফুলমহল, সিলহেখানা, দৌলতখানা আর শিশমহল নিয়ে তৈরি শিল্প সমৃদ্ধ প্রাসাদপুরীর মাঝে দেখতে পাবে দারুণ একটা মিউজিয়াম!

সত্যি সত্যি দুদিন পরই মেহরানগড় ফোর্ট ঘুরতে গিয়ে ঐ মহলগুলির সৌন্দর্য আর রাজপরিবারের নানা সম্পদে সাজানো মিউজিয়ামটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমাকে অবাক করেছে অস্ত্রশস্ত্র আর বাদ্যযন্ত্রের বিপুল সংগ্রহ। এতরকম বাদ্যযন্ত্র যে মানুষ বাজাতে পারে আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। কতরকমের ঢোল, মাদল, খোল, মৃদঙ্গ, তানপুরা, নানা আকারের নানা নামের বীণা, এসরাজ, একতারা, দোতারা, তিনতারা, সান্তুর, কতরকমের বাঁশি ক্ল্যারিওনেট ও ছোটবড় সানাই দেখে আমি অবাক। মিউজিয়ামে বেশ কয়েকটি

মানুষসমান প্রতিকৃতি আঁকা রয়েছে। ছবিগুলি যেন জীবন্ত। দুর্গের প্রাচীরের মাথায় সার দিয়ে সাজানো রয়েছে ছোটবড় অজস্র কামান। অনেক বিদেশী পর্যটক সেখানে ফটো তুলছিলো। একপাশে দেবী চামুণ্ডার মন্দিরে স্থানীয় মানুষজন পুজো দিচ্ছিল। পুরোহিত বাজাচ্ছিলো একটি অসাধারণ শঙ্খ। আমাদের সঙ্গে ঘুরতে আসা রাজস্থানী নাট্যকার অর্জুন দেব চারণ এই শঙ্খনাদের সঙ্গে ঋগ্বেদের স্তোত্র উচ্চারণ করে—

অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভির আভিঃ
স্তুহি পর্জন্যং নমসা বিবাস।
কনিক্রদদ্ বৃষভো জীরদানু
রেতো দধাতি-ওষধীষু গর্ভম্ ।। ১ ।।

পরিতোষ বলে এই অংশটি বাংলায় শোনাই, গৌরী ধর্মপাল অনুবাদ করেছেন—

বলো এস এস, মহা-ভীমে ডাকো গানে গানে
ডাকো স্তবে স্তবে, ডাকো উপচারে, নুয়ে নুয়ে।
গর্জায় পর্জন্য-বৃষভ ক্ষিপ্র - দান
রেতো-বর্ষণে ওষধিতে করে গর্ভাধান

আমি হেসে বলি,—এতো দেখছি মেঘের উপাসনা—

পরিতোষ বলে,—মেঘ মানেই সম্ভাবনা। শঙ্খনিনাদ সবসময় সম্ভাবনাকেই আহ্বান করে, যেমন কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য মৃত্যুকে জয় করে অমরতার জয়গান গায়। যেমন ভগীরথের শঙ্খনাদে গঙ্গার মর্ত্যে আগমন!

আমি ভাবি অন্য সম্ভাবনার কথা। মোটা গোঁফঅলা এক বুড়ো অপরূপ ছন্দে মাদল বাজাতে থাকে, আরেক যুবক বাজায় তাসা। কিন্তু ঐ মধুর সরগমকে মাত্রান্বিত করে স্বর্গীয় করে তোলে পুরোহিতের অসাধারণ শঙ্খনাদ।

আমি পরিতোষকে বলি,—আমাদের ছেলে হলে নাম রাখবো শঙ্খ!

পরিতোষ বলে,—কী?

আমি লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিতেই পরিতোষ বলে,—অ!

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করে,—আর মেয়ে হলে মা চামুণ্ডা?

আমি হেসে বলি,—তোমার ইচ্ছেমতন নাম রেখো!

এই সেই রেললাইন। শঙ্খর বয়স যখন বছর তিন একদিন সকালে আমি বাথরুমে ছিলাম আর শঙ্খ ঘুম থেকে উঠে ছোট ছোট পা ফেলে এই লাইনে পৌঁছে গেছিল। তুমি মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরার সময় তাই দেখে দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে কোলে করে ঘরে ফিরে আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল পরিতোষ। পরে আমাকে কাঁদতে দেখে নিজেও কেঁদে ফেলেছিলে, দরজাটা যে সেদিন তুমিই খুলে গেছিলে তা বুঝতে পেরে তোমার আফশোষের পরিসীমা ছিল না। সেদিন তুমি আমাকে অনেকদিন পর সারারাত আদর

করেছিলে! এই সেই রেললাইন। আমার শুয়ে আছি পাশাপাশি – চুপচাপ।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা চারপেয়ে প্রাণী এসে রেললাইনের পাশে দাঁড়ায়। প্রথমে ভেবেছিলাম বাছুর। কিন্তু ওর কান দেখে আর পেটের নিচে বিশাল লিঙ্গ ঝুলে থাকতে দেখে বুঝতে পারি ওটা একটা গাধা। গাধাটা আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। গাধাটা কি আমাদের ফলো করছে? পরিতোষই আবার নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করে,—শঙ্খকে কে দেখবে?

আমি জিজ্ঞেস করি,—তুমি সেকথা ভাবোনি?

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আকাশের তারারা ব্যঙ্গের হাসি হাসে মিটিমিটি। শুধু গাধাটা নীরবে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকে ট্রেনের হুইশল শোনা যায়। আমি আর থাকতে পারি না। পরিতোষকে ধাক্কা দিয়ে বলি,—তুমি উঠে যাও, তুমি তো কোন দোষ করোনি, দোষ করেছি আমি, আমি মরে গেলে তুমি আরেকটা বিয়ে করো, শঙ্খকে মানুষ করো!

পরিতোষ ধীরে বলে,—এতোই যদি ছেলের কথা ভাবো—এরকম করো কেন?

আমি কেঁদে ফেলি। সে কী আকুল কান্না! কাঁদতে কাঁদতে বলি,—আসলে কোন পুরুষের চোখে লম্পট দৃষ্টি দেখলেই আমার হিতেন সরগিয়ারির কথা মনে পড়ে! তখন আমার কী যে হয়ে যায়। প্রতিশোধ স্পৃহা—

—হিতেন আবার কে?

আমি তখন পরিতোষের কাছে হাগ্রাবাড়ির কথা বলতে শুরু করি। কিন্তু সেইগল্প শেষ হওয়ার আগেই ট্রেন এসে যায় এবং আমরা কাটা পড়ি। শেষমুহূর্তেও আমি পরিতোষকে ঠেলাঠেলি করেছিলাম শঙ্খের দোহাই দিয়েছিলাম। কিন্তু সে ভীষণ গোঁয়ার। একবার যা ভাবে তাই করে ফেলে। আমিও আর উঠতে পারি না। দুজনের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে জড়াপাল্টা লেগে যায়। কেউ একনজরে দেখে বলতে পারবে না কোন্ কোন্টা আমার অঙ্গ আর ঠিক কোন্ কোন্টা পরিতোষের। রেলে কাটা শবের ডি. এন. এ টেস্ট ইত্যাদি করার প্রচলন এখনো আমাদের দেশে চালু হয়নি। প্রয়োজনও পড়ে না। কতলোকই তো রোজ কাটা পড়ে যায়—আত্মহত্যা করে। আমরাও তেমনি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাধাটা শুধু চমকে কেঁপে উঠেছিল। দুজনের মাথার ঘিলু ছিটকে ডাউন লাইনের পাথরগুলিকে রঙিন করে দিয়েছিল। তারপর কাকেরা, শকুনেরা, শেয়ালেরা একে একে জুটেছিল। সকালের আগেই আমাদের পার্থিব অবশেষের অনেকটাই সাবাড় হয়ে গেছিল।

পরিতোষ মরার আগে গাধাটাকে দেখেছিল, মরার পর ও নিজেই একটা গাধার মতন হয়ে যায়। আমি তাকিয়েছিলাম প্রায় মাটি অব্দি ঝুলতে থাকা গাধার লিঙ্গে। আমার আত্মা তাই গাধারূপী ছায়াটির লিঙ্গের চারপাশে পোকার মতন উড়তে থাকে, উড়তে থাকে। ভনভন করে শোনাতে থাকে আমার দুঃখের কথা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের গল্প, এ জীবনে এক অনিয়ন্ত্রিত মানুষীর আজব প্রতিশোধের বিভিন্ন অধ্যায়! যা শুনে আকাশের কোন তারা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে,—কী লাভ হল, চাকু তরমুজের উপরে থাকুক অথবা তরমুজ

চাকুর উপরে — কাটতে হবে তরমুজকেই।

আমি মুখ ভেংচে বলি,—আমি সেসব জানি, কিন্তু মনের জ্বালা মিটাবো কিভাবে?

তারপর ফিসফিস করে গল্প শোনানোর মতন বলি,—আমি শুধু পরিতোষকেই ভালবেসেছিলাম—ওকে নিয়ে সংসার পেতেছিলাম! আজ তাই ওকেই অপূর্ণতার গল্পগুলি বলি, বেঁচে থাকতে যা বলতে পারিনি ভয়ে!

পরিতোষ সেসব শুনছে কিনা জানি না, সে-ও নিজের মতন বলতে থাকে এক আজব গল্প গাঁথা। আকাশে মেঘ নেই। উজ্জ্বল চাঁদের আলো কেমন মায়াবী কুহক সৃষ্টি করে। নিষ্প্রাণ একটি উপগ্রহ অন্যের আলো প্রতিফলন করে কেমন মায়াবী হয়ে উঠতে পারে মানুষ তা গত অর্ধশতক ধরে নিশ্চিন্তভাবে জানে। তবু চাঁদের আলো মানুষকে মোহিত করে। তবু জ্যোৎস্নার কুহকে আমরা শিহরিত হই। পরিতোষের প্রলাপমালায় সেই চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে ক্রমে গুঁড়ো হয়ে যায়। সেই চাঁদের গুঁড়ো কি হীরের কুচির মতন উজ্জ্বল? কি জানি বাবা, পরিতোষের কল্পনার জগতে আমি যে নিতান্তই ব্রাত্য! হায় আমাদের দাম্পত্য!

ষোলো

বজ্রপাত মেঘ নীল স্কন্ধে জমে জমে
জন্ম নিলো কালো মৃত্তিকার গর্দভ
আর হয়ত দেখা হবে না তোমাকে পৃথিবী
দিন যায় ....
যেতে যেতে গুহা প্রপাতের দিকে
সপ্তরং মুছে চলে যান অগস্ত্যের ঈশ্বর
ফেলে রেখে নিদ্রিত ভুবনে
বীভৎস স্বপ্নের দুয়ার, আলজিভের নারী ও
ক্রীড়ারত দাবাড়ু পুরুষ।

—জয়দেব ভট্টাচার্য

গাধাকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেউ যদি ভাবেন ওর বোধশক্তি নেই তাহলে ভুল ভাববেন। আসলে ভীষণ জেদি বলেই নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশ ও সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে সে। আর সেজন্যেই চরম ঋণাত্মক সময়েও স্থির থাকে কালো মৃত্তিকার গর্দভ। জীবন্ত অথচ নিশ্চল কিংবা আনমনা। সে-ই কেবল সময়ের স্রোতকে কান খাড়া করে অনুভব করে।

অদ্ভুত হট্টগোলে সচকিত হয় গাধা। তাকিয়ে দেখে প্রশস্ত সভাঘর। মোটামোটা কারুকার্যময় প্রায় চারমানুষ সমান লম্বা থামের উপর সুন্দর ছবি আঁকা সিলিং। সিলিংময় তেলরঙে আঁকা বিশাল সব পরীদের ছবি। আর মাঝখানে একটি অদ্ভুত গোলক। যা থেকে

আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পরীরা সব ঐ গোলকের দিকে উড়ে যাচ্ছে। গাধা ভাবে, পরীরা আজকাল ভীষণ লোভী! আগে ওরা কিছু পাওয়ার জন্যে কোথাও উড়ে যেত না। ওরা শুধু দিতে জানত। রাতের আঁধারে পৃথিবীর সমস্ত ফুলের বাগানে উড়ে উড়ে ফুল ফোটাত, নানারকম সুগন্ধ দিয়ে যেত। পৃথিবীর সমস্ত শিশুর স্বপ্নে ছুঁয়ে যেত ওদের গাল ও কপাল। ওদের বুকে ফোটাত সততা, ন্যায়, নিষ্ঠা ও ভালবাসার রূপকথা। তারপর সকালে ঘুম ভেঙে ওরা মনে মনে সারাদিন ভাল হয়ে চলার সংকল্প করত।

কিন্তু গাধাটি এ মুহূর্তে কোন সংকল্প করতে পারছে না কেন? ওর কি আদৌ ঘুম ভেঙেছে? নাকি আজকাল ভাল হয়ে চলার ব্যাপারটাই ন্যাকামির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ন্যায়, নীতি, বিচার, সংবিধান, সততা, ভালবাসা শব্দগুলির মানে পাল্টে যাচ্ছে। জল স্থল ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ এখন থাবা বাড়াচ্ছে আকাশপথে। সহস্র স্যাটেলাইট চ্যানেলে আতংকবাদ, যুদ্ধ ও যৌনতাবাহী এক আজব পণ্যসংস্কৃতি বিকল করে দিচ্ছে সভ্যতার প্রতিটি ক্ষুদে একক—পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। চাহিদামাফিক পণ্যের জোগান না দিতে পেরে হিমশিম খেতে খেতে বেশিরভাগ পুরুষ হয়ে পড়ছে ভেড়া, এরা কোনদিন লড়াই করে না, এরা চিরকাল আপস করে। আর কয়েকজন হয়ে পড়ছে গাধা। গাধাদের মন আছে তাই শ্লথ। গাধারা ভারবাহী তাই গতিহীন। আঘাতে আঘাতে স্থবিরপ্রায়। কিন্তু ওরা জেদি বলেই এই সংকল্পের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আজকাল সব শব্দের মানে বদলে যাচ্ছে, নতুন করে কোন সংকল্পের বুদবুদ তৈরি হতে চায় না।

এখন হট্টগোল কিসের? গাধা কান পাতে। সে দেখে পাশাপাশি গদিতে সুদৃশ্য পাশবালিশে হেলান দিয়ে আরো কয়েকজন কান পেতে আছে। তখনই দুজন ষণ্ডামার্কা প্রহরী এক সুদর্শন যুবককে টানতে টানতে একদম ওদের সামনে এনে বলে, মহারাজ আপনার দর্শনপ্রার্থী, কিন্তু ওর কাছে রাণা মহেন্দ্রর কোমরবন্ধ ও তাঁরই নামাঙ্কিত কাটার রয়েছে বলে ওকে গ্রেপ্তার করে এনেছি। গাধা ভাবে, যুবকটিকে কোথায় যেন দেখেছে। ভালভাবে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখে, ষণ্ডামার্কা প্রহরীর একজন বিরখাঙ আর দ্বিতীয়জন সন্তু। ওরা কী অদ্ভুত পোশাক পরেছে। বাঃ প্রহরীর পোশাকে দুজনকে খারাপ লাগছে না তো। এমনিতে বিরখাঙ ক্লিন শেভ করে বলে ওর মেয়েলি ঠোঁটে এই গোঁফজোড়া সুন্দর মানিয়েছে। আর সন্তুকে নিশ্চয়ই এই তাগড়াই গোঁফ লাগাতে ওর নিজস্ব গোঁফ কাটতে হয়েছে। সেজন্যেই ওদেরকে চিনতে একটু দেরি হল। হাসি পায়, ওরা শেষ পর্যন্ত প্রহরীর ভূমিকায়। কিন্তু গোঁফজোড়া এত সুন্দর লাগিয়েছে যে ওদেরকে আসল মনে হচ্ছে। কিন্তু যাকে ধরে এনেছে সেই যুবক যতই তেজস্বী হোক না কেন ভীষণ পরিচিত। চেনা চেনা লাগলেও এখন পর্যন্ত চিনে উঠতে পারছে না!

কিন্তু ওরা 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করছে কাকে? কে মহারাজ। সে ডানদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখে সোনার সিংহখচিত এক বিশাল আসনে বসে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে এক বিশাল মানুষ। সম্রাট সাজাহানের মতন আয়েস করে বসে আছেন। তখনই নারীকণ্ঠ শোনা যায়, —মহারাজ হামীর সুমরা শতকোটি প্রণাম, প্রণাম মন্ত্রীবর সিন্‌হিরো ধমাচানী, শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী

ডংবরসিংহ ভাটী, শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী রাণা মহেন্দ্র সোঢ়া, প্রণম্য দিগগজ বীর ও পণ্ডিত সভাসদবৃন্দ আপনারা সবাই মীরপুর মাথেলার অধিপতি মহারাজ নন্দের দ্বিতীয়া কন্যা সুমলের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

পরিতোষ চমকে ওঠে। আর সুমলও ওর নকল দাড়িগোঁফ টেনে খুলে বলে,—আপনারা চমকে গেলেন তো? হ্যাঁ, এই ভ্রম সবাই করে, আপনাদের বীর মন্ত্রীমশাই রাণা মহেন্দ্রও একটা বিরাট ভুল করেছেন। আর সেই ভুলের খেসারত দিচ্ছি আমরা সবাই। সব চাইতে বেশি কষ্ট পাচ্ছে আমার দিদি মুমল আর বোধকরি রাণা মহেন্দ্র নিজেও! আমি মহারাজ নন্দের দূতী হিসেবে, সমগ্র নারীসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে মহারাজের কাছে বিচার চাইতে এসেছি।

সুমল দেখতে অনেকটা বিদাংশ্রীর মতন। ওর শেষের কথাগুলি ক্রমে ফেড হয়ে আসে, রাজসভাও অস্পষ্ট হয়ে নিভে যায় আর জেগে ওঠে মরুভূমি। বিশাল মরুভূমি। আর উটের দুলুনি। মহেন্দ্র দুলতে দুলতে চলতে থাকে। এই নতুন উটনীর পিঠে চেপে ভীষণ সতর্ক থাকতে হচ্ছে। সামান্য অসতর্ক মুহূর্তে দিক্‌ভ্রম হতে পারে। তাহলেই দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলতে হবে, মরুভূমি আর শেষ হতে চাইবে না। সে টানটান হয়ে আকাশের লক্ষ্য করে উটচালনা করে।

চলতে চলতে চলতে চলতে একসময় চরাচরে বনানীরেখা স্পষ্ট হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরাবল্লীর পাদদেশে সেই আদি অরণ্যে প্রবেশ করে। কোথায় যেন পড়েছে পরিতোষ, ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করে এই বনানীসহ আরাবল্লী পর্বতমালা, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট সহ সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণভারত বহুকোটি বছর আগে বিশাল ভূমিকম্পে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আলাদা হয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী তৎকালীন পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর থেটিসের বুকে অ্যান্টিক্লকওয়াইজ বছরে ৬ সে.মি. বেগে চলতে চলতে প্রায় ছয় কোটি বছর আগে এসে এশিয়া মহাদেশে আছড়ে পড়ে। এই প্রবল ধাক্কায় জেগে ওঠে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আর ধীরে ধীরে জেগে ওঠে এই পৃথিবীর নবীনতম সাতটি পর্বতমালা। হিমালয়, কারাকোরাম, হিন্দুকুশ, সালতোরো, লাদাখ রেঞ্জ, তিয়েনসান ও জাঁসকর পর্বতমালার বিভিন্ন শৃঙ্গের উচ্চতা আজও বাড়ছে। এই মহাসংঘাতের ফলেই নাকি পৃথিবীর বুক থেকে অতিকায় ডাইনোসরেরা বিলুপ্ত হয়েছে। হিমালয়ের নানা শৃঙ্গে পাওয়া অতিকায় সব জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ফসিল এবং গুজরাট অঞ্চলে পাওয়া ডাইনোসরের ডিম ও ফসিল এই তথ্যকে সমর্থন করে।

এসব মনে পড়তেই আরাবল্লীর পাদদেশে আফ্রিকার মতন এক আদিম অরণ্যের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সে শিউরে ওঠে। অথচ নাসিম সাহেবের সঙ্গে যখন এসেছিল তখন ছিল ধূ ধূ মরুভূমি। কিছু বাবুল, ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বছরের পর বছর অগ্রেমের দাবদাহে শুকিয়ে গেছে।

তাহলে এখন অরণ্য কোথা থেকে গজাল? নাকি এটা হাগ্রাবাড়ির জঙ্গল। কাকনদীর বুকে এত জল! এটা কাকনদী না পাগলদিয়া? নাকি এটা ছশোবছর আগের লোদ্রভা

অরণ্য? দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে উটনীর পিঠে বসে দুলতে দুলতে পাহাড়ের অন্যপাশে কাকমহলের মর্মর প্রাচীর ভেদ করে অন্য অরণ্যের গাছপালার পথে এগিয়ে যেতে যেতে সে ভাবে, তাহলে এই অদেখা অরণ্য এত পরিচিত লাগছে কেন? সে স্বপ্নে অন্য কিছু হয়ে পড়েছে? নাকি কোন পূর্বজন্মের পথে প্রাচীন চিত্রের মতন চিরস্থায়ী কোন প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে চলেছে? অথবা ছশো বছর পিছিয়ে? সামনেই আলো ঝলমলে কাকমহল। সিংহদুয়ারের দুপাশে যন্ত্রবাঘেরা এখন প্রস্তরবৎ। নৈশপ্রহরিণীরা ওকে কুর্নিশ করে। তখনও এমন নাইট ডিউটি চলত?

এখন মাঝরাত। বিরহী পুরুষের প্রতিটি পদক্ষেপ এখন প্রেয়সীকে বাহুডোরে ভরে নেওয়ার অভিলাষ। প্রতিটি পদক্ষেপে মুক্তির নেশা। আজ আর ভোররাতেই চোরের মতন ফিরে যেতে হবে না। মহলের বাইরে উট থেকে নেমেই সে একটা সাইকেল দেখতে পায়। সাইকেল না ঘোড়া, সে কাছে গিয়ে দেখতে পারে না, শরীরে যেন কিসের গতি, অদৃশ্য কিসের ধাক্কা। সে কি কালপ্রবাহের বিপরীত গতিতে উড়ে চলেছে কাকমহলে? অনায়াসে একের পর এক মহল অতিক্রম করে। একের পর এক পর্দা সরায়। আর তারপর শয়নকক্ষে ঢুকে চমকে ওঠে। এটা কি চোখের ভুল? সে কি স্বপ্নে না জাগরণে? সে কি প্রেমিক না আততায়ী? নাহলে কোমরবন্ধ থেকে কাটার নিয়ে নিজের বিবাহিত স্ত্রী আর তার বাহুপাশে আবদ্ধ অন্য পুরুষকে কাটতে যাবে কেন?

না, সে তা করে না। অন্যের দোষে নিজের হাতকে রক্তাক্ত করলে দোষীকে কোনো শাস্তিই দেওয়া হবে না। শাস্তি তো মনের প্রাপ্য। যে মরে যাবে সে আর কেমন করে শাস্তি পাবে? যদিও পুরুষের রক্ত তখনো টগবগ করে ফোটে। শুধু পুরুষ কেন, এহেন দৃশ্যে কোন নারী তার স্বামীর বাহুপাশে গোপনে অন্য নারীকে দেখলে তারও রক্ত এমনি টগবগ করে ফুটবে। তখন শয়নকক্ষের স্বপ্নিল আলোতে নিজেকে সংযত রাখা দুষ্কর। খুব কম মানুষই তা পারে। আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সেও ওদের দুজনকে কেটে দু-টুকরো করে ফেলবে। সে তাই নিজেকে সামলে কোমরে বাঁধা বস্ত্রখণ্ড এবং ধারালো কাটারটি ঐ কামরার দেওয়ালে টাঙিয়ে ঐ ঘর থেকে, ঐ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসে। ঘৃণা ও অপমানে রি রি করে শরীর, রি রি করে অস্তিত্ব। সে উটের পিঠে বসে দুলতে দুলতে ভাবে আমি কি মানুষ না শব? ভুলভুলাইয়ায় আবার ঢোকার আগে কে ছিলাম এবং কেমন ছিলাম সেটাই ক্রমে ভুলে যাচ্ছি। ভুলভুলাইয়া ছিন্নভিন্ন করে বীরদর্পে ঢোকার পরও আমার ও নানা জাদুজালের মধ্যে, আমার ও বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে কেবল যে জীবন দেওয়ার সম্পর্ক ছিল, তাও এতদিন কেন যে বুঝতে পারিনি! এখান থেকে শেষরাতে উটনীর পিঠে চেপে এতটা পথ পেরিয়ে উমরকোট ফিরতাম, তারপর কারাগারে ঢুকে স্নান, খাওয়া আর ঘুম। ঘুম, ঘুম, দারুণ দারুণ স্বপ্ন আর ঘুম। দুপুরে রুটি খেতাম ঘুমের ঘোরে। নাপিত দাড়ি কামাত আর তারপর আবার স্নান খাওয়া সেরে আমি যখন উটনীর পিঠে চাপতাম তখন গিয়ে ঘুম কাটত। কিন্তু তখন আর স্বপ্নের দুনিয়ার কথা মনে থাকত না!

আজ এক মুহূর্তে তৈরি হয় কিছু দুঃস্বপ্ন যা শতসহস্র ঘন্টার সুন্দর স্বপ্নকে নস্যাৎ

করতে পারে। ভোরের আগেই উমরকোট পৌঁছে দেখে রাতের আঁধারে শহর সাজছে। কিছু লোক দড়ি বালতি মই ইত্যাদি নিয়ে শহর সাজাচ্ছে। ওদের জন্য খুব কষ্ট হয়। প্রাসাদে ঢুকে নিজের কামরার জানালা দিয়ে দেখে ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে একটা প্রাণহীন শহরের অবয়ব জেগে উঠছে। ওরা এখনও শহরকে সাজাচ্ছে যেমন লোকে শবযাত্রার আগে মৃতদেহকে সাজায়। সে ভেতরে ঢুকে জানালাটাও বন্ধ করে দেয়। তারপর চুপচাপ গৃহবন্দি হয়ে পড়ে। অস্বস্তির পরিমাপদণ্ডে এক পাল্লায় থাকে কৃতকর্ম আর অন্য পাল্লায় আফসোসে। সে যদি খুন করে আসত কিংবা কোনভাবে নিজেকেই শেষ করে দিত, এই অপমান কোনো রাজপুত বীরের পক্ষে, কোনো পুরুষের পক্ষে এমনকি কোনো স্ত্রীর পক্ষেও সহ্য করা কঠিন। কোনরকম হত্যা কিংবা আত্মহনন মানুষকে জয় এনে দিতে পারে না। নির্ণয়ের আলোকে তাই এক পাল্লায় নপুংশকতা আর অন্য পাল্লায় পৌরুষ। অস্থির দাড়িপাল্লার কাটাও দোদুল্যমান, পৌরুষ না ক্লীবতা, সত্য না মিথ্যা এসব প্রশ্নের কোন উত্তর ঐ কাটা দিতে পারে না। নিজের কোমরবন্ধ আর কাটার সুমলের হাতে দেখেও মহেন্দ্র তাই ওর কথা বিশ্বাস করে না।

মহারাজ কিছু বলার আগেই সুমল বলে,—সে রাতে দিদির পাশে আমি শুয়েছিলাম, এই পোশাকই পরনে ছিল! আচ্ছা মহারাজ বিচার করুন, প্রথমত, নিজের মহল হলেও দরজা খোলা রেখে কোন নারী কি পুরুষের সঙ্গে শুতে পারে? দ্বিতীয়ত, দিদি ভালমতন জানত যে সে রাতে রাণা ওর কাছে আসবেন, সেক্ষেত্রে কি ওর পক্ষে অন্য কাউকে নিয়ে শোয়া সম্ভব? রাণার মনে সন্দেহ হলে তিনি তৎক্ষণাৎ দিদিকে জাগিয়ে বাস্তব জানতে পারতেন! পরদিন সকালে উঠে দেওয়ালে এই কোমরবন্ধ ও কাটার ঝুলতে দেখার পর থেকে দিদি ভীষণ কাঁদছে। কেঁদেই যাচ্ছে। ওর এই আকুল কান্না আমার সহ্য হয় না। শুধু বিলাপ করছে আর ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছে। আমি এখানে আসতে চাইলে ও রাজী হয়নি। অবশেষে মীরপুর যাওয়ার বাহানা করে এসেছি। আমার পুরুষ বেশের জন্যেই এত অনর্থ, তাই নিজেকে—

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই মহেন্দ্র গর্জে উঠে বলে,—এ সবই সেই ছলনাময়ীর ছল, ওর মুখদর্শন করতে চাই না আমি, এই বৃহন্নলাকে এখান থেকে যেতে বলুন মহারাজ।

হামীর সুমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নে কোনো বিচার করা রাজার পক্ষে কঠিন, সুমলের যুক্তিগুলিও একেবারে অকাট্য। রাজা ও সভাসদদের চুপ থাকতে দেখে সুমল শ্লেষাত্মক হেসে বলে,—ঠিক আছে মহারাজ, আমি রাণার অভিমত বুঝে গেছি, আমি যাচ্ছি। কিন্তু যাওয়ার আগেও জানিয়ে দিতে চাই, দিদির প্রতি অবিচার হয়েছে! সম্ভব হলে ওঁকে বোঝান—রাজপুত রমণী দ্বিতীয়বার কারো পাণিগ্রহণ করে না! বোঝান, আমার দিদি দুশ্চরিত্রা হলে তার মহলকে সাতপ্রস্থ জাদুজাল দিয়ে ঘিরে রাখত না! ভগ্নীপতিকে দেখার উৎসাহে সেরাতে আমি পুরুষবেশ খুলতে ভুলে গেছিলাম আর দিদির সঙ্গে বিছানায় গল্প করতে করতে কখন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল ছিল না!

রাণা মহেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—মহারাজ আমি এর কোনো কথা সহ্য করতে পারছি না, আমাকে সভাত্যাগের অনুমতি দিন!

মহারাজ কিছু বলার আগেই সুমল বলে,—না মহারাজ, এক সামান্য নারীর জন্য মহান মন্ত্রীমশাইকে রাজকক্ষ ত্যাগ করে যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি! তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, না জানি লোদ্রভা গিয়ে কী দেখব, না জানি দিদির কপালে কী আছে?

সুমল সভাকক্ষ ত্যাগ করে যায়। তারপর সেদিন কারোরই আর রাজকাজে মন বসে না। কোনো আলোচনাই মূর্ত রূপ নেয় না। রাজারও একই অবস্থা। তাই কিছুক্ষণ পরই এই মন খারাপ করা অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে রাণা মহেন্দ্রকে ডেকে অন্দরমহলে নিয়ে যায়। মহেন্দ্রকে আদর করে বসিয়ে রাজা ও রাণী ওকে ভালো মতন বোঝায়। রাণী বলে,—সুমলের যুক্তিগুলি আমার যথাযথ লেগেছে। সত্যিই কোন মহিলার পক্ষে দরজা খোলা রেখে পুরুষের সঙ্গে শোয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত মুমল জানত সে রাতে ওর স্বামী ওর কাছে যাবে, সেক্ষেত্রে অন্য কাউকে নিয়ে শোয়ার স্পর্ধা তার হবে না! তুই যদি কোমরবন্ধ ও কাটার ঝুলিয়ে না এসে তোর স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করতিস, তাহলে কী ভালোই না হতো!

দিদির কথা শুনে এতক্ষণ পর মহেন্দ্রর চোখের তারায় একটা নরম কোমলতা ফুটে ওঠে। এই কদিনেই ওর চোখের নীচে কালো কালো ছাপ পড়েছে। ইদানীং সবসময় সুরাপানে চুর হয়ে থাকে সে। এখনও কেমন থম মেরে বসে আছে। হামীর সুমরা এগিয়ে গিয়ে ওর পিঠে হাত রেখে বলে,—এখনও সময় আছে, এখনো তেমন কিছু বিগড়ায় নি বন্ধু, তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে লোদ্রভা যাও, আর মুমলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ওকে আবার গ্রহণ করো!

বন্ধু রাজার স্নিগ্ধ স্পর্শে প্রভাবিত মহেন্দ্র এবার আর্দ্র হয়ে ওঠে। ওর দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে রাণী বলে,—সুমলের কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে! সভাকক্ষে সবার সামনে তুই ওর দিদিকে গালি দিয়েছিস, ওকে অপমান করার কোনো মানে ছিল না!

রাণা মহেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার চেহারায় নানারকম পরিবর্তন হয়। দেখতে দেখতে মুহ্যমান মুখমণ্ডল নতুন আশায় আলোকিত হয়ে ওঠে। দুচোখের তারায় নতুন উদ্দীপনা ঝিকমিক করে ওঠে। দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে মহেন্দ্র। তাই দেখে হামীর সুমরাও আনন্দে বলে ওঠে,—ইয়ে হুই না বাত! তাহলে প্রস্তুত হও! এই কে আছিস যা, উটশালে সোঢ়ী সর্দারকে খবর দে—রাণা মহেন্দ্র লোদ্রভা যাবেন!

রাজার কথা শুনে পুরো রাজবাড়িতে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন পর শুক-সারি পরস্পরের মধ্যে খোশগল্প শুরু করে। এরা যে কোন দম্পতির বিরহে কষ্ট পায়, এরা যে কোন দম্পতির মিলনে আহ্লাদিত হয়। এরা যে ভালোবাসার প্রতীক!

নতুন উটনীর পিঠে চেপে রাণা মহেন্দ্র লোদ্রভার পথে চলতে চলতে চলতেচলতে শুকসারির প্রেমগানে ডুবে থেকে থেকে নিজের মনে জমে থাকা সন্দেহের জালগুলি

ছিঁড়তে ছিঁড়তে মরুপথে চলতে থাকে দুলতে দুলতে।

গাধাটিও পাশাপাশি চলতে থাকে নিরালম্ব সময়ের আবর্তে। রাজা-রাণীর আপ্তবাক্য ও শুকসারির প্রেমগান শুনে গাধাটি বলে ওঠে, ছশো বছর আগে একটা নিছক সন্দেহ থেকে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন আপনি মহেন্দ্র। ছশো বছর পর আমি জানালার কাঁচ দিয়ে অনেককিছু দেখেও—লিঙ্গপোকা বলে,—চুপ করো না লক্ষীটি, নিরালম্ব হয়েও এক অনিয়ন্ত্রিত পরিহাসে তোমাকে কম লেহন করছি আমি, তোমার পাশবগন্ধেই আবর্তিত হয়ে চলেছি কতকাল তবু তোমার দুঃখের কথা ভবিষ্যতে, অতীতে টানছো কেন এসব? চোখে দেখলেই কি সবকিছু সম্পূর্ণ দেখা হয়?

এসব কথা শুনে শুষ্ক বাতাস আর্দ্র হয়। পশ্চিম আকাশে মেঘের আয়তন বাড়ে। চাঁদ ঢাকা পড়ে গেলে মেঘের রঙ ঈষৎ লাল হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়। মহেন্দ্র দ্রুত উটচালনা করে। এখন সে প্রায় লোদ্রভার কাছাকাছি। আরাবল্লীর শৃঙ্গগুলি এখন দিগন্ত আড়াল করে বিশাল কালো দেওয়াল। আরাবল্লীর পাদদেশে অরণ্য এখন থমথমে জমাট অন্ধকার। উটনীটা অরণ্যে প্রবেশ করে। পাকদণ্ডী ঠাহর করে উটচালনা করে মহেন্দ্র। যে কোন কুজ্ঝটিকায় উট ও অশ্বচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর। কিন্তু তখন একা দোকা রাতজাগা পাখির ডাক ও ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির আলোর গা ছমছমে আবহে সতর্কভাবে এগোতে থাকে। একসময় কাকনদীর দেখা পেয়ে তাঁর জলস্রোতে পা ভিজিয়ে আরাবল্লী পার হয় মহেন্দ্র। আর তখনই একটা অদ্ভুত দর্শন গাধা দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে। মুমল কি নতুন কোন জাদুজাল বিছিয়েছে? সে গাধাটার দিকে পাথর ছুড়ে মারে। কিন্তু পাথরটা অশরীরী গাধার শরীর ভেদ করে কাকনদীতে গিয়ে পড়ে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় ঘন ঘন। আর দেখতে না দেখতে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। সে যে কী মুষলধার! সে কী প্রবল আকাশভাঙ্গা ঢল। বেলেমাটির দুর্বল গ্রন্থি নাড়িয়ে বড় বড় সব গাছ উল্টে পড়তে থাকে। বারবার পথ অবরুদ্ধ হয়। নানা গাছের ডালে আঘাত পেয়ে উটনী বারবার হোঁচট খেতে খেতে একসময় পা ভেঙে উল্টে পড়ে।

অগত্যা মহেন্দ্র আহত উটের পিঠ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগোতে থাকে। হাঁটুজলে ছপাৎ ছপাৎ এক আজব চলন। অথচ গাধাটাকে নির্বিকার চলতে দেখে সে গাধাটাকে কাবু করে ওর পিঠে চাপবে বলে এগোতে থাকে। কিন্তু এই গাধাটাকে শুধু দেখা যায়—ছোঁয়া যায় না বুঝতে পেরে ভবিতব্যের মতন নিয়তির মতন ওর পেছন পেছন চলতে থাকে। চলতে চলতে চলতে চলতে কাকমহলের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বিশাল বজ্রপাতে আকাশ দুভাগ হয়ে পড়ে। কাকমহলের উপর সেই বাজ পড়ে। কাকমহল চোখের সামনে ভেঙে পড়ে। মহেন্দ্র হাহাকার করে ওঠে। তখনই কোত্থেকে একটা প্রবল ঢেউ এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে মহেন্দ্র একটা ভাঙা ডানাও অবলম্বন করতে পারে না। হাজার হাঁকুপাকু করেও গাধা ওর অবলম্বন হতে পারে না! কাকনদী না পাগলদিয়া? কাকমহল এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে অমর প্রেমগাঁথার ঐতিহাসিক নায়ককে এভাবে ভেসে যেতে দেখে গাধাটি হাহাকার করে ওঠে। সে ভাবে,—আমি কেন ভাসছি না, আমি কেন ভিজছি না? অথচ মনে হচ্ছে আমার অস্তিত্বের একটা অতীতরূপই যেন ভেসে

যাচ্ছে অকূলপাথারে! গাধার লিঙ্গের চারপাশে নিয়তির মতন ভনভন করে উড়তে থাকা পতঙ্গ ভাবে,—কতকাল এভাবে অতীতে ঝুলে থাকব আমরা? নাকি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে যা ভাবি সবই ভুল—সবই ভ্রম, উপহার ও উপঢৌকন সর্বস্ব প্রেম-অপ্রেম কান্না হাসি সব ভুলভুলাইয়া অদৃষ্টের মায়াজাল!

তখনই অবাক হয়ে দেখে সে এমনি লিঙ্গ ঝুলিয়ে সারি সারি গাধারা পৃথিবীময় আর লক্ষ লক্ষ পতঙ্গের ভনভন ভনভন। অতীতহীন, ভবিষ্যতের কল্পনাহীন শুধু বর্তমানময় ভনভন। কীটপতঙ্গের পুঞ্জাক্ষি বর্তমানের বেশী আর কী ঠাহর করতে পারে!

সতেরো

ঐ নৈঃশব্দ, তোমার নাম আবৃত্তি করে
মূর্খতা ছাড়া আমার সঞ্চয় কিছু নেই
সাংকৃতিপুত্র, ঐ নৈঃশব্দ জাগাও, ঐ সূর্যগ্রন্থি
আকাশ পুড়ে গেলে কোথায় মাথা লুকোবো ?...

—সমরজিৎ সিংহ

তুমি কোথায় ?

এই নৈঃশব্দ যে আর সইতে পারছি না। মোবাইল ফোনটাও যে ঘরে রেখে গেছ। তুমি না বলতে প্রকৃত বন্ধু সেই হয়, যে তোমার সমস্ত দুর্বলতা জানার পরও ভালোবাসে! তুমি তো আমার স-ব দুর্বলতা, সমস্ত অসহায়তার কথা জেনে গেছ। তাহলে? বিশ্বাস করোনি নাকি কোনো অবিশ্বাস তোমাকে কুরে কুরে খায়? আমি জানি তুমি আছো। আমার মন বলছে। তোমার কিছু হলে আমার মন 'কু' বলবেনা? তবু আগামীকাল সকালে আমি পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হবো। ভাগ্যিস মাসিমা ও মেসোমশাই ফিরে এসেছেন। ওরাই বলেছেন আজকের রাতটা অপেক্ষা করতে। সারা বিকেল ধরে এমন কি সন্ধের পরেও মেসোমশাই কতজনকে ফোন করলেন। এটা কি বুঝতে পারছো না যে তুমি না ফিরলে ক্রমে সবার চোখে আমি দায়ী হয়ে পড়ছি। কেউ মুখে কিছু না বললেও প্রত্যেকের দৃষ্টিতে ঝুলে থাকছে প্রশ্ন। পুলিশের কাছে গিয়ে কী বলব? ওদের জেরার কী জবাব দেব ?

এত কষ্ট করে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ। সামান্য এল, ডি, সি থেকে নিজের পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়কে পাথেয় করে বছরের পর বছরের চেষ্টায় আজ তুমি একজন প্রতিষ্ঠিত কিউরেটর! জানি তুমি পৃথিবীর বিরলতম মানুষদের একজন—যে চাকরিকে ভীষণরকম ভালোবাসে, চাকরির পরিবেশ ও সমস্ত রকম উপাদানকে ভালোবাসে, আপাত স্থবির প্রাণহীন কিছু উপাদানই তোমার ভাবনা জগতে জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে।

দিনের অধিকাংশ সময় তুমি ইতিহাসে বাঁচো। ইতিহাস তোমার অস্তিত্বে সব সময় ছেয়ে থাকে। সে জন্যেই মেসোমশাই এসে যাওয়াতে আমার ভরসা বেড়েছে। মেসোমশাইকে নাকি তুমি-ই চিঠি লিখে আনিয়েছ। তিনিও যে ইতিহাসে র পূজারী।

আজ বিকেলে তিনি তোমার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন যা শুনে আমি অবাক। কই তুমি তো আমাকে এগুলি বলোনি ! তুমি যে রাজস্থান ছেড়ে আসতে চাওনি নেহাৎই মেশোমশাইর কথায় আর ডক্টরেট করার তাগিদে বাংলায় এসেছ তা জানতাম। কিন্তু তুমি যে আবার রাজস্থানে ফিরতে চাইছ, সেজন্য দরখাস্ত জমা দিয়েছ সেটা জানতাম না ! এতবড় একটা সিদ্ধান্ত আমাকে না জানিয়ে নিচ্ছিলে ? জানি না কেন সেই সময় মেসোমশাইর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ভীষণ অপমানিত বোধ করছিলাম। তুমি যে ক্রমে কত দূরে সরে যাচ্ছ তা টের পেয়ে ভীষণ অসহায় লাগে। আমি কি এতই খারাপ ? আমি কি কিছুই দিইনি তোমাকে ? তুমি তো বেইমান নও। তুমি যে ইতিহাসে বাঁচো। নাকি আমিও তোমার কাছে ইতিহাস ?

নাকি কারো প্রেমে পড়েছ? কই এমন কোনো আভাস তো টের পাইনি। কাল শেষরাতে হঠাৎ ঘুমের মধ্যে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। কারা যেন চারপাশ থেকে ঘিরে কণ্ঠরোধ করতে চাইছে, অথবা ধর্ষণ। বিয়ের আগে বহুবার এমন স্বপ্ন থেকে আর্তনাদ করে উঠতাম। আর যেদিন তুমি যোধপুরে রেললাইনের উপর শুয়ে পড়েছিলে, আমিও পেছন পেছন গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, আমার সমস্ত কনফেশনেও তুমি উঠছিলে না, আর তারপর শঙ্খর কথা বলায় কিছুক্ষণ কেমন গুম হয়ে থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলে। তখনই দূর থেকে আসা ট্রেনের আলো ও হুইসিলের শব্দে আমরা দুজনে হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। লাফিয়ে পাথরের ঢিবি পেরিয়ে বালির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগেই ট্রেনটা মৃত্যুবাজনা বাজিয়ে ঝমঝম ঝমঝম আমাদের পেছনে চলে যেতে থাকে অনন্ত কাল ধরে।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পরও সেই ঝমঝম বাজনা চলতে থাকে। চলতেই থাকত যদি না আমাদের সামনে তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই গাধাটা ট্যাঁচু-ট্যাঁ-চু... করে ডেকে উঠে ছড়ছড় করে পেচ্ছাব না করে দিত। আমাদের মুখে মাথায় পেচ্ছাবের ছিটা। বালিমাখা পেচ্ছাব। মুখ খোলাব উপায় নেই। পরিতোষ ভূতের মতন উঠে দাঁড়ায় ; আমি পেত্নী সহধর্মিণী। তুমি বাড়ির দিকে পা বাড়াও ; আমি প্রসন্ন অনুগামিনী। যাক বাবা না মরে বাড়ি ফিরছি। আমি যে মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পাই, বিশেষ করে প্রিয়জনের মৃত্যুকে। সেজন্যই ভয়ে তোমার পাশে রেললাইনে শুতে পেরেছিলাম। ঐ পাথরে আমার পিঠের নানা জায়গায় লেগেছে। পরে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হাঁটু ও কুনুই ছড়েছে, বুকেও ব্যথা পেয়েছি। আর কপালে ও মুখে গাধার পেচ্ছাবের উৎকট গন্ধ। বাড়ি ফিরে সেদিন দুজনেই স্টোভে জল গরম করে তাতে ডেটল ঢেলে স্নান করেছিলাম। তারপরও গন্ধটা লেগে ছিল অনেকক্ষণ। গাধা দেখলেই গন্ধটা টের পেতাম, অধৌত পেচ্ছাবখানার বাসি উৎকট গন্ধের মতন রি রি করা ভক। মুহূর্তে নাড়িভুঁড়ি উপড়ে সব কিছু বমি হয়ে বেরোনোর উপক্রম।

আর তুমি ? এরপর থেকে কেমন সন্ন্যাসী হয়ে পড়লে। পরদিন অফিস ছুটি থাকলে

যে মানুষ সারারাত ঘুমুতে চায় না, বিবিধ আসনে পেতে চায়, যে মহাআগ্রাসী অথচ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে মিলনকে দীর্ঘায়ত করে চেটে চেটে মধু খাবার মতন সুখে ডুবে থাকা ভালোবাসার আলস্যে, সংলগ্ন থেকেও মাঝেমধ্যেই নিস্তব্ধ, কখনো বুকে তুলে নিয়ে সুড়সুড়ি দিতে থাকে পিঠে ও কোমরে, ঝিম মেরে আকণ্ঠ পান করে সময়কে, পান করায় স্পর্শ সুখ ও আলিঙ্গন, শরীরের দোলকে ধ্রুপদী সংগীতের আলাপের মতন প্রলম্বিত আবার কখনো শ্বাসরুদ্ধকর গমনে ঝড় তুলে নিজেকে উজাড় করে দিতে চায় বারবার, সেই তুমি আর কোনো রাতে আমাকে ছুঁয়েও দেখলে না! অথচ সারাদিন তুমি কত স্বাভাবিক। কোনোরকম বিদ্বেষ কিংবা উষ্মাও প্রকাশ করোনি একটিবার! স্নেহময় পিতা ও একজন ইতিহাসে ডুবে থাকা মগ্ন গবেষক। আমি ভাবলাম কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই আমাকে কাছে টেনে নেবে, চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলবে, তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি শুধু আমার। সেজন্যেই তোমার বদলির ব্যাপারেও আমি এত উৎসাহ দেখালাম। ভাবলাম, হয়তো পরিবর্তিত পরিবেশে, বাংলার জল-মাটি হাওয়ায় তোমার সাহিত্যিক সত্তা আরো বিকশিত হবে। কলকাতা যেহেতু আজো বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র তোমার শিল্পের কদর করার মানুষও সেখানে বেশি পাবে, তুমি বৃহত্তর পাঠকের কাছে অনেক বেশি পরিচিত হবে।

হলও তাই। তুমি এখন বাংলার সুপরিচিত লেখক। সমস্ত প্রধান সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে তোমার লেখা কিংবা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এই মোবাইল ফোনের যুগেও নিয়মিত তোমার ডাকবাক্সে পাঠক ও সম্পাদকদের চিঠি আসে। রোজ রাতে ডিনারের পর একঘণ্টা তুমি শুধু চিঠির জবাব দাও আর তারপর যতক্ষণ ঘুম না আসে পত্রপত্রিকা পড়তে থাকো। হয়তো ঘুমের মধ্যেও সেসব লেখার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। সেসব নিয়েই স্বপ্ন দেখ। না হলে ভোর চারটেয় উঠে বাথরুম ও ব্যায়াম সেরে পাঁচটার মধ্যে তুমি লেখার টেবিলে কেমন করে বসো? ধন্য তোমার অধ্যবসায়।

কোথায় তুমি? তোমার তিন আলমারি বই, অজস্র পত্রপত্রিকা, লেখার টেবিল, প্রায় প্রতিদিন আসা চিঠিপত্র স-ব যে অধরা থেকে যাচ্ছে। লেখার টেবিলে ইতিমধ্যেই ধুলো পড়েছিল। আজ আমি পরিষ্কার করেছি। এসব ছেড়ে তুমি কেমন করে আছো?

গতকাল ভেবেছিলাম আগরতলা ও মরিয়ানীতে ফোন করব। কিন্তু পরপর দু জায়গা থেকেই তোমার মোবাইলে কল এসেছিল। আমি অ্যাটেন্ড করিনি। কেন না তুমি ফোন করলে তো ল্যান্ড ফোনেই রিং হত। আমি ভয়ে অ্যাটেন্ড করিনি। আগরতলার দিদির জীবনে এমনিতেই কষ্টের সীমা নেই। জামাইবাবুর অকালমৃত্যু মানুষটাকে অল্পবয়সেই প্রৌঢ়ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে, ব্লাডপ্রেশার, সুগার ... কেমন করে ঐ মহিলাকে বলব যে তাঁর আদরের ভাইটি আজ কতদিন হল নিরুদ্দেশ! আর শাশুড়িমায়ের ফোন ধরে এসব বলা মানে ওঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা।

আমি অভিমানে অ্যাটেন্ড করিনি। কেননা ওঁরা দুজনেই মোবাইল ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, শুধু তোমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ওঁরা

ল্যান্ড ফোনেও ফোন করতে পারতেন। মোবাইল ফোন অ্যাটেন্ড না করার পরও ওঁরা কেউ ল্যান্ড ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি ! তার মানে কী দাঁড়ায় ? আমাদের সঙ্গে কারো প্রয়োজন নেই। শঙ্খের সঙ্গেও তেমন প্রয়োজন নেই। আমরা দুজন সেকেন্ড কিংবা থার্ড পারসন মাত্র।

ক্ষমা করো, আমার এসব ভাবনা ভুলও হতে পারে। আজকাল কোনো কিছুই চূড়ান্ত বলে মনে করি না। যা যা ঠিক ভাবতাম অনেক কিছুই ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে আবার হয়তো ভুলটাই আলেয়ার মতো দুলতে দুলতে দুলতে দুলতে একসময় মাঝদরিয়ায় নৌকোয় ঝুলতে থাকা লণ্ঠনের মতো সত্যি হয়ে ভেসে এসেছে। কোনোদিন কি ভেবেছিলাম তুমি আমাদের ছেড়ে ... ...

আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। খুব কান্না পাচ্ছে। আর ভাবতে পারছি না।

অনেকক্ষণ কাঁদলাম। এখন কিছুটা হালকা লাগছে। এই কান্না ভীষণ জরুরি। মানুষ কাঁদতে না পারলে কেমন করে বাঁচত ? কান্না আমাদের অনেক গ্লানি ধুয়ে দেয়। প্রিয়জনকে কষ্ট দেওয়ার গ্লানি বহন করা কত দুর্বিষহ সে কেবল বহনকারীই জানে। আর তার থেকেও বেশি যন্ত্রণাদায়ক প্রিয়জনের উপেক্ষা ও নীরবতা। প্রিয় মানুষের শীতল চাহনির মতন অমোঘ অস্ত্র কি আর কিছু আছে ?

তুমি কোথায় ?

তাড়াতাড়ি চলে এসো। আর যে পারছি না। ভাবতেই কেমন লাগছে যে আগামীকাল তোমার নিরুদ্দেশের খবর পুলিশের খাতায় লেখাতে হতে পারে। তুমি চলে এসো। ভীষণ অসহায় লাগছে আজ। সত্যি সত্যি তোমার কিছু হয়ে থাকলে শঙ্খকে নিয়ে কোথায় যাব, কী করব আমি ? ও এখন আমার পাশেই ঘুমিয়ে আছে। বুকের কাছে তোমার ডাইরি। যে পাতাটা খোলা রয়েছে সেখানে তুমি লিখেছ—

> শরীর আমার সমুখ পানে ধায়,
> মন পিছনে তাকায়—সমুৎসুক ;
> কেতন যেন চলছে উজান বায়—
> পিছনে তার উড়ছে চীনাংশুক।

চীনাংশুক মানে কী ?

সংসদের অভিধানে এই কথাটার মানে খুঁজে পেলাম না। তাহলে কি এটা অনুবাদ ? অনুবাদ হলে সবকটা শব্দের মানে পাঠক বুঝবে না * ? অথচ পড়তে ভালো লাগে। কেমন যেন মনে হয়। আমার জীবনের মতন সত্য। নিজেকে যতই ব্যস্ত রাখি না কেন মন কিছুতেই অতীতকে ভুলতে পারে না। অবশ্য এখন এমন ভয়ংকর অতীত আমাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক মেয়ের জীবনকে যন্ত্রণাময় করে তুলেছে।

তুমি কোথায় ? গতকাল তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। ভয়ংকর স্বপ্ন। তোমার চুল

উশকোখুশকো, চোখ লাল, হাতে জলন্ত চ্যালাকাঠের মাথায় আগুন, সামনে টায়ারের চিতায় শোয়ানো হিতেন সরগিয়ারি জীবন্ত ছটফট করছে। মুখে কাপড় গোঁজা, হাত-পা পিছমোড়া করে একটা পাঞ্জাব লরির পরিত্যক্ত টায়ারের সঙ্গে বাঁধা। আমি আর বিদাংশ্রী খাম বাজাচ্ছি। চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সন্তু, অখরাও, বিরখাঙ ও কয়েকজন যুবক বন্দুক তাক করে আছে। আমি ভাবি ওখানে তুমি কী করছ? এ তো আমাদের প্রতিশোধ ! হরেন স্যারকে মারার ষড়যন্ত্র, মিলিটারি ডেকে উগ্রপন্থীদের শায়েস্তা করার চেষ্টা, আমাকে একা পেয়ে ... ; এত কিছুর বদলা নিচ্ছি আমরা। তোমাকে তো কিছুই জানাইনি। তাহলে তুমি কেন ? হঠাৎ দেখি তুমি ঐ চ্যালাকাঠটা হিতেনের চোখে গুঁজে দিয়েছ। আমি এই নৃশংসতা সহ্য করতে পারি না। তুমি এত নিষ্ঠুর পরিতোষ ? কঁকিয়ে উঠে ঘুম ভাঙে আমার। বুক ধড়ফড় করে। অথচ এতটা না হলেও সেদিন বালাবাড়ি শ্মশানে এই শয়তানটাকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারতে দেখে কী না তৃপ্তি পেয়েছিলাম। তাহলে কি সময়ের সঙ্গে আমার প্রতিহিংসা নিভে গেছে ? নাকি অস্তিত্বের শুদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে শুদ্ধতম পরিতোষকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে দেখে আমার অন্তস্থল থেকে এই কঁকানি ? আমার জীবনের সবরকম গ্লানি থেকে শঙ্খ ও তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখার, বুকে আগলে রাখার আকুতি !

তুমি না লেখক পরিতোষ ? কেমন লেখক ? তুমি আমাকেই বুঝলে না। নির্ঘাত বোঝনি। নাহলে এত সহজে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারতে না। আগামীকাল আমাকে থানায় যেতেই হবে। আগরতলা থেকে দিদির ফোন এলে কিংবা মরিয়ানি থেকে শাশুড়িমায়ের ফোন পেলে ওদের কী বলব ? থানায় কী বলব ? আমার বুক কাঁপে। তলপেট বারবার মোচড় দেয়। বারবার বাথরুম পায়। অস্তিত্বে খামের বোল আমাকে আর ঘুমোতে দেয় না। ছটফট করতে করতে ভোর হয়ে যায়।

আজ সারাদিন এমনি অস্বস্তিতে কেটেছে। টি. ভি মেকানিক ছেলেটি এসেছিল। ওকে বলি,—তুমি টি. ভি. টা নিয়ে যাও, আর কোনোদিন মুখ দেখাবে না।

সে অবাক। সে আমতা আমতা করে বলে,—আসলে ইলেকট্রনিক্সের জিনিস তো, খুবই ডেলিকেট !

আমি চোয়াল শক্ত করে বলি,—আমরা চাই না, তুমি তোমার ডেলিকেট জিনিস নিয়ে যাও।

সে বলে,—নিয়ে কী করব, এর কোনো বাজারদর নেই।

আমি রেগে বলি,—ফেলে দেবে, আমার এক পয়সাও চাই না।

ছেলেটি কাঁচুমাচু করে বলে,—আপনি শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছেন বৌদি। আমি এবার পুরোপুরি ঠিক করে ফিরিয়ে দিয়ে যাব !

সে একটা ভ্যান রিকশায় টি. ভি টা তুলে নিয়ে ছলছল চোখে চলে গেল। আমি একদমই পাত্তা দিলাম না। তুমি কে হে ছোঁড়া ? খুব মজা পেয়ে গেছ না ? অসহায়তার

সুযোগ নিচ্ছ ?

আমি এমনিতে আধুনিক কবিতা খুব একটা বুঝি না। আসলে চর্চা নেই বলেই হয়তো। তবু সৌমনা দাশগুপ্তর লেখা জলচিঠি কবিতাটি বারবার আমার মনে পড়ে। আসলে একটা পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে অলস চোখে পড়েছিলাম লাইনক'টি। তারপরই অবাক হয়ে বাক্যগুলি অনুভব করতে শুরু করি। কে এই কবি? তার বয়স কত ? কেমন করে লিখল সে আমার মনের কথা ?

দাঁড়িয়ে রয়েছি এক অকুণ্ঠ শিলায়।
ঘাই মারে জলচিঠি—
তরল বাখান
বাতাসে পর্দা খসে,
শিরা ও নিথর থেকে খুলে পড়ে
ঘুম—
জল চোষে
এক আশ্চর্য মাছপুরুষ।
স্রোতের আখরে ভাসে ঠোঁট,
মরুরং ঠোঁট

এই কবি মরুরং ঠোঁটের কল্পনা কেমনকরে করল ? অবাক লাগে। এই কবিকে জানতে ইচ্ছে করে। তুমি কোথায় পরিতোষ ?

আঠারো

চাঁদ গুঁড়ো হয়ে যায়/ভেঙ্গে যায় হীরের কুঁচি/ঈশ্বরীয় থালায়/টুপটাপ জল
আর আমি বুঁদ হয়ে/আর আমি ভিজে ভিজে/আর আমি শীত হয়ে/
কাঁদতে থাকি একা।/একা

— **সন্দীপ দত্ত**

হঠাৎ বুকে খোঁচা খেয়ে বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে অবাক পরিতোষ। সেদিন স্টেশানের পথে ওকে ডেকে পিওন চিঠিটা দিয়েছিল। লোকটা পয়লা বৈশাখ ও পুজোর সময় হাত পেতে মিষ্টি খাওয়ার টাকা পায় বলে পরিতোষকে বেশ খাতির করে। কিন্তু সেদিন মাথায় উপন্যাস ঘুরছিল বলে খামটা খুলে দেখেনি পরিতোষ। প্রেরকের ঠিকানাও দেখেনি। তাহলে এতদিন খামটা না খুলে থাকতে পারত না নিশ্চয়ই।

সম্পাদক মশাই বলেন,—উপন্যাসটা ভালোই হয়েছে; তবে যে লোক ঘরেই ফেরেনি, তার সঙ্গে কেমন করে ওর বউ রেললাইনে গলা দেয়? ঐ জায়গাটা তুমি ঠিক করে দিও!

পরিতোষ অবাক—এ উপন্যাস তো আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলাম,—আপনি কোথায় পেলেন?

সম্পাদক হা। তাহলে যে লেখাটা পরিতোষ ওকে পড়তে দিয়েছে সেটা কী? তিনি হেসে বলেন,—বুঝেছি, তুমি আজকাল বড় বেশী ড্রিংক করছো! সংযত হও লেখক, তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তোমার অ্যাতো পাঠক!

পরিতোষ গভীর চোখে তাকায়। আসলে ওর মধ্যে এখন কোনো নেশা কাজ করছে না। ওর মধ্যে রয়েছে একটা তন্ময়তা। আত্মউপলব্ধির একটা বিশেষ পর্যায়ে পরিতোষের ভাবনার জগতে একটা বিপ্লব এসে গেছে। নিজে যা বিশ্বাস করতো, যা ভাবতো, স-ব কিছু পাল্টে যাচ্ছে। সে ক্রমশঃ অনুভব করছে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন। আপাতভাবে মানুষ কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ব্যবহার করে কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে পারে, সামাজিক বিধিনিষেধ ও আইনকানুনের মাধ্যমে অনেক প্রবৃত্তির গতিরোধ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা আর মানুষের ভালো লাগা না লাগার জায়গাটায় মানুষ অসহায়। মানুষ একবার যাকে ভালবাসে তাকে আর ভুলতে পারে না। তাই বলে নতুন কাউকে ভালবাসতে পারবে না তেমন কথা নেই। আমাদের ভালোবাসা কোনো প্রকোষ্ঠবদ্ধ অনুভূতি নয়। আসলে পুরুষ কিম্বা নারী, কেউ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় না, হতে পারে না।

মানবসভ্যতার শুরুতে মেয়েরা ছিল প্রকৃতি প্রসারিত প্রাণ।

ক্রমশ পূর্ববর্তী সমস্ত বিশ্বাসের ছানা কেটে তৃতীয় বিশ্বের এক প্রত্যন্ত চা বাগানে বড় হয়ে ওঠা এক সাধারণ ছাপোষা নিম্নমধ্যবিত্ত পড়ুয়া মানুষের সন্তানের মূল্যবোধগুলির তেতো জল বেরিয়ে আসছে। আজ পরিতোষ সেই তেতো জল ভাসিয়ে দিতে চায়। এতে গঙ্গা তেমন প্রদূষিত হবে না। এমনিতেই গঙ্গার প্রদূষণের মাত্রা সীমার থেকেও প্রায় একশো পঁচিশ গুণ বেশী। গত দেড়শো বছরে অসংখ্য কলকারখানার নিষিক্ত বিষ যতটা মিশেছে ততটাই দ্রুত পরিবর্তনশীল কালের স্রোত বয়ে গেছে। পরিতোষ স্বগতোক্তির মতন বলে,—আসলে আপনি যেটা পেয়েছেন সেটা খসড়ার ফটোকপি! আসল লেখায় অন্য বিশ্বাসের কথা লিখবো এবার!

এবার সম্পাদক অবাক। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করেন,—কেন, এমন করলে কেন তুমি? অন্য বিশ্বাস আবার কি?

পরিতোষ মুচকি হেসে বলে,—ঘাবড়াবেন না, আপনার থেকে অ্যাডভান্স নিয়েছি বলে খসড়াটা জমা দিয়েছি। আসলটা দিন দশেকের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। প্রথম দিকের অধ্যায়গুলি টাইপ করতে দিতে পারেন, আমি একটা প্রুফ দেখে দেবো, তখনই যা করার সব ঠিক করে দেবো।

এসব কথার মাঝেই শ্যামনগর ঘাটে একটা নৌকা এসে দাঁড়ায়। যাত্রীরা হুড়মুড় করে নেমে আসে। হাত মিলিয়ে সম্পাদকমশাই ছুটতে ছুটতে গিয়ে নৌকায় ওঠেন। এই একটা অভ্যাস পরিতোষ এখনো রপ্ত করে উঠতে পারেনি; অকারণে ছোটা — অহেতুক ব্যস্ততা!

যেন সময় পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী এককোষী জীব থেকে অভিযোজিত হতে হতে বহুকোষী স্তন্যপায়ী মানুষ হতে অনেক কোটি বছর লেগে গেছে। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের জীবন যন্ত্রণা ওকে যেভাবে পরতে পরতে অভিযোজিত করছে পরিতোষ মাঝেমধ্যেই তা অনুভব করে চমকে চমকে ওঠে। মানুষ সব হারিয়ে, রিক্ত ও জীর্ণ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষ হয়ে যেতে পারে। যে কোনো মুহূর্তে মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে। আবার শেষের ঠিক আগের কিছু থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে পারে। শ্মশান ও চিতাকাঠের 'আয় আয়' ডাক উপেক্ষা করে সে ভাবতে পারে ..... "কেন যাবো? সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমু খাবো!"

হ্যাঁ সন্তান, পরিতোষ অনুভব করে, সৃষ্টির নিয়ম মেনেই মানুষ অমোঘ আকর্ষণে আত্মজকে চুমু খেতে চায়। সন্তানই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। যারা না বুঝে নিজের মা বাবাকে কষ্ট দেয় কিম্বা অনিচ্ছাসত্বেও তাদের কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে, পরবর্তী জীবনে বাবা-মা হওয়ার পর কেউ কেউ অনুভব করে কী ভুলটাই না করেছিলো!

সম্পাদকমশাই ছাড়া ভটভটি নৌকাটিতে মাত্র দশবারোজন যাত্রী। পরিতোষ বাঁধানো ঘাটে বসে। নদীর ওপারে তেলেনিপাড়া ঘাটের উপর আকাশ নেমে এসেছে। আকাশভরা কালো কালো মেঘের আয়োজন। এমন সময়ে কৈশোরের নাগাঝাংকার কথা মনে পড়ে। চা বাগানের লামার দিকে প্রায় পৌনে মাইল লম্বা বিশাল দিঘীর জলে সাঁতার কাটতো ওরা কজন। পরিতোষ সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতো। আগে শিখেছিলো ফ্রি স্টাইল ও ব্রেস্ট স্ট্রোক, তারপর শিখলো ডুব সাঁতার। দিদির কাছেই এসব শিখেছে পরিতোষ। দিদি সাঁতারে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলো। নানা প্রতিযোগীতায় দিদি বরাক ও ব্রহ্মপুত্রে অব্দি সাঁতার কেটে এসেছে।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পরিতোষ শিখলো জলের উপর শুয়ে থাকা। সেটা ভালমতন শেখার আগেই অবশ্য মরিয়ানী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিলো সুদূর রাজস্থান। তার আগে অবশ্য সে অনেকটাই শিখেছিলো। পাঁচ সাতমিনিট সময় জলের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে শুয়ে থাকতে পারতো সে শুধু হাতের চেটো সামান্য নাড়িয়ে। আরো অভ্যাস করলে আরো হতো। তবে সবচাইতে বেশী সাঁতার কেটে মজা পাওয়া যায় কালবৈশাখীর সময়। ঘন কালো মেঘের পিঠে চেপে আকাশটা কালদিঘীর উপর নেমে আসতো।

পরিতোষ ও দিদি কোনোদিন বৃষ্টিতে ঘরে বসে থাকেনি। ভাইবোন দুজনেই একটু হলেও বৃষ্টি ভিজতো। কিন্তু ক্লাশ টেনে পড়ার সময় দিদির বিয়ে হয় ত্রিপুরায়। জামাইবাবু সেখানে সরকারী সিনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক। দিদি ত্রিপুরায় চলে যাওয়ার পর থেকে পরিতোষের খুব মনখারাপ থাকতো। দিদির কথা মনে পড়তো। বিশেষ করে বর্ষায় অথবা কালবৈশাখীর সময়। আকাশ কালো করে ঝড়বৃষ্টি নামার আগেই সে গিয়ে দিঘিতে ঝাপিয়ে পড়তো। আর যতক্ষণ না প্রকৃতির তাণ্ডব চলতো ততক্ষণ জলে থাকতো। দিঘির

শান্ত জল প্রকৃতির ডাকে কেমন দুলে দুলে উঠতো, মনে হতো দিঘিটা কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এমনি এক বর্ষায় চোখের সামনে বাজ পড়তে দেখে সে। আহারে, নরম পদ্মফুলগুলি বুঝি ঝলসে গেল! সে সাঁতার কেটে পদ্মবনের কাছে গিয়ে অবাক। একটা পদ্মফুল কিম্বা পদ্মপাতারও কিচ্ছু হয়নি। কিন্তু এরপর আর কোনোদিন পদ্মবনে যায়নি পরিতোষ। সেদিন পদ্মবনের কাছে যাওয়ায় ওর গায়ে জোঁক লেগেছিলো। কালদিঘীর বাবুঘাটে এমনি কোনো জোঁক ছিলো না। কুলিকামিনরা সবসময় ঘাটের চারপাশের ঝোপঝাড় কেটে কচুরিপানা পরিষ্কার করে রাখতো। অথচ আধমাইল দূরে কুলিঘাটেই প্রচুর জোঁক। সেখানে কেউ বেশীক্ষণ জলে থাকতো না। বাবুঘাট আর কুলিঘাটের মাঝে প্রায় সিকিমাইল এলাকা জুড়ে বিশাল পদ্মবন। সেখানে প্রচুর ঢোঁড়াসাপ আছে জানতো। কিন্তু জোঁক থাকার ব্যাপারটা টের পেলো বাজপড়া বিকেলে।

গঙ্গায় কোথাও জোঁক নেই। কিন্তু এখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছে জাগছে না। আকাশে তেমনি ঘনঘটা। তবে এই ঘনঘটার ডাকে গঙ্গা তেমন সাড়া দেয় না। তিনি নিয়ত প্রবহা। গঙ্গার শরীরে জোয়ার ভাঁটার নৈমিত্তিক প্রাণ রয়েছে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় সেই প্রাণের টান উত্তাল হয়। জোয়ারের জল বড় বড় ঢেউ বয়ে আনে। উত্তরপূর্ব ভারতের যে কোনো মানুষের কাছে এই জোয়ারভাটার আকর্ষণ অপরিসীম। উত্তরপূর্ব ভারতের কোনো নদীতে জোয়ার আসে না। সেজন্যেই গঙ্গা আলাদা। সেজন্যেই অতুলনীয়া। অবশ্য কালবৈশাখীকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা গঙ্গার নেই। মাঝগঙ্গায় কোনো নৌকা না থাকায় একটা কালো রঙের শুশুক থেকে থেকেই জলের উপর অনেকটা লাফিয়ে উঠছে। নৌকোটা ছেড়ে দিলে সম্পাদকমশাই হাত নেড়ে কিছু বলে। পরিতোষ বুঝতে পারে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। তার মনও আজ গঙ্গার মতন প্রবহা অথচ কালবৈশাখীর দাপটে চঞ্চল।

ঝড় শুরু হলে পরিতোষ গিয়ে শেডের নিচে দাঁড়ায়। শেডের ঢেউটিন ঝড়ের দাপটে পটপট শব্দ করে। এহেন দুর্যোগ ওর মনে উত্তাল ঢেউ তোলে। মুমলের কাছে কয়েকরাত কাটিয়ে আসার জন্যে ওর মনে কোনো আফসোস নেই। যখনই ইচ্ছে হয় আবার চলে যাবে। মুমলের কাছে গিয়ে লাভ হয়েছে অনেক। নিজের জীবনের অসুখ ও অপ্রাপ্তির কিছুটা প্রশমন! তেমনি অনেক ক্ষোভ ও অভিমানের তীব্রতা হারিয়ে ঝড়ের পাখিটা এখন কি বাসায় ফিরবে? কি জানি কী করছে ছেলেটি এখন! বাবাকে এতদিন না দেখে কেমন আছে ও?

যেতে পারছে না। শেডের নিচে ঝড়বাহিত নদী-জলের গুঁড়ো, নদীপাড়ের মাটি ও ঝরাপাতা, ক্ষিপ্ত আকাশ ও সে গাঁথা হয়ে আছে। এই অনুভব আঁধারের টিপের মতন জ্বলজ্বল করে অথচ দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। কিভাবে পায়ের চাপে মাঝখানে ক্ষয়ে গেছে সিঁড়ি, যারা রোজ ওঠে নামে তারা এই ক্ষয়কে পাথরের জীবন সত্য ভাবে, আর খুশি হয় পায়ের দিব্যভূমিকায়।

পরিতোষ খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে। জয়ের লেখা চিঠি। আনন্দনগর থেকে লিখেছে। পরিতোষের একমাত্র ভাগ্নে এই জয়। আগরতলার উপকণ্ঠে আনন্দনগরে জন্ম বলে জামাইবাবু ছেলের নাম রেখেছিলেন আনন্দ। ডাকনাম জয়। কিন্তু জয় কোনোদিন ওর বাবাকে দেখেনি। ওর জন্মের কদিন পরই মান্দাইয়ের গণহত্যায় শেষ হয়ে গেছিলেন হাসিখুশি মানুষটি। তিনি আনন্দনগর থেকে মান্দাই ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতেন। সেদিন রাতে কী কারণে তিনি ব্যাচেলার শিক্ষকদের মেসে থেকে যান। দুজন বাঙালি ও একজন আদিবাসী শিক্ষক থাকতেন ঐ মেসে। বিজয় রাংখলের নেতৃত্বে উগ্রপন্থী আততায়ীরা সেদিন মান্দাই বাজার সংলগ্ন ঐ মেসবাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণীকেই ঘুমের মধ্যে কচুকাটা করে ওদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো।

খবর পেয়ে বাবা ও পরিতোষ আগরতলায় ছুটে গেছিলো। কিন্তু দিদিকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আনন্দনগরের ঐ বাড়ি জামাইবাবুর বাবার করা। জামাইবাবুর ছোটভাইবোনেরা তখনও কেউ স্কুলের গন্ডি পেরোয়নি। সরকার থেকে দিদিকে জামাইবাবুর চাকরিটা দিলে দিদি আর বিধবা শাশুড়ি ও ছোট দেওর-ননদদেরকে ছেড়ে আসেনি। দিদির কথা ভাবলেই বুকটা হু হু করে। ওর থেকে মাত্র দুবছরের বড়। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ইতিমধ্যেই কেমন বুড়িয়ে গেছে। দিদি এখন যোগেন্দ্রনগর স্কুলের শিক্ষিকা। ভাগ্নে এবার মাধ্যমিক পাশ করেছে। পরিতোষকে মাঝেমধ্যেই বড় বড় চিঠি লেখে। পরিতোষও সমান উৎসাহে জবাব দেয়। আজকাল তো ফোন ও মোবাইলের দৌরাত্ম্যে মানুষ চিঠি লেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু জয় অন্যরকম। ওর চিঠিগুলি স্বপ্নমাখা। ওর ঠাকুমা, কাকা-পিসী ও মা ওকে কখনো বাবার অভাব বুঝতে দেয়নি। সেজন্যেই হয়তো এই অনুর্বর সময়েও সে স্বপ্ন দেখতে পারে।

এই চিঠিতে সে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সফর ও ২০০৭ সালের মধ্যে আগরতলায় রেলগাড়ি পৌঁছানোর ঘোষণার কথা লিখেছে। পরিতোষের মনে পড়ে যায় ক্লাশ নাইনের ইংরেজি পাঠ্যবইয়ে পড়া 'হোয়াইট নাইন' নামে একটি মজার কবিতা। সেই কবিতায় এক ইংরেজ ভদ্রলোক প্রায়ই একটা না একটা উদ্ভট কান্ড করতেন। তারপর গর্ব করে বলতেন—এটা আমার নিজের আবিষ্কার!

সেই ভদ্রলোকের একটা ঘোড়া ছিল। একবার তিনি তাঁর ঘোড়ার পেটে একটা কাঠের বাক্স বেঁধে দেন। পথে বেরুতেই একজন জিজ্ঞেস করে,

—ও মশাই, আপনার ঘোড়ার পেটে ওটা কী ঝুলছে?

লোকটা হেসে বলে,—মৌমাছির বাসা!

কিছুদূর যেতেই আরেকজন প্রশ্ন করে,—ও মশাই, ঘোড়ার পেটে ওটা কী বেঁধেছেন?

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঝাকিয়ে বলে,—ইঁদুরের কল।

এমনি পথে যেতে যেতে আর যতজন ওঁকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কাউকে 'ইঁদুরের কল' আবার অন্য কাউকে 'মৌমাছির বাসা' বলেন। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই এলাকার

মানুষদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কেউ বলেন,—ওটা ইঁদুরের কল!

সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন প্রতিবাদ করে বলেন,—'না, ওটা মৌমাছির বাসা, ভদ্রলোক নিজে আমাকে বলেছেন!

তৃতীয়জন চেঁচিয়ে বলে ওঠেন,—কেন কিছু না জেনে মিথ্যে কথা বলছেন মশাই, উনি নিজে আমাকে বলেছেন ওটা ইঁদুরের কল!

এমনি ঝগড়ার মধ্যে একজন সেই ঘোড়সওয়ার মানুষটিকে আসতে দেখে বলেন,—ওই তো ভদ্রলোক আসছেন, চলো সবাই মিলে ওকে প্রশ্ন করে জানি কে মিথ্যে কথা বলছে!

ততক্ষণে ভদ্রলোক বাজারে ঢুকতেই সবাই ওকে ঘিরে ধরে। ভদ্রলোক ভীড় দেখে ঘোড়া থেকে নামতেই চারিদিক থেকে সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করে। লোকটা কোনো জবাব না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকেন। তখন একজন জিজ্ঞেস করেন,—আপনার মৌমাছির বাসায় মৌমাছি আসে?

আর একজন প্রশ্ন করেন,—আপনার কলে ইঁদুর পড়ে?

ভদ্রলোক দুহাত তুলে হেসে বলেন,—না না, মৌমাছিরা ইঁদুরের ভয়ে আসে না। ইঁদুরেরাও মৌমাছির ভয়ে আসতে পারে না! এটা আমার নিজস্ব আবিষ্কার।

তারপর তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই হাততালি দিয়ে হাসতে থাকেন।

দিদির বৌভাতের পর মরিয়ানি ফেরার সময় উত্তর ত্রিপুরার কোনো এক জায়গায় (এই মুহূর্তে জায়গাটার নাম মনে পড়ছে না, সেখান থেকে বেরিয়ে পথে ওরা বুনো হাতির দলকে জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে যেতে দেখেছে) ভাত খাওয়ার পর ওরা একটা জনসভায় জুনু দাস নামক একজন কমরেডকে ত্রিপুরার রেল আসা নিয়ে বক্তব্যের মাঝে এই গল্পটার উল্লেখ করতে শুনেছিলো। গল্পটি বলে তিনি কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে কটাক্ষ করে বলেছিলেন,—এই কংগ্রেস রাজত্বে ত্রিপুরায় শিল্পের অভাবে রেল আসে না, আর রেলের অভাবে শিল্প আসে না। ত্রিপুরাকে বঞ্চিত রাখার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার দারুণ বুদ্ধি আবিষ্কার করেছেন। জনসভায় উপস্থিত সমস্ত শ্রোতা এই উপমা শুনে হাততালি দিয়ে ওঠে। মঞ্চে বসে কমিউনিস্ট নেতা নৃপেন চক্রবর্তীও টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানান। মিটিং ভাঙার পর স্থানীয় মানুষই ঐ গল্পের কথা বলতে বলতে বাড়ি ফেরে। পরিতোষের বাবা সেদিন বাসের সহযাত্রীদের সঙ্গে উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রতি দিল্লীর এই বঞ্চনা নিয়ে কথা বলছিলেন। পরিতোষ বিশ্বাস করে দিল্লী যদি উত্তরপূর্বাঞ্চলকে এই অবহেলা না করতো, যথাসময়ে সুপরিকল্পিত শিল্পের প্রসার ও প্রান্তিক অরণ্য প্রদেশগুলিতে রেললাইন সম্প্রসারণ করতে পারতো তাহলে গত কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে এই রাজ্যগুলিতে যে তীব্র বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রপন্থার বিস্তার লাভ করেছে; এই দুর্দিন ভারতবাসীকে দেখতে হতো না।

সেই নির্বাচনেই সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছিল।

আরো বছরখানেক পর ত্রিপুরার প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রী হন সেই নৃপেনবাবু। আর কোনোদিন নৃপেনবাবুকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ হয়নি পরিতোষের। কিন্তু ত্রিপুরার রেলপথ সম্প্রসারণের প্রসঙ্গ এলেই জুনু দাস ও নৃপেনবাবুর কথা মনে পড়ে যায়।

সেবার বাসে পরিতোষের পাশে এক বৃদ্ধের সীট পড়েছিল। আর সামনের সীটে সেই বৃদ্ধের মেয়েজামাই ও নাতি বসেছিলো। বাচ্চাটার উৎপাতে বিরক্ত হয়ে একসময় ওর মা বলে,—যা দাদুর কাছে যা, দাদু তো অনেক গল্প জানে! বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে দাদুর কাছে চলে এসে ওদের দুজনের মাঝখানে বসে বলে,—দাদু বলো, আমি ছুনবো।

বৃদ্ধ বলে,—কী বলবো?

—লাজার গল্প!

—ঠিক আছে, একদেশে এক রাজা ছিলো, রাজা খালি ঘুমায়।

—ছুধু ঘুমায়? ভাতু খায় না? হাগু করে না?

বৃদ্ধ হেসে বলেন,—খায়, হাগু করে আর ঘুমায়। সারাদিন ঘুমায়। সেই দেশে বাস আছে, জীপ আছে, রিক্সা আছে, নৌকা আছে, কিন্তু রেলগাড়ি নাই!

—লেল গালি কী দাদু?

—রেলগাড়ি একটা বড় লম্বা গাড়ি। অনেক মানুষ চড়তে পারে। অনেকগুলো চাকা। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে।

—বাবার মতন?

—না না, তোমার বাবার মতন হবে কেন? তোমার বাবা কি ধোঁয়া ছাড়ে?

—হ্যাঁ, ছালে তো, বাবা যখন ছিকারেট খায়! লেল গালি কি ছিকারেট খায়?

বৃদ্ধ অপ্রস্তুত হয়ে বলে,—নানা, রেলগাড়ি সিগারেট খায় না, কিন্তু এত কথা বললে আমি আর গল্প বলতে পারবো না, আমি ঘুমাব!

—আচ্ছা তুমি বলো, আমি আর কথা বলবো না!

বৃদ্ধ অস্বস্তি কাটাতে আবার গল্প শুরু করে,—দেশের মানুষ রাজাকে বললো, আমরা রেলগাড়ি চাই, আমাদের দেশে রেললাইন পাততে হবে! কিন্তু রাজাটা দুষ্টু। রেললাইন আর পাতায় না। তখন দেশের মানুষ আন্দোলন শুরু করে।

—আনোলন কী দাদু?

—আনোলন নয় আন্দোলন! মানে কোনো কিছু করানো বা পাওয়ার জন্য লড়াই। অনেক মানুষ একসঙ্গে রাজবাড়ির সামনে হাজির হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে,—আমরা রেললাইন চাই, আমরা রাজ্যে রেলগাড়ি চাই! আমাদের রেল এনে দিতে হবে!

—তালপল?

—তুমি ঘুমোও, তারপরও আন্দোলন চলতে থাকে। ওরা জেদী। যতদিন ওরা রেলগাড়ি না পাবে—এই আন্দোলন চলতে থাকবে।

—তালপল? ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করে নাতি।

—আন্দোলন চলছে আর চলছে। আগে রেলগাড়ি আসুক। তারপর কী হয়েছে বলবো!

তারপর আরো ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে। সেই বৃদ্ধ এখনও গল্পটি শেষ করার জন্যে বেঁচে আছেন কিনা কে জানে! কিন্তু তাঁর নাতি এখন নিশ্চয়ই বছর ত্রিশেকের যুবক। সে নিশ্চয়ই এই খবর জেনে খুশি হবে! প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন — এ কথা নড়চড় হবে না। তাই এবার নিশ্চয়ই আগরতলায় রেলগাড়ি পৌঁছুবে! সেই বৃদ্ধের নাতি তার ছেলে মেয়েকে সেই অসমাপ্ত গল্পটি শোনাতে পারবে নিজের মতন করে।

জয়ের চিঠিতে অকালবৃষ্টির কথা লেখা আছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের জেরে গত তিনদিন ধরে সমস্ত পূর্বভারত ও বাংলাদেশের মতন ত্রিপুরাতেও লাগাতার অকালবর্ষণ চলছে। রবিবার ভোর থেকে গোটাদিনের অবিরাম বর্ষণে রাজধানী আগরতলার নিম্নাঞ্চলগুলি জলমগ্ন। তবে আনন্দনগর টিলার উপরে বলে সেখানে কিছু হয়নি। আর আশার কথা এই যে ওদের আমন ধানে এবার যে লেদা পোকার আক্রমণ হয়েছিলো বৃষ্টিতে সেগুলি ধুয়ে গেছে। তবে ফুলকপি, বাঁধাকপির ক্ষেতের গোড়ায় জল জমে আছে। এতে পচন ধরার সম্ভাবনা রয়েছে।

জয় এখন এগ্রি বি. এস. সি পড়ছে। ওর ইচ্ছে ভবিষ্যতে কৃষিবিজ্ঞানী হবে।

এই চিঠি পড়ে পরিতোষের খুব ভাল লাগে। জয়ের চেহারা চোখে ভাসে। কতদিন দেখেনি ওকে! শেষ যেবার পরিতোষ আগরতলা গেছিল জয় তখন শঙ্খর বয়সী। দেখতেও শঙ্খের মতনই দোহারা। অথবা জয়ের মতনই দেখতে হয়েছে শঙ্খ। দুটি ভিনরাজ্যের আলাদা পরিবারে জন্ম হয়েও মামাতো পিসতুতো দুই ভাই-এর চেহারায় নিজেদের বাবার চেহারার আদল খুঁজে পায় দিদি ও পরিতোষ। সেই উন্নত কপাল; গভীর মমতামাখানো টানাটানা চোখদুটি আর থুতুনিতে গভীর ভাজ। পরিতোষের চেহারা বরঞ্চ একটু অন্যরকম।

সন্ধ্যে হলেও বৃষ্টি থামছে না দেখে একজন একজন করে শেডের নিচ থেকে বেরিয়ে বৃষ্টি ভিজতে ভিজতেই বাড়ি চলে যায়। কিন্তু পরিতোষ যায় না। টিনের শেডে প্রবল ধারাপাতের শব্দ ওর খুব ভাল লাগে। তার সঙ্গে বৃষ্টির কণাগুলি বাতাসে ভাসতে ভাসতে মুখে হাতে লাগে। এই আর্দ্র বাতাস এক অদ্ভুৎ আঁশটে গন্ধ বয়ে আনে। এই গন্ধ একেকসময় একেকরকম। সে চোখ বন্ধ করে ডুবে থাকে ঘ্রাণে। কিন্তু আঁশটে গন্ধে খিদে পেয়ে যায়। পরিতোষ কোনোদিনই খিদে সহ্য করতে পারে না। সেই কোন্ দুপুরে শোভাবাজারের সেই রেস্টুরেন্টে ভাত খেয়েছে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সারি সারি দোকান, ছোট্ট অপ্রশস্ত পার্ক, যার অর্ধেকটা ডাস্টবিন হয়ে উঠেছে, পথের দুপাশে ভিখিরি, ফেরিঅলা, গলির মোড়ে মোড়ে আড্ডাবাজ ফড়ে ও দালাল। ওদের কেউ জুতো পালিশ করে, ফুটপাতের শস্তা ঘুগনি, অমলেট, এগরোল ও চাউমিন খায় আর পথচারীদের দিকে

তীব্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকিয়ে কাস্টমার খোঁজে, লো কাট ব্লাউজ, রঙ করা নাভি কিংবা মিনি স্কার্ট পরা মেয়েদের সিটি মারে, শরীর দেখে, শস্তা মেকআপ করা মেয়েরা বাজারে নেমেছে, কেউ অর্ধউলঙ্গ, কেউ বা একটু ভদ্র জিনস্ ও টি শার্ট পরেছে, এই ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ জিগালো বা পুরুষ যৌনকর্মী, এদের চাহনি আরো তীক্ষ্ণ। এসব পেরিয়ে পুরো অঞ্চলটার সঙ্গে বেমানান ঝা চকচকে পাতাল রেল স্টেশানে ঢোকার পথ যমের দখিন দুয়ার। উত্তর কলকাতায় এই শোভাবাজার আর বেলগাছিয়াতেই বেশিরভাগ পাতালরেলে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণে এরকম হয় কালীঘাট ও রবীন্দ্রসরোবর স্টেশানে। কেন এরকম হয় সেটা কি কেউ ভেবে দেখেছে? শুধু এই প্রশ্নের জবাব বের করতে পারলেই এ শহরের তথা তৃতীয় বিশ্বের সবচাইতে গভীরতম অসুখটি ধরা পড়ে যাবে।

এই পথের অন্যপ্রান্তে বাগবাজার। কসমোপলিটান মহানগরীর ত্বক যদি হয় গঙ্গার তীর তাহলে তার শরীরে খোস পাছড়া দাদ ও হাজার মাঝে এক জায়গায় শুধু মিলেনিয়াম পার্কের ঝকঝকে জামা। অবশ্য ঘাটগুলি শতাব্দীপ্রাচীন বিলাসী মানুষজনের স্মৃতিবহ ; অধুনা দুঃখ-বিলাসিতা। একে কি নগর বলা যায়? মানসিকতা ও দৈন্য পাল্টায়নি ; চারিদিকে শুধু হতাশার ছায়া। এমনটা ভাবলে চোখের সামনে খুলে যেতে থাকে একের পর এক জঞ্জালের নরক। নদীর বুকে বেশ কিছু ট্রলার, নৌকা ও স্টীমারের স্রোত। জলের উপর তেলের আস্তরণ আর অসংখ্য ভাসমান প্লাস্টিক। রোদে সেই তেল ও প্লাস্টিক সাতরঙ ছড়ায়, কী বীভৎস সৌন্দর্য! নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক বেকার হাড়হাভাতে লোকজন, যে কোনওভাবে যে কোনো পথে পয়সা খুঁটে নেবে। দুজন চুলদাড়িঅলা সম্ভবত ড্রাগের নেশায় বুঁদ হয়ে মহানন্দে জড়াজড়ি করে মৃতের মতন শুয়ে আছে অর্ধউলঙ্গ। ওদের চোখেমুখে সারা শরীরে অসংখ্য মাছি ভনভন করছে। এসব থেকে তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ পেতেই সে হাওড়াগামী প্রথম লঞ্চে চেপে বসে।

অবশ্য হাওড়াও একটা দমবন্ধ করা স্টেশান। ভরদুপুরেও ভীড়ে ঠাসা। টিকিটের লাইনে সে কম করে পঞ্চাশজনের পেছনে দাঁড়ায়। কোথাকার টিকিট কাটবে? কী মনে হওয়ায় সে নিজের সমস্ত পকেট হাতড়াতে থাকে। কিছু দুটাকা একটাকার মুদ্রা রয়েছে। গুণে দেখে সব মিলিয়ে মানকুণ্ডু অবদি যাওয়ার ভাড়া হয়ে যাবে।

মানকুণ্ডু স্টেশান থেকে পায়ে হেঁটে তেলেনিপাড়া ঘাট অনেকটা পথ। কিন্তু আজ হাটা ছাড়া কোনো উপায় নেই। হাটতে হাটতে ভাবছিলো, পরিচিত কাউকে পেলে হয়। এই এলাকাতেই থাকেন গল্পমেলার বেশ কয়েকজন বন্ধু ও আপনজন। কিন্তু এখন নিতান্তই বাধ্য না হলে সে কারো বাড়ি যাবে না। তেলেনিপাড়ার মোড়েই দেখা হয়ে যায় সম্পাদকমশাইর সঙ্গে। তিনি নিজে থেকেই ওরও টিকিট কেটে নেওয়ায় নিজের পকেটের কথা কাউকে বলতে হয়নি। শুধু সম্পাদকমশাইয়ের সঙ্গে পিনকলের একটা ক্লাবে অনুষ্ঠানে গিয়ে বসতে হয়। সেখানে গান হয়। কবিতাপাঠ হয়। ঘরে বসে থাকা অনেকেই ওকে চেনে। কিন্তু কেউই ওর দিকে কোনো বিশেষ দৃষ্টিতে তাকায় না। মনে মনে একরকম আশ্বস্ত হয় পরিতোষ। আবার একটা চাপা অভিমানও উঁকিঝুকি মারে। মানুষ

এত ব্যস্ত, এতই উদাসীন যে পরিচিত এক লেখকের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার খবরও কেউ রাখে না! অবশ্য খবরটা বাজারে চাউর না হলে লোকে জানবেই বা কী করে? কেমন ক্লান্ত লাগে। নিজের কশেরুকা যেন সেই ঘাটের সিঁড়িগুলির মতন ক্ষয়ে গেছে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দুঃখ রাগ লজ্জা আর ঠায় দাঁড়াবার অপমান—

অনুষ্ঠান শেষে সম্পাদকমশাই বলেন—ঘাট অবদি চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

পরিতোষ মনে মনে ভাবে,—ঠিক আছে, কোনো অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কিছু টাকা চেয়ে নেব!

কিন্তু কথায় কথায় সম্পাদক নৌকোয় উঠে গেলেন। টাকা চাওয়া হলো না। অবশ্য এ সময়ে টাকা দিয়েও খাবার পাওয়ার কোনো জায়গা নেই এই মফস্বল শহরে। কেমন ক্লান্ত লাগে।

হঠাৎ মেঘ কেটে চাঁদ ওঠে। নিমেষে জ্যোৎস্নায় চারপাশ মায়াবী হয়ে ওঠে। আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা ছোট এক টুকরো নিচু মেঘ ছাড়া কিছু নেই। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে চাঁদের গুড়ো ভেসে আসছে গায়ে। ভেসে আসছে হীরের কুঁচি। শেডের পাশেই বটগাছের নীচে তৈরি আরেকটা শেডের নিচে বিভিন্ন দেবদেবীর যৌথ মন্দির। এই সময়ে দেবদেবী ছাড়া আর কেউ যৌথ পরিবারে থাকে না। একটি স্টিলের থালায় কিছু খুচরো পয়সা। তার উপর টুপটাপ জল পড়ছে। ধীরে শরীর থেকে সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে পরিতোষ পথে নেমে পড়ে। জ্যোৎস্নায় বুঁদ হয়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভিজে পথ চলতে থাকে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কেমন শীত শীত করছে। অসীম জ্যোৎস্নায় চাঁদের গুড়ো ও নদীর বুকে ঝুলে থাকা মেঘের টুকরোটা ভালবাসার চাদর হয়ে উঠতে চায়। অথচ সে রিক্ত, অথচ সে দীনের থেকেও দীন, অথচ সে জীর্ণ ও বিদীর্ণ। না জানি কেন হু হু করে কান্না পেয়ে যায়। আকুল কান্না। সে কাঁদতে কাঁদতে পথ চলে একা। একা একা একা ... শেষ কবে কেঁদেছে এরকম? অনেক বছর আগে নাগাঝাংকার পুকুরঘাটে দিদির বিয়ের পর। দিদি ত্রিপুরা চলে গেলে এমনি আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলো সে। কিন্তু তারপর থেকে কোন দুঃখে কাঁদেনি ও। পুরুষমানুষকে কাঁদতে নেই। কিন্তু আজ ... ?

নানা জায়গায় পথ গোড়ালি অবদি জলে ডুবে আছে। মাঝে মাঝেই উঁচু উঁচু গাছের নিচে চাঁদের আলো পৌঁছোয় না। বাল্ব খারাপ থাকলে অন্ধকারে দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে থাকা এত বড় বড় ল্যাম্পপোস্টেরও কোনোই মূল্য নেই। দেখাই যায় না ঐ প্রস্তরস্তম্ভগুলিকে। বেশ মনোযোগ দিয়ে চলতে হয়। কোথাও এমনি আবার কোথাও সন্তর্পণে ছপছপ করে চলতে চলতে একসময় কান্না থেমে যায়। শঙ্খকে কাছে পাওয়ার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে।

অবশেষে নৈহাটী ব্যারাকপুর রোডে উঠে সে বুক ভরে শ্বাস নেয়। রাতের ভেজা বাতাস।

যোধপুরে কখনো মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে ভোরের গন্ধ

পেত সে। ঝিরিঝিরি বাবলা পাতার গা ছুঁয়ে আসা বাতাস সে বুক ভরে নিতো। কতো আলাদা, বর্ষার শ্যামনগরের মতনই নাগাঝাংকার বাতাস আর্দ্র, অথবা আর্দ্রতর, যোধপুরের বাতাস ছিলো শুষ্ক। তবু রাতের বাতাস বড়োই প্রিয় ওর। দিনে সাদামাটা অনেককিছুই রাতের অন্ধকার ও আলোছায়ায় রহস্যঘন। সেই রহস্যের গা ছুঁয়ে আসা বাতাসে মনে হতো দূরবর্তী পাহাড়শ্রেণী যেন পাথরকঠিন আরাবল্লী নয়, মামাবাড়ির দিগন্তরেখায় মাইলং ডিশা ; যে পাহাড় চলমান, যে পাহাড় গতিশীল।

ভোরের দিকে মনে হতো মাইলং ডিশা ও ঘন বনানী সব কিছুই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রীয় মরু অনুসন্ধানশালার ফলবাগান ছুঁয়ে আসা কিন্নুর সুবাস বরাক, জিরি, ঘাঘরা, চিরি, কিংবা মধুরা নদীর দুপাশের পাহাড় লাল করা কমলার ফলনের কথা মনে করিয়ে দিত। শিলচর শহরে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকা অনেক কটা ট্রাকের কাছে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে কমলা পড়ে থাকতে দেখেছে পরিতোষ। বড়মামা তখন দশটাকায় একশোটা কমলার ঝুড়ি কিনে আনত। ঐ সময় সমস্ত বরাক উপত্যকা কমলার গন্ধে ম ম করতো। ম-ম করতো ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড় ; শেষ রাতের অন্ধকারে মনে হতো মাইলং ডিশা ও ঘন বনানী, টিপাইমুখের সঙ্গম কিংবা ফুলেরতলের টিলাজমিতে বিশালাকায় আনারসের সাম্রাজ্য সব কিছুই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে, ঠিক যেন কৈশোরের দিনগুলির মতন। পরিতোষের অনুভবে কৈশোরই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এমনি মনে হলে সে আর শুতে যেত না। মনে মনে কৈশোরকেই যেন টেনে টেনে সম্প্রসারিত করতো। চোখ বুজে উপলব্ধি করতো ভোরের অনাঘ্রাত রেশ, নাগাঝাংকার বিশাল কালোদীঘির পাশে বেড়ে ওঠা গাছেদের ঘন সবুজ।

শঙ্খের এখন কৈশোর। নিজের জীবনের হাহাকার যেন ওর কৈশোরকে ছারখার না করে দেয়। এমনিতেই পরিতোষের মতন শঙ্খের শৈশবে কোনরকম নিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশ নেই। শঙ্খ কি জলের আলাদা স্বাদ কিংবা বাতাসের আলাদা গন্ধকে অনুভব করতে পারবে? জীবনের প্রতি, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধই মানুষকে সমস্ত যন্ত্রণা ও হাহাকার থেকে মুক্তির পথ দেখায়। এভাবেই সন্ত্রাসক্রান্ত মানুষজন নিঃস্ব হয়ে একদিন আবার প্রেমের কাছে, সন্তানের কাছে ফিরে যায়। অখরাঙ ফিরতে চায় বিদাংশ্রীর কাছে, মহেন্দ্র চেয়েছিল মৃমলের কাছে যেতে।

পরিতোষ সন্তানের কাছে ...

বৃষ্টি থেমে গেলেও পথের পাশে ছোট ছোট অসংখ্য ঝিরি ঝিরি পাতার ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকা গোলাপী রোম রোম লজ্জাবতীর ফুলেরা এক সাময়িক স্পর্শহীনতার অপেক্ষায়, আলো কিংবা অন্ধকারে ; আবার প্রস্ফুটনের অপেক্ষায়—সে ভেবে ভেবে আকুল—নিদারুণ মন কেমন করা ভবিষ্যতে শঙ্খ কী করবে? কার কাছে যাবে ? পরিতোষের বর্তমান যে ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ মাখামাখি একাকার ঝুলে থাকে মহাজাগতিক কোনো ঘটনার মতন কিংবা ঘটনাহীনতার মতন—নিয়ন্ত্রণহীন।

সামনে ঊষর আরাবল্লী। উটনীর পিঠে দুলতে দুলতে এগোচ্ছে রাণা পরিতোষ।

লোদ্রভার কাছাকাছি □ শ্যা.ভ

স . মা . প্র

এক